প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণি
কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬৭

মুদ্রাকর
শ্রীরণজিৎ কুমার সামুই
বাণী-শ্রী প্রিন্টার্স
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা ৬

বড় মনের, বড় মাপের মানুষ
পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু
ডঃ নীতিশ সেনগুপ্ত
ও
সুনন্দা সেনগুপ্ত

## লেখকের অন্যান্য বই

**উপন্যাস**

শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম
ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীকৃষ্ণ এলেন দ্বারকায়
বিষণ্ণ শ্রীকৃষ্ণ
যদি রাধা না হ'তো
কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন
লঙ্কেশ রাবণ
জননী কৈকেয়ী
রামের অজ্ঞাতবাস
কাশ্যপেয়
মহাবিশ্বে মধুকৈটভ
তোমারই নাম কর্ণ
পিতামহ ভীষ্ম
রাজা রাম
এবং অশ্বত্থামা
সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী
কৃষ্ণস্তু ভগবান,
উর্বশী জননী
দুষ্মন্তের আংটি
মহাভারতের শকুনি
আমি তোমাদেরই সীতা
কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ
দ্বৈপায়নে দুর্যোধন
মন বৃন্দাবন

উপেক্ষিতা শূর্পনখা
শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরম্
বিভীষণ
অচেনা ভরত
নিবেদিত মার্গারেট

**গল্পের বই**

গল্পের দুপুর
অমৃতকুম্ভ
পৌরাণিক প্রেমকথা

**সমালোচনা**

বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা
মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য

**সম্পাদনা**

হরিবংশ
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণ
মনোজ বসুর রচনাবলী (৪ খণ্ড
মনোজ বসুর কবিতা

# সুধাসাগর তীরে

# কথায় কথায়

সাহিত্যচর্চার শুরুই হয়েছিল প্রবন্ধে হাত পাকিয়ে। আমার কোনো প্রবন্ধই সম্পাদকের 'অ' চিহ্নিত হয়ে ফিরে আসেনি। সর্বকালের সমাদৃত প্রবন্ধ পত্রিকা 'সাহিত্য সংস্কৃতি' এবং 'সমকালীন'এ আমার অনেক প্রবন্ধ জায়গা পেয়েছিল এবং খুব অল্পকালের মধ্যে অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তির নজর কেড়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করছি। একটি 'তারাশঙ্করের গল্পে জীবন ও প্রকৃতি'— এই প্রবন্ধ পড়ে চতুর্থ সাহিত্যসম্রাট আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। খোলা মনে ভাললাগার কথাগুলো বলতে দ্বিধা করেননি। তাঁর মহাপ্রয়াণের পরে তারাশঙ্কর স্মরণার্থে প্রকাশিত 'কালিকলম' পত্রিকায় এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছিলাম। পাঠকদের অবগতির জন্য এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করলাম। এই প্রবন্ধের দৌলতে এক বিশেষ গৌরবের অধিকারী হয়েছিলাম। কফি হাউসের টেবিলের সূত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের সঙ্গে আলাপ হয়। এই আলাপ না হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ্ ডি করা হত না। কারণ দুর্গাপুরে চাকরি করতাম। প্রাইভেটে এম. এ পাশ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে একেবারেই জানা-শোনা ছিল না। গাইড হতে কেউ রাজি হননি। অধ্যাপক উজ্জ্বল মজুমদার আমায় ঐ এক প্রবন্ধেই আবিষ্কার করলেন জহুরীর মত। তাঁর সহৃদয়তায় গবেষণা করার সুযোগ হল। তাঁর অধীনে গবেষণা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অমূল্য ডিগ্রিটি অর্জন করলাম। পরবর্তীকালে মডার্ন বুক এজেন্সি থেকে 'তারাশঙ্কর দেশ কাল ও সাহিত্য' নামে ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার সম্পাদিত যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল, উপরোক্ত প্রবন্ধটি তাতে অন্তর্ভুক্ত করে শ্রদ্ধেয় ডঃ মজুমদার আমাকে পুরস্কৃত করেছিলেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি 'সাহিত্য সংস্কৃতি'র শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য'। প্রবন্ধটি সুসাহিত্যিক স্বর্গত ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নজর কেড়ে নিয়েছিল। বন্ধুবর মনোজ বসুর প্রতি আত্যন্তিক প্রীতি ও অনুরাগবশত শ্রীবসুর সমগ্র সাহিত্যকর্ম নিয়ে আমাকে একটি পূর্ণমাপের সমালোচনা গ্রন্থ রচনার কথা বলেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সব ব্যবস্থাও তিনি করলেন। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স এর প্রকাশক হলেন। এই প্রবন্ধ পুস্তকই আমার প্রথম গ্রন্থ। বইটি বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের মুঠো মুঠো প্রশংসা কুড়িয়ে আমাকে ধন্য করে দিয়েছে। প্রবন্ধ রচনা করে আমি অনেক পেয়েছি।

আমার পাওয়ার ঘর ভরে গিয়েছে। তাই প্রবন্ধ সংকলনের নাম দিয়েছি 'সুধাসাগর তীরে'।

গবেষণার বই 'বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা'র প্রকাশক খুঁজতে এসে উপন্যাস লেখার ফরমাস পেলাম। গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উপন্যাস লেখার এক নতুন দৃষ্টিকোণ তৈরি হল আমার লেখায়। ভারতীয় মহাকাব্য এবং পুরাণের নবনির্মাণ আমার উপন্যাসে এক নতুন মাত্রা পেল। ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন : প্রবন্ধ ও উপন্যাসের যুগলধারা.এক সঙ্গমক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। যাই হোক, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, বিচার, বিশ্লেষণ, তথ্যনিষ্ঠা ও মূল্যায়নের গৌরবে পাঠকের নজরে পড়ে গেলাম প্রথম উপন্যাসেই। বিরাট সংখ্যক এক অনুরাগী পাঠক তৈরি হল। এখন তো গল্প উপন্যাস লিখে সময় কাটে। তবু বেশ কিছু প্রবন্ধ মাঝে মাঝে লিখতে হয়। রুচি বদল ঘটে তাতে। তখন গল্প, উপন্যাসের ফ্রেমে যা লিখতে পারি না প্রবন্ধে নির্দ্বিধায় তা বলি। প্রবন্ধের ক্ষেত্রটা অনেক বড়। উপন্যাসের আকাশটা প্রবন্ধের মত উন্মুক্ত নয়। বদ্ধ জলাশয়ে যতখানি আকাশ দেখা যায়, অনেকটা সেইরকম। ছোট এক আকাশের তলায় বসে বিশেষজ্ঞের শীলমোহর অঙ্কিত (পুরাণ বিশেষজ্ঞ) বৃত্তের পরিধিতে শুধু পুরাণের নব নব ব্যাখ্যা করতে হয়। এই জাতীয় লেখার সংখ্যাও কম নয়। যত্ন করে রাখার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে সবই। যত দিন যাচ্ছে অগোছালো ভাবটা তত বাড়ছে। কোথায় কি রাখি মনে থাকে না। তাই বাছাই করা কিছু প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করে দে'জ পাবলিশিং এর সুধাংশুশেখর দে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন।

**ডঃ দীপক চন্দ্র**

# নমামি শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরম

বহুবর্ষ আগে শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে মথুরার কারাকক্ষে মানুষের শৃংখলমুক্তির জন্য ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন মানুষের প্রেমের ভগবান, জনগণমন অধিনায়ক শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের মানবিক স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বস্তুনিষ্ঠ; যতটা সম্ভব ইতিহাস আশ্রয়ী ও বর্তমান কালের যুক্তিগ্রাহ্য পর্যালোচনা। অধ্যাত্মভাবনা এবং বিশুদ্ধ ভক্তিবাদ ও দর্শনের বাইরেও শ্রীকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানার ও বোঝার আছে, যেদিকটা ভক্তির প্রাবল্যে এবং প্রাচীন প্রথাবদ্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারের আতিশয্যে ও আবেগের বশে ভাল করে খতিয়ে দেখা হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেন চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অধ্যাত্মবিশ্বাস থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। তাঁদের দুঃসাহসিক ভাবনা-চিন্তাকে পাথেয় করে একালের শিক্ষিত মানুষের বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে শ্রীকৃষ্ণের বিশাল ঘটনাবহুল জীবনের বিরাট ও বিচিত্র কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে মূল্যায়ন করার প্রতি একালের ঝোঁক ও আন্তরিক নিষ্ঠা প্রবল।

মহান কর্মযজ্ঞের ঋত্বিক শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং মানবিক দিকটি মহাকাব্যে ও পুরাণের পাতায় যেভাবে আছে তার অবাস্তবতা এবং অলৌকিকতা পরিহার করে লৌকিকভাবে কার্যকারণসূত্রে তার সম্ভাবনা নির্ণয় করে যদি দেখা যায় তা'হলে রক্তমাংসের মহানায়ক, যুগাবতার, জনগণ-মন-অধিনায়ক, সাম্য-মৈত্রী-শান্তি-প্রীতি-সহযোগিতার উদগাতা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে চিনতে, জানতে, বুঝিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবে ইতিহাসের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যে যুগ সন্ধিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি এবং তার বাস্তব প্রয়োগ ও সাফল্য আমাদের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর জীবনযাত্রার এক পথ নির্দেশিকা। দুর্ভাগ্য একালের তরুণ-তরুণীরা শ্রীকৃষ্ণ এবং ভারতীয় পুরাণ সম্পর্কে কৌতূহলহীন। তাদের কৌতূহলের অভাব-অভিযোগ এবং নির্বিকারত্বের কোন কারণ, আমরাও খুঁজিনা। একালের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা পুরাণে ও মহাকাব্যে তাদের মনের খোরাক পায় না বলেই এক ধরনের অনীহা বোধ করে। তাদের কৌতূহল ও আগ্রহের অভাবে একদিন

আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে সুপ্রাচীন হিন্দুধর্মের একটা বিশাল সংস্কৃতির ভাণ্ডার এবং ঐতিহ্য কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

একালের তরুণ-তরুণী পুরাণের যুক্তিহীন অলৌকিক গল্পের প্রতি টান অনুভব করে না। রামায়ণ মহাভারত একালের স্কুল-কলেজে পড়া ছেলে-মেয়েরা ছোঁয় না। তাই রামায়ণ-মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণ পুনর্লিখনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, তাকে শ্রদ্ধার আসনে বসাতে হলে বস্তা বস্তা অবাস্তবতা আর অতিলৌকিক ঘটনার পাহাড় সরাতে হবে। তবেই, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ পরিচ্ছন্ন জীবন ও সুস্থ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠবে।

যুগের কথা মনে রেখেই, একথা সাহসের সঙ্গে বলছি — এ যুগ অবিশ্বাসের যুগ। এযুগে ভক্তির পাত্র শূন্য। কিছু কিছু লোকের ভেতর তার তলানিটুকু পড়ে আছে। শিক্ষা-বিজ্ঞান আশ্রিত যুক্তি-সংস্কার ও বিশ্বাসের দেওয়ারে ভেঙে চৌচির করে দিচ্ছে। পুরাতন মূল্যবোধগুলি বদলে যাচ্ছে। নিত্যনতুন গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত ওলোট-পালোট করে দিচ্ছে পুরাকালের গল্পগুলোকে। মানুষের পুরাণ বিশ্বাস ভীষণভাবে নাড়া খাচ্ছে। নতুন সত্যের উপলব্ধি শিক্ষিত মানুষের মনে যে নতুন প্রত্যয় গড়ে তুলছে, পুরাণ তার দাবি পূরণ করতে পারছে না বলেই পুরাণ এবং রামায়ণ মহাভারতের উপর আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে, নিরাবেগ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে দেখার ও বোঝার যুগ এটা।

একথাও সত্য, কালের প্রয়োজনে ইতিহাসের মহানায়ক রাজনীতির প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের উপর অলৌকিক ঘটনার প্রলেপ পড়েছে। সত্য কাহিনীকে অসাধারণ করে পরিবেশন করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এক অবিশ্বাস্য গল্পের নায়ক হয়ে উঠেছেন। কৃষ্ণের অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে গুণ, কর্ম, মহত্ত্ব ও আদর্শের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি অনুরাগের পূজাঞ্জলিই তাঁকে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্' করেছে।

মহাভারতের প্রথম অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ দেবতা নন। একজন অসাধারণ প্রজ্ঞাবান রাজনৈতিক নেতা। এক আশ্চর্য সুন্দর মহাপুরুষ। পরহিতার্থে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। নিজের জন্যে কিছুই আকাংখা নেই তাঁর। তিনি নির্লোভী। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও ভোগে নিস্পৃহ। পরিবর্তে, অপরের দুঃখ, দুর্দশাকে আপন ভেবে প্রতিকারে যত্নবান হয়েছেন। তাঁর পরহিতৈষণা, মহত্ত্ব, সততা, ত্যাগ শত্রুকেও অবাক করেছে। প্রেমে এবং মহত্ত্বে তাদের বশ করেছেন। তাঁর অসাধারণ পৌরুষ, চরিত্রমাধুর্য, নম্র স্বভাব, স্নিগ্ধ আচরণ, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাম্য-মৈত্রী-শান্তি নীতি সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের গুণ ও কর্ম মানুষের অন্তরকে বিকশিত করল। শ্রদ্ধার স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়ে ভক্তির শতদলে পূজা করল শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে। মানুষের পূজা পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবান, মানুষের প্রাণের ঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণের এই ঈশ্বরত্ব মানুষের সৃষ্টি। ভক্ত ও প্রেমিক মানুষের পূজাঞ্জলি। ভক্তির এই অর্ঘ্য নিবেদিত হল মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরে। তৃতীয় ও তার পরবর্তীস্তরে সেই ভক্তি ও পূজা এক

পারমার্থিক দার্শনিক স্তরে পৌঁছল। ভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বলে নির্দেশিত হল। মহাভারতের কর্মমার্গের ভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠিত হল। গীতার জন্ম হল।

কালের প্রয়োজনে ও স্বার্থে কৃষ্ণের মানুষী সত্তার উপর যেই ঈশ্বরত্ব আরোপিত হল অমনি মানুষের মনে প্রশ্ন জাগল কৃষ্ণ যদি সর্বশক্তিমান ভগবান হন, তা-হলে ঐশী শক্তির সাহায্যে অভিপ্রেত কর্মসম্পাদন না করে মানুষের সীমিত শক্তি, সাধ্য, ক্ষমতার দ্বারা তা সম্পন্ন করলেন কার স্বার্থে? নররূপী শ্রীকৃষ্ণের সাফল্য মানুষের গৌরব মর্যাদাকে শুধু বাড়াল না, মানুষের ভেতর যে দেবতার শক্তি ও ক্ষমতা আছে এই সত্যকে প্রকাশ করল। মহাকাব্যে, পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে দেশকালের যে ইতিহাস রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির পরিচয় ফুটে উঠেছে তাকে আবিষ্কার করাই শ্রেষ্ঠ পুরাণ গবেষণা। নির্মোহভাবে অলৌকিকতা থেকে মুক্ত করে সর্বকালের একজন বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী রাষ্ট্রনেতা এবং সমাজ বন্ধুরূপে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের পুনঃনির্বাচন করেছি মৎলিখিত শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তমে। আজকের চেনা মানুষের সারিতে চিরচেনা কৃষ্ণের এক নবরূপ। চেনা মানুষের সারিতে চিরচেনা কৃষ্ণের এক নব রূপ। শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রথাবিরুদ্ধ কিছু বলার আগে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আজকের বুদ্ধিদীপ্ত, শিক্ষিত, সমাজ সচেতন মানুষকে ধর্মের আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাচ্ছে না। শিক্ষা তার নেশা কাটিয়ে তুলেছে। তাই ধর্মেতে কারো মন নেই। দেবতা বা ঈশ্বর বলে কেউ আছে একথা কোন শিক্ষিতই মানতে চায় না। দেবতাকে চোখে দেখা যায় না। দেবতার মূর্তিতে যাকে দেখি সে তো মানুষ। ফলে নাস্তিকতা তার মনের রাজ্যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করছে। একটা অশান্ত অস্থিরতা জীবনের থিত, ভিত কাঁপিয়ে তুলছে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, সংশয় হতাশা, নৈরাশ্য, অবসাদ তার মনের ভারসাম্য নষ্ট করছে। অথচ শ্রান্ত মন নিরন্তর একটা আশ্রয় চাইছে। ধর্ম হল মানুষের সেই পরম আশ্রয়। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কোন ঠাঁই নয় বলেই, ধর্মগ্রন্থের প্রতি তার শ্রদ্ধা দিন দিন কমছে। তবু বহুকালের সংস্কার, বিশ্বাস আর একধরনের অদ্ভুত মমতাবশত পুরাণকারেরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য এবং ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলার জন্য যে গল্প সৃষ্টি করলেন তার সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করার মানসিকতা আমরা তৈরি করতে পারছি না। ইচ্ছা করেই উদাসীন থাকছি। এটা আমাদের ত্রুটি। আমি সেই দুরূহ ব্রত গ্রহণ করছি। এজন্য ধর্মপ্রাণ পাঠকের চোখে কালাপাহাড় বলে সমালোচিত হচ্ছি। তাঁদের এই তিরস্কার যদি পরস্কার হয়ে ওঠে তবে সেইদিন আমার শ্রম ধন্য হয়ে উঠবে।

ভারতে উদ্ভূত যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল তার ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটটি ব্রহ্মার কাছে নির্যাতিতা, অসহায়া, লাঞ্ছিতা বসুন্ধরার আশু প্রতিকার প্রার্থনার ঘটনায় বিবৃত হয়েছে। আসলে এ হল রূপক। রূপকে প্রচ্ছন্ন সত্যটি হল, সব দেশেই মাঝে মাঝে দেশের অভ্যন্তরে শাসকের দম্ভে, দোষে, অত্যাচারে লোভে নিষ্ঠুরতায় নিষ্পেষণে, বিবিধ বঞ্চনায়, দুঃখে কষ্টে এমন তীব্র-সংকট

আর নিরুপায় অসহায়তা সৃষ্টি হয় যে, তা থেকে মুক্তির জন্যে মানুষ আকুল হয়ে ওঠে। নির্যাতন শোষণ, বঞ্চনা, অবিচার, অত্যাচার সহ্য করতে করতে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হয় যখন নিদ্রিত মানুষের মধ্যে তার মার খাওয়া আত্মাটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে জেগে ওঠে। শুরু হয় আত্মপ্রক্ষালনের মহড়া। আত্মার নবজন্ম বরণ করে এক নবযুগকে। কালের বিশেষ সংকট সময়ে সন্ধি মুহূর্তে এইরকম মানুষী তেজ বিস্ফোরণ হয়। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে আমরা সে সত্য অবগত হলাম। বিপন্ন পৃথিবীর মুক্তির জন্য, রক্ষার জন্য সর্বশক্তিমান মানব-শিশুর বিরাট আত্মপ্রকাশের বিস্ময়কে মানুষ তার কল্পনায় ধরতে পারে না বলেই ঈশ্বররূপে ভাবে তাকে। বিরাট প্রাণের বিরাট ব্যক্তিত্বকে প্রকৃত বাস্তব সত্য ও কালসত্তার মূল্য নিরূপণে অক্ষম হয়েই দাশনিকের পরিভাষায় শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে বলা হয়েছে। :

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজ্যমহম।

শ্রীকৃষ্ণের বিখ্যাত উক্তিটির মধ্যে কালের ধর্ম নিহিত। এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে যে আত্মজাগরণ ঘটে এ হল তারই দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

যুগাবতার কৃষ্ণ যে সময় আবির্ভূত হলেন সেই সময়টা স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর অন্যতম নায়ক জরাসন্ধের ঔপনিবেশিক শোষণের নাগপাশে বন্দী ৮৪ জন ভারতীয় নৃপতির অসহায় বন্দীদশা, কারাবাসের চেয়েও বেদনাদায়ক এবং অপমানকর। কর্তাভজা এক শ্রেণীর স্বার্থপর, দুর্বল, সুবিধাবোগী রাজন্যবর্গ ও ক্ষমতালোভী রাজপুরুষ জরাসন্ধের পক্ষপুট আশ্রয় করে নিরাপদ ভোগবিলাসের পঙ্ককুণ্ডে আকণ্ঠ ডুবে রইল। আর তাদের বিলাস ব্যসনের এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন মূঢ়তার সব আর্থিক দায় বহন করতে হল জনগণকে। জরাসন্ধের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এবং তার কৃপালাভের জন্য জনগণের উপর জুলুম করে অর্থ আদায়ের মাত্রা ক্রমাগত বেড়ে চলল। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ ও দুর্বিষহ হয়ে উঠল। শুধু কি তাই, জরাসন্ধের আগ্রাসী নীতি, জরাসন্ধ বিরোধী রাজ্যগুলিকে শংকিত ও সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। ভারতবর্ষ জুড়ে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অসহায়তা মানুষের আত্মশক্তি ও বিশ্বাসকে পঙ্গু করে দিল। নির্যাতিত মানুষের আতঙ্ক হতাশা নৈরাশ্য অবসাদ এবং মৃত্যুভয় মানুষকে ক্লীব করে রাখল। এইরকম এক যুগসংকটে মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। বসুমতীর আকুল আর্তিতে যুগযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ হল।

মথুরা ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। মথুরা, পাঞ্চাল প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাজ্যগুলির পারস্পরিক মৈত্রী-ঐক্য ও সংহতি জরাসন্ধের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পরিপন্থী ও প্রতিপক্ষ হয়েছিল। তাই শক্তিজোটকে ভাঙা এবং দুর্বল করার মতলব নিয়ে জরাসন্ধ উগ্রসেনের জারজপুত্র ক্ষমতালোভী কংসের সঙ্গে দুই কন্যার বিবাহ দিয়ে তাকে হস্তগত করল। জরাসন্ধের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে কংস প্রাসাদ অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করল।

গণতান্ত্রিক শক্তির উপর একটা বড় আঘাত এসে পড়ল। গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মথুরার মানুষ কিন্তু স্বৈরাচারী শাসকের এই ঘৃণ্য চক্রান্ত আর ঔপনিবেশিকতাকে মেনে নিতে পারেনি। তাই রাজ্যের অভ্যন্তরে আচার্য গর্গ এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের নেতৃত্বে চলছিল অহিংস গণআন্দোলন। সেই আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিতে স্বৈরাচারী শাসনদণ্ড, ঔপনিবেশিক শোষণবাদ দুর্দমনীয় হল। এরকম এক সংকট মুহূর্তে মানবত্রাতা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

পৃথিবীর প্রয়োজনেই যুগন্ধর পুরুষেরা আবির্ভুত হন। কাল নিজেই তাকে যুগোপযোগী করে সৃষ্টি করে। দেবতার কোন ভূমিকা তাতে নেই। মাটির পৃথিবীর কর্মশালায় কে যেন তৈরি করে তাকে। এই 'কে' কিন্তু ঈশ্বর নয়। দেশ কাল। শ্রীকৃষ্ণ সময়ের স্রোতে ভেসে আসা একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। জনগণেশের পূজার অর্ঘ্য।

শিশুকাল থেকে কৃষ্ণ নিজেই তার রক্ষাকর্তা। কংসের বিশ্বস্ত সহচরী অনার্য কন্যা পুতনার মৃত্যু কোন অলৌকিক ঘটনা নয়। সাধারণ দুর্ঘটনা। কিন্তু অভিনব। ঘূর্ণাবর্তে তাঁর জীবন রক্ষাও বিস্ময়কর। বাস্তবে খুব কম মানুষের জীবনে এ ধরনের ঘটনা ঘটে। বকরাক্ষস, ধেনুকাসুরের ছলনায় শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি ও দৈহিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। বালকের এই অসাধারণ বুদ্ধিবল, অসীম সাহস, এবং কৌশল ব্রজবাসীর কৌতূহল ও বিস্ময়। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন কিছু আসাধারণত্ব ছিল যা ঐ বয়সের অন্য বালকদের মধ্যে ছিল না। কোনও বয়স্ক মানুষেরও ঐরূপ কর্মনৈপুণ্য এবং নেতৃত্ব গুণ দুর্লক্ষ্য ছিল। ফলে, কৃষ্ণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে কতগুলো আশ্চর্য বিশ্বাস এবং ধারণা গড়ে উঠল। নানাজনে নানারূপে ভাবল তাকে। শিশুকাল থেকে সেই হল ব্রজপুরে সর্বাপেক্ষা আলোচিত ব্যক্তি। কৃষ্ণ সম্পর্কে মৌখিক বিশ্বাসগুলিই তাকে দ্রুত জনপ্রিয় করে তুলল। তাদের ধারণায় কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার।

বাল্য থেকেই কৃষ্ণের মধ্যে নেতৃত্বের বড় গুণগুলি প্রকাশ পেল। মনোরঞ্জনের অসীম ক্ষমতা তাকে মানুষের খুব নিকট করল। জীবন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলো হৃদয় দিয়ে দেখা এবং বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করার মত এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তার। রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি থাকার জন্য কৃষ্ণ সহজেই বুঝতে পারত - কোনটি বেশি প্রয়োজন? মানুষের অভাব ও দুঃখটাকেও অনুভব করতে উপলব্ধি করতে কখনও ভুল হত না তার। কারণ কৃষ্ণের দেখার ও জানার সঙ্গে হৃদয় ধর্ম যুক্ত হয়েছিল। তাই তো মানুষের প্রাণের দেবতা সে।

পীড়িত, দুর্দশাগ্রস্ত দেশবাসীকে মুক্ত করার স্বপ্ন, চিন্তা কৃষ্ণের শৈশব থেকে। বাল্যে, কৈশোরে, তারুণ্যে সেই চেতনা প্রেরণা, বোধ ও সংকল্প কেবল বর্ধিত হল। জ্ঞান বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি ব্যাকুল জাতির অন্তরে তার তীব্র আবেগ সঞ্চার করে বিপ্লবের জমি প্রস্তুত করল। তারপর একের পর এক উৎপাটিত করল জনস্বার্থ ও গণতন্ত্রবিরোধী কংসের ককর্মের অন্যতম বিশ্বস্ত শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী ও সহযোগীদের

মথুরার সংঘবদ্ধ যুবশক্তির সহায়তায় কৌশলে কংসকে একটু একটু করে দুর্বল আর অসহায় করে তোলার এক পরিকল্পনা করল। পুতনা, কালীয়, ধেনকাসুর, অঘাসুর, বকাসুর, প্রলম্ব, অরিষ্ট, কেশী প্রভৃতি কংসের অনুচরেরা গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হল। তাদের মৃত্যুর রহস্যেটা এমন এক অলৌকিকতায়। মুড়ে দিওয়া হল যে তাদের মৃত্যুটা কংসের মনের অভ্যন্তরের সংঘাতকে তীব্রতর করে তুলল। প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃষ্ণের বুদ্ধি ও কৌশলের জয় তার সাফল্যকে চূড়ান্ত করল। কংসকে রাজনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও একা করে তার উপর চূড়ান্ত আঘাত হানল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে কংস নিহত হল। গণতন্ত্রের জয় হল। মথুরার বৈপ্লবিক গণ-শক্তির অভ্যুদয় সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তির্গের দুশ্চিন্তার কারণ হল।

দূরদর্শী কৃষ্ণ এই সত্যটা আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কংসের মৃত্যুতে মথুরার সমস্যা মিটবে না বরং বাড়বে, জটিল হবে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কোপদৃষ্টি পড়বে। মথুরাবাসীকে স্বাধীনতালাভের মূল্য দিতে হবে এসব জেনেই কৃষ্ণ তার মোকাবিলার জন্য দেশের যুবশক্তিকে দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য তলে তলে প্রস্তুত করেছিল। দেশের স্বৈরাচারী শাসক এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চোখে ধুলো দিয়ে বৃন্দাবনে গোচারণের নামে, ক্রীড়াচ্ছলে প্রতিটি তরুণ-তরুণীকে দেশ ও জাতির এক অতন্দ্র প্রহরী করে তুলল। পরবর্তীকালে এই প্রস্তুতিকে ভক্তেরা কৃষ্ণলীলা নামে অভিহিত করেছে।

কৃষ্ণের অনুমান সত্য হল। কংসের মৃতুর অব্যবহিত পরেই বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠী একজোট হয়ে জরাসন্ধের নেতৃত্বে মথুরা আক্রমণ করল। আক্রমণে আক্রমণে মথুরার সুদৃঢ় গণশক্তির ভিত্‌কে ভেঙে চুরমার করে দিতে তারা বদ্ধপরিকর হল। দীর্ঘ আঠারো বছর মথুরা অবরুদ্ধ রইল। তবু কৃষ্ণের নেতৃত্বে বিপ্লবী গণশক্তির অন্যতম প্রাণ যুবক ও জনতার অটুট মনোবল একটুও ভাঙল না। জরাসন্ধের বিশাল চতুরঙ্গ বাহিনীর সঙ্গে তারা সংগ্রাম চালিয়ে গেল। অবশেষে সংঘর্ষের কৌশল বদলাল কৃষ্ণ। মথুরা থেকে গোপনে দ্বারকায় পালিয়ে এসে সেখানে নতুন রাজ্য ও রাজধানী স্থাপন করল। সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত করে এক নতুন রাজনীতি সূচনা করল। সাম্য-মৈত্রী-প্রীতি-শান্তি ও সৌভ্রাত্রের বন্ধনে ছিন্ন ভিন্ন ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করার এক নতুন শপথ নিল কৃষ্ণ। শান্তি মৈত্রী-একতা, সহযোগিতা, পারস্পরিক আদান প্রদানে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন রাজ্যগুলিকে নিয়ে এক নতুন রাষ্ট্রজোট গড়ে উঠল। যুধিষ্ঠিরকে সামনে রেখে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি মৈত্রী ও সহযোগিতার এক আদর্শ রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের প্লাটফরম তৈরি করল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে জব্দ ও কব্জা করার অস্ত্র হিসাবে যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ ব্যবহার করল। পাণ্ডবদের জনপ্রিয়তা, লোকরঞ্জনের ক্ষমতা, সত্যনিষ্ঠা, ধর্মপরায়ণতা, নির্লোভ, নিঃস্বার্থ মানব হিতৈষণার খ্যাতি ও গৌরবকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগালে রাজনৈতিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের ভূমিকা যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে এই সত্যটা কৃষ্ণ আগে থেকে আঁচ করতে পেরে তাদের দুঃসময়ে তাদের পরম বন্ধু ও আত্মীয় হয়ে গেল। এই

রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সুযোগ ও সময়ের নিপুণ নির্বাচন ক্ষমতা ছিল কৃষ্ণের সাফল্যের চাবিকাঠি। সাম্রাজ্যবাদী জরাসন্ধের সঙ্গে এক বৃহৎ সংঘর্ষের আশংকা স্মরণে রেখে কৃষ্ণ তার কর্ম ও নীতি নির্ধারণ করেছিল।

সাম্র্যাজ্যবাদীদের পশুবল দম্ভ, অহংকার নয়, প্রীতিমন্ত্রবল, বুদ্ধিবল, সাম্য চেতনা, সৌভ্রাত্রবোধ হল কৃষ্ণের রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির হাতিয়ার। আমার দৃঢ় ধারণা, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের বন্ধুত্বপূর্ণ, সৌভ্রাত্র সম্পর্ক কৌরব পাণ্ডবদের ভ্রাতৃবন্ধন দৃঢ় হওয়ার পথে অন্তরায় হয়েছিল। কৌরব এবং পাণ্ডব রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে দুটি পৃথক শিবিরে অবস্থান করছিল। জরাসন্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের কূট রাজনীতি লড়াই ভাই-ভাই সংগ্রামকে অনিবার্য করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শের নিরন্তর কূট রাজনীতির লড়াইয়ের এক সংগ্রামক্ষেত্র হল মহাভারত। মৎ লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম' উপাখ্যান তার এক চমকপ্রদ সংঘাতময় কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে।

বলাবাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক আদর্শের জয় হল। সাম্য, মৈত্রী, সৌভ্রাত্রের রাজ্য প্রতিষ্ঠা হল। জনগণমন অধিনায়ক কৃষ্ণের এই জয় ও সাফল্য কৃষ্ণের গৌরব ও মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি করল তেমনি স্বার্থান্বেষী মানুষরা কৃষ্ণের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ভীত হল। তথাপি সাম্রাজ্যবাদের ভূত কিন্তু দেশ ছেড়ে গেল না। একদিন তাদের চক্রান্তে, শ্রীকৃষ্ণকে আততায়ীরা হত্যা করল। শ্রীকৃষ্ণের মত শক্তিধর মানুষ হত্যা হলে তাঁর গৌরব কমে যায় বলে হরিণভ্রমে ব্যাধ কৃষ্ণকে হত্যা করেছে এরকম একটা মিথ্যে গল্পটা বানানো হল। এতে কৃষ্ণের মহিমা কতখানি বেড়েছে জানি না, কিন্তু সত্য একটুও প্রকাশ পায়নি।

ধর্মপ্রাণ দর্শক এবং ভক্তদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে, এভাবে অবতারী শ্রীকৃষ্ণের ভগবানরূপকে মানুষের সীমানায় প্রত্যক্ষ করলাম কেন? যুগ-যুগান্তরের স্বপ্নভঙ্গই বা তাঁদের করলাম কেন? মিথ্যেকে মিথ্যে বলতে অসুবিধা কোথায়? কৃষ্ণ মানবশিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ তিনি। দেশ কালের সত্যিই তো বিশেষ সন্ধিক্ষণেই তাঁর আবির্ভাব। তিনি মানুষকে ভালবেসেছিলেন, মানুষের শুভ কামনা করেছিলেন, চেয়েছিলেন মানুষ সাম্য-মৈত্রী-প্রীতি ও সৌভ্রাত্রবোধে সুন্দর হোক। শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্চর্য আকাংখা, অদ্ভুত কার্যকলাপ, অসাধারণ মনোবল, বিপদ বাধা উত্তরণের দৃঢ় মনোবল, ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণ, অবিচল লক্ষ্য, মনের একাগ্রতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা, মনীষা, কর্মে সিদ্ধি প্রভৃতির কোন যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা অনেক সময় দেওয়া যায় না। সম্ভবও হয় না। শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও কর্মের মূল্যায়নের মাপকাঠি যেহেতু নেই, সেহেতু তাঁর সকল কার্যকেই অলৌকিক মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই লোকোত্তর শক্তি, ক্ষমতা, গুণ ও কর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের কৌতূহল ও বিস্ময় সঞ্চার করতে তাঁর কার্যাবলীর অসাধারণত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সৃষ্টি করতে লোকোত্তর শক্তির এক ইমেজ সৃষ্টি হল। যার নিট ফল সত্য-মিথ্যা মেশানো এক অনবদ্য জীবনকাব্য। রক্তমাংসের মানবশিশু কালগর্ভে হারিয়ে কল্পলোকের বাসিন্দা হয়ে উঠল। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, শ্রী ও শোভায় অপরূপ তাই দিয়ে সাজানো

হল কৃষ্ণের নবরূপকে।

বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাণের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের দুটি মূর্তি পুরাণে ও কাব্যে আছে। একটিতে শ্রীকৃষ্ণ একজন দক্ষ রাজনীতি, কূটকৌশলী, যোদ্ধা, ভারতযুদ্ধের কর্ণধার, গীতার প্রবক্তা, অন্যটিতে বৃন্দাবনের যশোদাদুলাল বালগোপাল, গোপীজনবল্লভ চিরকিশোর কৃষ্ণ শ্রীরাধার সঙ্গে যুগলরূপে আবদ্ধ।

ইতিহাস ও দর্শনের সমন্বয় হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্বভূতে অন্তরাত্মা বিরাট পুরুষ তেমনি একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। শ্রীমদ্ভাগবত, গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এক দার্শনিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালে এই দার্শনিকতা থেকে এক অভিনব ভক্তিবাদের সূচনা হয়েছে। কৃষ্ণের ব্রজের জীবন নিয়ে গড়ে উঠল তার পরিমণ্ডল। কৃষ্ণের অবিমিশ্র চরিত্রের সঙ্গে ভাগবত ধর্মের বিশ্বাসী ভক্ত ও জ্ঞানীরা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসের সঙ্গে আভীর জাতির অবৈধ প্রেম-পৌরাণিক কাহিনী মিশিয়ে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার এক অপূর্ব ভক্তিবাদ সৃষ্টি হল। কেমন করে? কৃষ্ণের শৈশব বাল্য, কৈশোর কেটেছে ব্রজে। অপরিসীম ভালবাসা নিয়ে সে বড় হল। এই ভালবাসা তাকে শেখাল দেশ ও জাতির প্রতি তার কর্তব্য। দশের ভালর জন্য সে নিজেকে উৎসর্গ করল। এই আত্মনিবেদন হল প্রেমের মূলকথা। তাই ভক্তের চোখে শ্রীকৃষ্ণ এই পর্বে আদর্শ প্রেমিক। দেশ ও দশের প্রতি কৃষ্ণের অন্তহীন মমতা, ভালবাসা, মহান আত্মত্যাগ, সুকঠোর ব্রত, কঠিন সংগ্রাম ক্ষমতা বৃন্দাবনবাসীকে কৃষ্ণনুরাগী করেছিল। কৃষ্ণ মথুরাবাসীর ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাংখা। কৃষ্ণ বৃন্দাবনের জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, সর্বত্র। কৃষ্ণ ছাড়া গীত নেই। কৃষ্ণ নামের এই মহিমা কীর্তন করতে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের পরিকল্পনা। এর অর্থ পুরুষশক্তির সঙ্গে নারীশক্তির সমন্বয় ঘটানো। পুরুষ ও নারীশক্তির মিলনে একটি সম্পূর্ণ মানুষীসত্তার প্রকাশ ঘটে। কর্মযজ্ঞে নারী উপেক্ষার পাত্রী নয়। সে প্রেরণাব দীপশিখা। মথুরা মুক্তিযজ্ঞে যুগ্ম ঋত্বিক পুরুষ ও নারী। রাধা ও কৃষ্ণের যুগল প্রেম তার প্রতীক। এই ভাবনাটি নিয়ে 'যদি রাধা না হত' উপন্যাস-এ শ্রীকৃষ্ণের জীবনের উপর এক নতুন আলো ফেলেছি।

ভক্তিতরুর অমৃতফল কৃষ্ণের জীবনে কিভাবে ফলেছিল তার একটি প্রসঙ্গ দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করছি। দেশপ্রাণ মানুষের কাছে সুভাষচন্দ্রের চিরশ্রুত ঐতিহাসিক বাণীটি মনে পড়ছে : তোমরা যদি আমাকে রক্ত দাও তাহলে আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। অর্থাৎ শৃঙ্খলিত দেশমাতৃকার মুক্তির জন্যে আত্মসমর্পণ শেষ কথা। আত্মোৎসর্গের সেই মহান সংকল্প মনে না এলে সার্বিক মুক্তি সম্ভব নয়। কৃষ্ণ ব্রজবাসীর মনে দেশের প্রতি ভালবাসার এই বীজটি অঙ্কুরিত করেছিল। যার মূল কথা ছিল সর্বস্বত্যাগ। কৃষ্ণের বাঁশির সুরে সেই আহ্বানের শক্তি ছিল। দেশের জন্যে জাতির জন্যেই প্রতিটি মানুষের জীবন। নির্যাতিত শৃংখলিত দেশবাসীর নিজের বলে কিছু থাকতে নেই। দেশের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হবে। প্রাণের মায়া ত্যাগ করার মত দুঃসহ কঠিন আর কিছু নেই। রমণীর বসন

ত্যাগের মতই শক্ত। শ্রীকৃষ্ণের এই দেশাত্মবোধের শিক্ষা পরবর্তীকালে ব্রজগোপীর বস্ত্রহরণের রূপক কাহিনীতে যে রূপান্তরিত হয়নি কে বলবে? দেশাত্মবোধ ভগবৎপ্রেমে উন্নীত হয়ে এক নতুন ভক্তিদর্শন গড়ে উঠেছে। যার মূল কথা হল : ভেদাভেদ দূর হলে জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন হয়। সে অবস্থায় ভক্তের অদেয় কিছু থাকে না। নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে লজ্জা তাও অকাতরে নির্দ্বিধায় বিসর্জন দিতে পারে। স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদেরা যেমন দেশের জন্যে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পেরেছিল। এই পরম ত্যাগের শক্তি শুধু প্রেমেতেই সম্ভব। কৃষ্ণের রাধা ও গোপী প্রেম তার প্রতীক। বস্তুর স্থূলরূপ আবিষ্কারে ভক্তের মন তৃপ্ত হয়নি। তাই আরও গভীরে গিয়ে পৌঁছল তার চেতনা অনু ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্ম থেকে আরো উর্ধ্বে চলে গিয়ে পৌঁছল তারা আনন্দ ব্রহ্মে। রসৌব সঃ। ভৃগু বললেন এই আনন্দই ব্রহ্ম। এই আনন্দানুভূতিতে জীব শিব হয়। মানবসত্তায় শ্রীকৃষ্ণঃ এই আনন্দানুভূতিতে হলেন সচ্চিদানন্দ ভগবান। সবশেষে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বলি-ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন. যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।

# প্রসঙ্গ হরিবংশ

**উৎসের সন্ধানে :**

হিন্দুপুরাণের মহানায়ক, ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রাণপুরুষ এবং জনগণমন-অধিনায়ক কৃষ্ণের প্রথম আত্মপ্রকাশ মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়। তখন তিনি ত্রিশ বছরের যুবক। ভারত-রাজনীতিতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। গোটা মহাভারত জুড়ে তাঁর কর্মভূমি।

কৃষ্ণের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, চরিত্রমাধুর্য, মহানুভবতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, লোকচরিত্রজ্ঞান তাঁকে এমন এক অসাধারণত্ব দিল যে তাঁর সম্পর্কে কৌতূহল এবং আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। মানুষের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের আলো পড়ে কৃষ্ণ আরো বড় হয়ে গেল। মানুষ কৃষ্ণ ভগবানরূপে অর্চিত হতে লাগল। এটা হতে অবশ্য অনেক সময় লাগল। কৃষ্ণ তিরোধানের অনেককাল পরে কৃষ্ণচর্চা এবং গবেষণার যে নবদিগন্ত উন্মোচিত হলো তা জানার ঔৎসুক্য দেখালেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর প্রপৌত্র মহারাজ জনমেনজয়।

মহাভারতে সমস্ত কৃষ্ণকথাই পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বৈশম্পায়নের মুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথার মধ্যে তাই মহারাজ জনমেনজয় একটা গোটা কৃষ্ণকে কোথাও খুঁজে পেলেন না। আবার খণ্ডিত কৃষ্ণকে নিয়েও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। একাধিক প্রশ্ন জাগল তাঁর মনে। কৃষ্ণ কোন বংশে জন্মগ্রহণ করলেন? তাঁর শৈশব, বাল্য, কৈশোর, তারুণ্য, যৌবনের প্রথম পর্ব-কোথায়, কিভাবে, কোন আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থায় কাটল? তাঁর পিতা-মাতা কে? ভ্রাতা-ভগিনী কে? কারা অত্মীয়, বান্ধব, পরিজন এসব অজ্ঞাত রহস্য সবিস্তারে বর্ণনা করতে বৈশম্পায়ন আর এক নব মহাভারতের অবতারণা করলেন ; যা খিল হরিবংশ নামে পরিচিত। খিল অর্থাৎ পরিশিষ্ট, মহাভারতের পরিশিষ্ট কাহিনী। হরিবংশ হলো মহাভারতের পরবর্তী গ্রন্থ। অর্থাৎ মহাভারতে যা আছে তা হরিবংশে নেই, আবার হরিবংশে যা আছে মহাভারতে তা নেই। এ দুটি মহাগ্রন্থ হলো পরস্পরের পরিপূরক।

পুরুষোত্তম কৃষ্ণের কর্মক্ষেত্র গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের

মধ্যে কখনও ধরে না বলেই তাঁকে উপচে যেতে হলো হরিবংশ এবং পরবর্তী গ্রন্থ বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের দিকে। আবার এদের পূর্ণ করে বা অপূর্ণ করে আবারও কৃষ্ণ কথা উপচে গেল অষ্টাদশ পুরাণের দিকে।* কৃষ্ণকে জানা এবং সেই সঙ্গে তাঁকে চেনা কোনকালে মানুষের ফুরোয় না বলেই এক জিজ্ঞাসা থেকে অন্য জিজ্ঞাসার আলোকিত প্রান্তরের দিকে সাগরে যাওয়া নদীর চলকানো স্রোতের মতোই অনন্ত উৎসারে ধেয়ে গেছে। সে প্রবাহ আজও অব্যাহত আছে।

হরিবংশ যে মভাভারতের পরবর্তী গ্রন্থ এ নিয়ে কোন বিভ্রান্তি নেই। কিন্তু একে মহাভারতের ঊনবিংশ পর্ব বা আশ্চর্য পর্ব বলায় এক অভিনব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এর ফলে হরিবংশ মহাভারতের অন্তর্গত একটি অভিন্ন গ্রন্থের মর্যাদা পায়। মহাভারতকে 'শত সহস্রী সংহিতা' বলার কারণে হয়তো খিল হরিবংশ নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'খিল' শব্দটি যুক্ত হলে হরিবংশ স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয় এরূপ হওয়ার পেছনে যুক্তিটা কি বিচার করে দেখা যাক।

পূর্বেই বলেছি, মহাভারতের আর এক নাম 'শত সহস্রী সংহিতা'। কারণ এর শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষ। কিন্তু মহাভারতকারের উল্লিখিত প্রতি পর্বাধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা যোগ করলে মোট শ্লোক সংখ্যা হয় ৮৪,০০০। অতএব লক্ষ শ্লোক পূরণের জন্যে হরিবংশকে মহাভারতের লেজুড় করে একলক্ষ শ্লোকের হিসেব মেলানোর চেষ্টা হলো। কিন্তু সেখানেও গোলমাল দেখা গেল। মহাভারতে উল্লিখিত হরিবংশের পর্বসংখ্যা দুটি : হরিবংশপর্ব এবং ভবিষ্যপর্ব। দুই পর্বের মিলিত শ্লোক সংখ্যা ১২,০০০। গোঁজামিল দিয়েও লক্ষ শ্লোক করা গেল না। চাব হাজার শ্লোক তখনও বাকি। প্রচলিত হরিবংশে পর্বসংখ্যা তিন : পূর্বোদ্ধৃত দুই পর্বের মধ্যপর্ব — বিষ্ণুপর্বের শ্লোক সংখ্যা ধরলে মোট শ্লোকের হিসেব ১৬,০০০-এর কিছু বেশি হয়। এ থেকে অনুমান করা যায় পরবর্তীকালে বিষ্ণুপর্ব হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। এ কারণেই হরিবংশকে মহাভারতের একটি 'আশ্চর্যপর্ব' বলে দাবি করা হয়েছে। কৃষ্ণই হলো সেই আশ্চর্য মানুষ। তাঁর জীবনকথা যেহেতু হরিবংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাই একে আশ্চর্য পর্ব বলা হয়েছে। এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় হরিবংশ মহাভারতের অন্তর্গত কোন পর্ব বা অধ্যায় নয়।

হরিবংশ সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। খিল কথাটির তা হলে তাৎপর্য কী ? হরিবংশ কাহিনী সম্ভবত জনপ্রিয় হয়নি। মহাভারতের জনপ্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত করে হরিবংশের গণসমাদর আদায় করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সে উদ্যম সফল হয়নি বলেই মহাভারতের মতো হরিবংশ অনূদিত হয়নি। মহাভারতের অনুবাদকেরা অষ্টাদশ পর্বের পরিশিষ্ট বা খিল

* অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে যেগুলিতে কৃষ্ণকথা আছে সেগুলি হলো যথাক্রমে — বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ, গরুড়পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণ, দেবীভাগবতম্।

অংশকে বর্জন করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ, বর্ধমান মহারাজা এবং হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রমূখ অনুবাদকেরা কেউই খিল হরিবংশ রচনায় প্রবৃত্ত হননি। এর ফলে, হরিবংশ সহজে স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের ভাষায় বলি : "হরিবংশ ভারতান্তর্গত একটি পর্ব নহে। উহা মূল মহাভারত রচনার বহুকাল পরে পরিশিষ্টরূপে উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। হরিবংশের রচনা প্রণালী ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হন।"

**হরিবংশের রচনাকাল :**

মহাভারতের কত পরে হরিবংশ রচনা হয়েছিল সঠিক করে বলা অসম্ভব। তবে, মহাভারত রচিত হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হওয়ার ৬৪ বছর পরে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয় খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ থেকে খ্রীঃ পূঃ ৯০০ অব্দের মধ্যে। আর হরিবংশ রচনা হয় কৃষ্ণের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপিত হওয়ার বেশ কিছু পরে। অর্থাৎ মহাভারতের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে। কৃষ্ণ ঈশ্বররূপে পূজিত হওয়ার সময়কালেই হরিবংশ রচনা সম্পন্ন হয়। পূর্বেই বলেছি, মহাভারতে যে হরিবংশের কথা বলা হয়েছে তাতে বিষ্ণুপর্ব ছিল না। পরবর্তীকালে, হরিবংশে তা অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্ভবত বিষ্ণুপুরাণ রচিত হওয়ার পরে এই অন্তর্ভুক্তি ঘটে। এথেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণের আগেই রচিত হয়।

হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ অপেক্ষা প্রাচীনত্বের দাবি করার পেছনে আরো একটি যুক্তি খাড়া করা যায়। গবেষকদের মতে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে রচিত প্রাচীন তামিল কাব্যগ্রন্থে বিষ্ণুপুরাণের উল্লেখ থাকার জন্যেই হরিবংশকে বিষ্ণুপুরাণের পূর্ববর্তী রচনা বলে দাবি করা অসঙ্গত নয়। দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের আগেই যে হরিবংশ রচনা হয়েছিল তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রও মন্তব্য করেছেন, 'অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে হরিবংশ অথবা অন্য কোন বৈষ্ণব পুরাণ প্রচলিত ছিল।' তাঁর আরও ধারণা হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণের আগে রচিত। কিন্তু আমার বিশ্বাস, হরিবংশ রচনার সময় কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাই, বিষ্ণুপুরাণের সঙ্গে হরিবংশের বিষ্ণুপর্বকে মিশিয়ে ফেলা কিছু অসংগত নয়। এছাড়াও দেখা যায় কৃষ্ণের লীলাকাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণের মতো অতিলৌকিক বাষ্পচাপ নেই। কৃষ্ণের জন্ম, শকটভঙ্গ, পুতনাবধ, কালীয় নাগ দমন, যমলার্জুনভঙ্গ অধ্যায়গুলি পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে সচেতন পাঠক তা লক্ষ্য করলেন। আরো একটা যুক্তি হলো বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণ চতুর্ভুজ, কিন্তু হরিবংশে দ্বিভুজ — মানবশিশু। হরিবংশে বিষ্ণুপুরাণের রূপকত্ব নেই। কাহিনী এখানে অনেক বাস্তব এবং লৌকিক।

**হরিবংশ ও মহাভারত পরস্পরের পরিপূরক**

হরিবংশ মহাভারতের অন্তর্গত কোন পর্ব নয় বলেই উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলি বিচার করে দেখা দরকার। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যেসব গ্রন্থ পাওয়া যায় মহাভারত

তাদের অগ্রজ। এর পরেই যে হরিবংশের স্থান, পূর্ব অনুচ্ছেদের আলোচনায় তা স্পষ্ট করে নির্দেশ করেছি। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় তৃতীয় গ্রন্থ বিষ্ণুপুরাণ।

সে যাই হোক, মহাভারতে কৃষ্ণ-পাণ্ডব সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত প্রধান। আর হরিবংশে আছে বৃষ্ণি বংশ এবং যাদব বংশের ইতিহাস। কৃষ্ণের জীবনের দিকগুলি মহাভারতে দেখানো সম্ভব হয়নি হরিবংশে তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তাই মহাভারতে যা আছে হরিবংশে তা নেই। আবার হরিবংশে যা আছে মহাভারতে তা নেই। এর কারণ হলো, মহাভারত পাণ্ডবদের বিজয় কাহিনী। সেই জয়ে সখা কৃষ্ণের ভূমিকা ও তার সহায়তার সকল বিবরণ আছে। কৃষ্ণকথার অবশিষ্ট দিকগুলি, যা মহাভারতে নেই তাই আছে হরিবংশে। মহাভারতের অসম্পূর্ণতা দূর করতেই মহর্ষি-নারদের পরামর্শে ব্যাসদেব হরিবংশ রচনা করলেন। এর ফলে হরিবংশ ও মহাভারত পরস্পরের পরিপূরক হলো।

মহাভারত মহাকাব্য। কিন্তু হরিবংশে মহাকাব্যের কোন প্রাসাদগুণ নেই। হরিবংশ নিছকই একটি আখ্যানকাব্য। পৌরাণিক লক্ষণাক্রান্ত। বলতে কি, হরিবংশই সর্বপ্রাচীন পুরাণ। যদিও অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে তার স্থান নেই। তবু পুরাণের সব লক্ষণই হরিবংশে সুস্পষ্ট। হরিবংশে কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হয়েই জন্মগ্রহণ করে।

প্রসঙ্গত বলব, মহাভারতের তৃতীয় বা পরবর্তী স্তরের আখ্যানভাগে হরিবংশের বেশ কিছু ঘটনা ও কাহিনী সংক্ষেপে মহাভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু মহাভারতের কোন উপাখ্যানই হরিবংশে প্রবেশ করেনি। মহাভারতের মতো জনপ্রিয় কাব্যে হরিবংশের উপাখ্যানের অনুপ্রবেশের ফলেই হরিবংশ'র জনসমাদর কমে যায়। কৃষ্ণের জন্ম এবং তার লীলা-রহস্যের চুম্বক ধীরে ধীরে মহাভারতের আখ্যানাংশে জায়গা করে নেয়, ফলে হরিবংশ'র আকর্ষণ ধাক্কা খায়। হরিবংশকে প্রক্ষিপ্ত করার লোভ তাই হরিবংশের কথকদের ভেতর ছিল না। মহাভারতের তুলনায় হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত ঘটনার পরিমাণ খুবই কম।

হরিবংশ এবং মহাভারত পাশাপাশি রাখলে স্পষ্টত মনে হবে হরিবংশ আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত একটি নিটোল কাহিনী। আদ্যন্তের মিল যোজনা করতে কৃষ্ণ এবং সখা পাণ্ডবদের কিছু প্রসঙ্গ ঘটনাসূত্রে আছে। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে মহাভারতের আখ্যানভাগের বিরোধ নেই। মহাভারতে সেই প্রসঙ্গ দুর্লক্ষ্য। শুধুমাত্র কৃষ্ণ জীবনবৃত্তান্তকে সম্পূর্ণ করতে এবং একটা সুগোল পরিণতি দান করতেই পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ যে বন্ধুত্বের ছিল বৃহৎ মহাভারত গঠনের কার্যে তারা যে একজন শরিক ছিল, এই তথ্যটুকু জানানো বোঝানোর জন্যই কৃষ্ণের বিশাল জীবনে পাণ্ডবরা একটা নক্ষত্রবিন্দুর মতো মিটমিট করছে। এই কারণেই হরিবংশ কৃষ্ণের জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। একটি নিটোল আখ্যানকাব্য।

**হরিবংশ ও পুরাণ :**

আধুনিক গবেষক পি. এল. বৈদ্য দু'খণ্ডে সম্পাদিত হরিবংশের ভূমিকায় বলেছেন : "Chronologically speaking Harivansa is the first and the oldest Purana that has come down to us. Its purpose is to give an account of the race of Vrsnis, tracing from Prajapati and giving details of some prominent members of that race. The present text of Harivansa in this Critical Edition fully bears out the above defination of Purana text." পুরাণের লক্ষণগুলি হরিবংশেই প্রথম প্রকাশ পায়। তাই একে প্রথম এবং প্রাচীনতম পুরাণ বলা হয়েছে। পুরাণের সব লক্ষণগুলি হরিবংশে বিদ্যমান। পুরাণ কাহিনীর মতো প্রথম অংশের প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে মঙ্গলাচরণ। নারায়ণকে স্তবের মাধ্যমে পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করেই এই মঙ্গলাচরণ। এরপরে উগ্রশ্রবা বা সৌতি নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষির প্রার্থনানুসারে বৈশম্পায়নের জবানীতে হরিবংশ কীর্তন করছেন। বলাবাহুল্য জনমেনজয়ের রাজসভায় বৈশম্পায়ন যে গল্প বলেছিল সৌতি বা উগ্রশ্রবা তার পুনরাবৃত্তি করেছে। উক্ত কাহিনী বর্ণনাসূত্রে সৃষ্টির উদ্ভব, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রহস্য, ব্রহ্মার আয়ু বর্ণনা, দেবদেবীর সৃষ্টি করা এবং সমগ্র সৃষ্টি তত্ত্বর সঙ্গে অঙ্কিত করে শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে বিষ্ণু-নারায়ণ এবং দশাবতারের অংশরূপে দেখানো হয়েছে, পুরাণগুলিতে সেই একই ভাবধারা অনুসৃত হয়েছে। এজন্য হরিবংশকে অষ্টাদশ পুরাণের জনক বললে অত্যুক্তি হয় না।

আঠারোটি পুরাণের মধ্যে কৃষ্ণকথা আছে দশটি পুরাণে। এগুলি যথাক্রমে — বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মাপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং দেবীভাগবতম্-এ কৃষ্ণ-বৃত্তান্ত আছে। এছাড়া নারদীয়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ-এ কিছু মাহাত্ম্যেরও বর্ণনা আছে। এদের মধ্যে সর্বপ্রধান মহাভারত। কিন্তু হরিবংশে কৃষ্ণকে জন্ম থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে পাই। জন্ম থেকে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, তারুণ্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্বের বিভিন্ন দিক-- কোথায়, কেমন করে, কিভাবে কেটেছে, কি কি করেছেন তিনি, এবং তার প্রতিক্রিয়াই বা কি প্রভৃতি তথ্য হরিবংশ প্রথম জানায়। এই তথ্য ও ঘটনাই পরবর্তীকালের পুরাণগুলির রচনার প্রেরণা এবং উপাদান। বলা বাহুল্য, হরিবংশের শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা; পুরাণ এবং ভাগবতে সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পুরাণ ও ভাগবতের কাহিনীর উৎস হরিবংশ। হরিবংশে যা পাই পুরাণ ও ভাগবতগুলিতেও তা পাই। মূল কাহিনীর রূপ এক। ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির যে ধ্যান-ধারণা ও ইতিহাস হরিবংশে আছে পুরাণ কাহিনীতে তা সম্প্রসারিত হয়েছে। কোথাও বা আবার অভিনবরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সর্বশক্তিমান পুরুষোত্তম কৃষ্ণের অতিমানবিক কার্য ও ক্ষমতা আরাধ্য হয়েছে উপরোক্ত পুরাণ ও ভাগবতে; ভক্তের চোখে পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন সর্বৈশ্বর্যময় ভগবান। এর ফলে, শ্রীকৃষ্ণ অনৈতিহাসিক ও অতিলৌকিক জগতের এক পরম পুরুষে পরিণত হলেন : কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।

**হরিবংশে : দেশকাল ও কৃষ্ণ**

হরিবংশে কৃষ্ণের জন্মের সময়কালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার যে বিবরণ আছে তা ইতিহাস। ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব — ভারতে এক নবযুগের সূচনা করলো। দেশকালের প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণচরিত্রের বিশ্লেষণ এবং বিচার করার প্রবণতা হরিবংশকে ঐতিহাসিক মহাকাব্যে পরিণত করেছে।

কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে সকল ইতিহাসবেত্তাই স্বীকার করেন। মহাভারতের পুরুষোত্তম এবং ভারতীয় পুরাণের প্রাণপুরুষ, ভারত-ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা এবং কূটনীতিবিদ কৃষ্ণের আবির্ভাবকালটি সঠিক নির্ণয় না হলেও আধুনিক ইতিহাস গবেষকেরা ভারতযুদ্ধের কাল গণনা করে কৃষ্ণের আবির্ভাবকালীন সময় নির্ণয় করেছেন। তাঁদের মতে, খ্রীষ্ট-জন্মের এক হাজার বছর আগে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর আবির্ভাবের সময় ছিল সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং উত্তেজনা। পরাধীনতা মথুরার জাতীয় জীবনকে আলো-বাতাসহীন কারাগারে আবদ্ধ রেখেছিল যেন। এই কারাগার আর কোথাও ছিল না, মানুষের মনের অভ্যন্তরে ছিল। কৃষ্ণ সেই কারাগারে জন্মগ্রহণ করে জাতীয় জীবনকে মুক্তি দিল অবারিত আলোর সীমাহীন জগতে। চরিত্রের মাধুর্যের গুণে, অদ্ভুত অলৌকিক ক্ষমতার গুণে, স্বচ্ছন্দ বুদ্ধির কৌশলে কৃষ্ণ বাল্যকাল থেকে মানুষের দেব-নির্ভরতা তাদের অক্ষমতা বীরত্ব এবং সর্বপ্রকার তামসিকতার উপর আঘাত হেনে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে এবং অদম্য নির্ভয়ে জনতাব নিদ্রিত সত্তাকে জাগ্রত করে স্বাদেশিকতাবোধে মাতিয়ে তুলল। মুক্তির চেতনার সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছিল দুর্জয় পৌরুষ এবং দুর্ধর্ষ শক্তিমত্ততা। সমস্ত জীবনের ভীরুতা, দ্বিধা, নির্বীর্য ব্যক্তিত্বের পরাহত মনোভাব, নিরুদ্যম মানুষের অপরিসীম লাঞ্ছনা এবং গ্লানি মথুরাবাসীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল দীর্ঘকাল। কৃষ্ণের আবির্ভাবের অল্পকাল পরেই তার অবসান হলো। কৃষ্ণ তাদের প্রাণের বীণায় সুর ভরিয়ে দিল। তাঁর হাতের বংশীদণ্ড তো তারই প্রতীক। অর্থাৎ, মানুষকে উদ্দীপিত এবং আহ্বান করার শক্তির জোরেই জনগণমন-অধিনায়ক কৃষ্ণ সারা বৃন্দাবন তথা সমগ্র ভারতবর্ষকে নাড়া দিল অন্তরে ও বাহিরে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থাই মানুষকে পথের সন্ধান দেয়। অনেক সময় গড়ে তোলে তাকে। কৃষ্ণের সমসাময়িক অবস্থাই তাঁর আগমনের পটভূমি। জাতি বর্ণ বিভক্ত সমাজে আচার প্রথার কঠোরতা, নানাপ্রকার বঞ্চনা, ঘৃণা, অবহেলা, লাঞ্ছনা, অপমান, বিড়ম্বনার পশ্চাতে যে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাৎপট আছে তার ঐতিহাসিক ভূমিকাটি কৃষ্ণের জীবনচরিতের সঙ্গে হরিবংশের পৃষ্ঠায় সমুজ্জ্বল হওয়ায় কৃষ্ণের গৌরব ও মর্যাদা দুই-ই বিস্তৃত হয়েছে।

শিশুকাল থেকে কৃষ্ণ দলনেতা, পল্লীর নয়নমণি। গণতন্ত্রী আদর্শ ও সাম্য মনোভাব না থাকলে কেউ সমদর্শী হতে পারে না। নেতৃত্ব দিতে গেলে একটা ভাবমূর্তি তৈরি অবশ্যই প্রয়োজন। তাই কি খেলায়, কি দুরন্তপনায়, কি দৈহিক শক্তিতে, বুদ্ধিতে কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। শিশুকাল থেকে কৃষ্ণ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। মানুষের শ্রদ্ধা, প্রীতি, অনুরাগ, ভালোবাসা ছিল কৃষ্ণের নেতৃত্বের মূলধন। কৃষ্ণই প্রথম ব্যক্তি যিনি মর্ম দিয়ে অনুভব করেছিলেন সমাজে সমতা সৃষ্টি করতে পারলে, মানুষে মানুষে বিভেদ-বৈষম্য দূর করে নির্বিচারে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে কোলে টেনে নিলে এক বিপুল গণবিস্ফোরণ ঘটানো যায়। সেই হবে প্রতিষ্ঠার রাজপথ। ঐ পথই বিপ্লবের এবং সাফল্যের। মথুরা, গোকুল, বৃন্দাবনে এই উপলব্ধির জোয়ার আনল। যদুকুলগুরু গর্গ জাতির দুর্দিনে কৃষ্ণকে মহানায়কের পদে বরণ করলেন। কিন্তু সে অভিষেক তো যাকে তাকে দিয়ে করলে হবে না। সুরভি গাভীর পবিত্র দুগ্ধ মন্দাকিনী জলে মিশ্রিত করে কৃষ্ণের অভিষেক করল স্বয়ং ইন্দ্র।

কৃষ্ণ প্রজ্ঞা দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিল, একমাত্র তরুণরাই পারে আদর্শের জন্য, সত্যের জন্য, অধিকারের জন্য অকাতরে নির্ভয়ে প্রাণ দিতে। জাতীয় জীবনে যৌবনের আবেগ সঞ্চার করতে কিশোর, তরুণদের সঙ্গে কিশোরী ও তরুণীদেরও ডাক দিলেন। ধর্মীয় উৎসবের আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলার মধ্য দিয়ে যত সহজ উপায়ে যত অধিক সংখ্যক মানুষের মেলামেশাকে অবারিত করা যায় ততই মানুষের অন্তরের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও জাতীয়তাবোধের দীপ জ্বলবে। রাজনীতি ও সমাজনীতি সচেতন যুব মানস অত্যাচার প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হবে। কৃষ্ণ সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারী রাজশক্তিকে আঘাত হানার জন্যে নিঃশব্দে তার জমি প্রস্তুত করছিল মথুরার বৃন্দাবনে। কৃষ্ণের বাল্যলীলায় এই সত্যটা বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে। আধ্যাত্মিকতার পর্দাটা সরালে দেখা যাবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে কর্ম- পরিকল্পনা একাকার হয়ে গেছে। মৎলিখিত 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম' উপন্যাস পাঠ করলে মহাভারত ও হরিবংশের কৃষ্ণের বাস্তব এবং কালোপযোগী ভূমিকায় ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে আরো স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

**কৃষ্ণ চরিত্রের উপাদান : ঐতিহাসিকতা : সমন্বয়**

কৃষ্ণ নামটি সুপ্রাচীন। মহাভারত রচিত হওয়ার বহু আগে কৃষ্ণনামের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষ পরিচিত। ভারতবর্ষের সর্বাধিক প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ ঋগ্বেদের পৃষ্ঠায় একাধিকবার একজন ঋষি কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালের রচনা ঋগ্বেদের খিল সূক্তে (১০/১) "কৃষ্ণ বিষ্ণো বাসুদেব হৃষীকেশ নমস্তুতে"— মন্ত্রে কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও বাসুদেবকে অভিন্ন করে দেখা হয়েছে। কিন্তু এ অভিন্নতা অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের সংযোজন এবং সমন্বয় তাতে সন্দেহ নেই। তবু গোটা বিষয়টা পর্যালোচনা করে দেখা দরকার।

ঋগ্বেদে উক্ত কৃষ্ণ যে মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতের বা অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণ নয় তাতে কারো সন্দেহ নেই। ঋগ্বেদের কৃষ্ণ অঙ্গিরসবংশীয়, আবার ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণ অঙ্গিরসবংশীয় এবং দেবকীপুত্র। হরিবংশ, মহাভারতের কৃষ্ণও দেবকীপুত্র হওয়ায় একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। অথর্ববেদে শ্রীকৃষ্ণকে দৈত্যের সংহারকর্তা বলা হয়েছে। হরিবংশে কেশী দৈত্যকে কংস কৃষ্ণবধ কামনায় বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিল। তার অত্যাচারে বৃন্দাবন শ্মশানে পরিণত হলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যা করে। কিন্তু এই অংশটুকু যে প্রক্ষিপ্ত অংশ তাতে সন্দেহ নেই। "জৈনদের মধ্যে গোষ্ঠীপতি হিসাবে বাসুদেব এবং বলরাম জনপ্রিয় ছিল। এছাড়াও জৈনগ্রন্থে কৃষ্ণ নবম বাসুদেব এবং দ্বারকার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। পরবর্তী কল্পে কৃষ্ণ দ্বাদশ তীর্থঙ্কররূপে আবির্ভূত হয়ে তদীয় বংশের দেবকী, রোহিণী, বলদেব ও নবকুমারের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হয়েন।" (হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী — ২য় পর্ব)। কিন্তু এখন এঁরা যে কেউ বাসুদেবের ঔরসজাত পুত্র একথা কোথাও বলা হয়নি। উপরোক্ত ধর্মগ্রন্থগুলি একাধিক কৃষ্ণের অস্তিত্ব এবং উল্লেখ থাকার জন্যে কৃষ্ণের নামরহস্য থেকেই যায়। কারণ, মহাভারত, হরিবংশের কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়বীর এবং একজন প্রজ্ঞাবান রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। ঋগ্বেদের ঋষিকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা কষ্টকল্পিত। উপরন্তু মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণের কৃষ্ণ তাঁর আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে নির্যাতিত মথুরাবাসীর সঙ্গে মথুরার এক অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে বাস করতেন। পরবর্তীকালে জরাসন্ধের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। ঋগ্বেদের কৃষ্ণ অঙ্গিরসবংশীয়, কিন্তু হরিবংশ বা মহাভারতের কৃষ্ণ যাদব গোষ্ঠীর অন্তর্গত বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত। তাই তিনি বার্ষ্ণেয় নামে পরিচিত। সুতরাং মহাভারত বা হরিবংশের কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্বোক্ত শাস্ত্র গ্রন্থের কৃষ্ণের কোন সম্পর্ক নেই।

হরিবংশের কাব্যকথায় শ্রীকৃষ্ণের বংশ-বৃত্তান্তে সেকালের ইতিহাসের সাক্ষ্য পাই। পাঠকের অবগতির জন্যে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষ-পুত্র যযাতি পৃথিবী জয় করে পঞ্চপুত্রকে তা ভাগ করে দিলেন। যদুর ভাগে পড়ল উত্তর-পূর্বাংশ। যদুর পাঁচ ছেলে সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নীল ও অঞ্জিক। সহস্রদের বংশে কার্তবীর্যার্জুন জন্মগ্রহণ করেছিল। কার্তবীর্যার্জুনের (১০ম পুরুষ) শতপুত্রের মধ্যে শূরসেন, শূর ধৃষ্টোক্ত, কৃষ্ণ এবং অবন্তিরাজ জয়ধ্বজ জীবিত ছিলেন। এদের বংশে ভোজ, অবন্তী, ভরত, বৃষণ প্রভৃতি যাদবেরা জন্মগ্রহণ করে। বৃষণকে হৈহয় বংশীয় বলেন অনেকে। হৈহয় (৪র্থ পুরুষ) যদুবংশের একজন রাজার নাম। হৈহয় বংশের পুণ্যশীল রাজা বৃষণের পুত্র মধু। বৃষণের পুত্রগণ বৃষ্ণি এবং মধুর বংশধর বলে মাধব নামে পরিচিত। যদুবংশের পুণ্যকর্মা ক্রোষ্টুর তিন পুত্র অন্যমিত্র, যুধাজিৎ, দেবমীঢ়ষু থেকে এই বৃষ্ণিবংশ তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে। বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজ। ক্রোষ্টার পুত্র অন্ধক ও ভোজ। ক্রোষ্টার পুত্র বৃজিনীবানের বংশে দেবক ও উগ্রসেনের (৩২তম পুরুষ) জন্ম। দেবক ও উগ্রসেনের

সন্তান কৃষ্ণজননী দেবকী এবং মাতুল কংস (৩৩তম পুরুষ)। বৃষ্ণিবংশের শূরসেনের (৩১ তম পুরুষ) পুত্র বসুদেব (৩২তম পুরুষ)। এই বৃষ্ণিবংশেই বসুদেবের পুত্ররূপে কৃষ্ণ ও বলরামের জন্ম (৩৩তম পুরুষ)। বিষ্ণুপুরাণেও একই বৃত্তান্ত কীর্তিত হয়েছে। এই বিবৃতি থেকে বিষ্ণুবংশকে যদুবংশের অন্তর্গত সাত্বত গোষ্ঠীর একটি শাখারূপে গণ্য করা হয়। এই হিসাবে কৃষ্ণ একই সঙ্গে যদুবংশে জাত বলে যাদব এবং মধুর বংশজাত বলে মাধব, বৃষ্ণির বংশসম্ভূত হওয়ায় বার্ষ্ণেয় আর বসুদেবের পুত্ররূপে বাসুদেব নামে পরিচিত।

বৃষ্ণিবংশের ঐতিহাসিকতায় সন্দেহের অবকাশ নেই। এই বংশেই জনগণমন-অধিনায়ক, মহাভারতের প্রাণপুরুষ কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও বলেন, কৃষ্ণ চরিত্রের ঐতিহাসিকতা এভাবেই প্রমাণিত হয়ে যায়।

ঐতিহাসিকদের মতে, কৃষ্ণের আবির্ভাব খ্রীঃ পূর্ব নবম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ভিতর। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস' (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন : "তিনি পার্থিব জীবনে ঐতিহাসিক মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায় ধর্মসংস্থাপন ও প্রকৃষ্ট কর্মানুশীলনের ফলে সমসাময়িক ও পরবর্তীযুগের ভারতীয় জনগণ কর্তৃক দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতে থাকেন।" (পৃঃ ১৯৮)। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থে অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। "ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণ, মহাভারতে কৃষ্ণ, আর শ্রীরাধার মানভঞ্জনকারী কৃষ্ণ এক কি না একথা জোর করে বলা শক্ত। কিন্তু আমার মনে হয় একই কৃষ্ণ ভক্তদের কৃপায় ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে শিখিপুচ্ছধারী ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম গোপীজনবল্লভ রাধিকারঞ্জন বংশীধর শ্যামসুন্দরে পরিণত হয়েছেন।" (পৃঃ ১৩)। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বৈদিক সূর্য বিষ্ণুর সঙ্গে অনার্য দ্রাবিড় সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক মানবকৃষ্ণের সংমিশ্রণে পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণের উৎপত্তি হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন।" হিন্দুদের দেবদেবীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (২য় পর্ব) হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য।

হরিবংশ ও মহাভারতে কৃষ্ণের জীবনের যে দুটি দিক চিত্রিত হয়েছে পরবর্তী পুরাণ কাব্যে তারই যুগ্মরূপ বিকশিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের যেমন শেষ নেই, মাধুর্যেরও তেমন অন্ত নেই। তাঁর ঐশ্বর্যলীলার প্রকাশ ঘটেছে মথুরায়, দ্বারকায়, ইন্দ্রপ্রস্থে এবং কুরুক্ষেত্রে। আর তাঁর মাধুর্যের দিব্য মধুররূপ মনোহরত্ব লাভ করেছে বৃন্দাবনে। মথুরা, দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র তাঁর কর্মভূমি। সেখানে তিনি যজ্ঞেশ্বর। হরিবংশে এবং মহাভারতে তাঁর নানা ভূমিকা, নানা বিচিত্র তার রূপ। সমগ্র ভারতভূমি জুড়ে তাঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত। তিনিই মহাভারতের যজ্ঞেশ্বর পুরুষোত্তম। তিনি দুর্বৃত্তের দমনকারী এবং মানুষের পরিত্রাতা, ধর্মসংস্থাপক। হরিবংশে তিনি প্রথম অর্চিত হন। মহাভারতেও শ্রেষ্ঠপুরুষের অর্ঘ্য পিতামহ ভীষ্ম সর্বজনসমক্ষে তাঁকেই অর্পণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণ পূজিত ও অর্চিত হওয়ার জন্যেই নাম সাদৃশ্য হেতু বেদের সূর্য, বিষ্ণু এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের অঙ্গিরসবংশীয় কৃষ্ণ মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে মিশে

গেছেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পুরাণেও কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর এই সমন্বয় ঘটেছে। সে জন্যেই মহাভারতের যুগে ভাগবতগীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করতে গিতে তাঁকে বিষ্ণু নারায়ণরূপে বর্ণনা করেছেন। এভাবেই কৃষ্ণকে নিয়ে একটি কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছে।

**অবতার তত্ত্ব :**

কালক্রমে, অর্চিত কৃষ্ণ মানব প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে পরম দেবতায় পরিণত হলেন। পরম ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব কৃষ্ণ দুর্বৃত্তের দমনকারী, সাধুগণের রক্ষাকারী এবং মানব পরিত্রাতার অবতারী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। সৃষ্টিধর্মের ক্রমবিকাশের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেলেন কৃষ্ণ। বিশ্বসৃষ্টির মূলে রয়েছেন তিনি। কৃষ্ণ ব্রহ্মময়। কৃষ্ণই এই বিশ্বসৃষ্টির মূল।

ঐশীশক্তির যত রূপ পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাই নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অবতারবাদ। কৃষ্ণ অবতারী বিষ্ণুর অংশ। কৃষ্ণকে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন করে দেখার জন্যই বিষ্ণুর পরম ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণচরিত্রে আরোপিত হয়েছে। কৃষ্ণও ভগবান হয়ে যান। তাই পুরাণে এবং শাস্ত্রে পরমব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিরক্ষার্থে অবতার মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। মানুষ এবং মনুষ্যেতর জীবরূপ পরিগ্রহ করে সৃষ্টির ধর্ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ঐশীশক্তির প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর অবতার রূপ প্রকাশ পেয়েছে। দশ অবতার রূপে কৃষ্ণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে। এই দশ অবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ এই চার মনুষ্যেতর রূপে ঈশ্বরের ঐশ্বরিক শক্তি নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। আর, তাঁর নররূপ ধারণ করে অধর্মের বিনাশ এবং ধর্মের ত্রাণ করতে এলেন পরশুরাম, রাম, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কি। এঁদের ভেতরে পরমপুরুষের দিব্যশক্তি এবং পূর্ণবিভা একমাত্র কৃষ্ণতেই মূর্ত হলো। হরিবংশ পাঠের সময় পাঠকবর্গ শ্রীকৃষ্ণের এই অবতার রূপ প্রত্যক্ষ করবেন।

হরিবংশে অবতারী শ্রীকৃষ্ণ, পৃথিবীকে আরো সুন্দরতর করার জন্য এবং তার পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য এবং মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার জন্য কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প ও রূপকথা আছে। পৃথিবী প্রথমে জলমগ্ন ছিল। সেই জলধিতে বিষ্ণু বা নারায়ণের অবস্থান। নারায়ণের কর্ণমল থেকে মধুকৈটভের জন্ম হলো। এই মধুকৈটভ নিয়ে এল দুনিয়ায় প্রথম উৎপাত। হরিবংশকারের নারায়ণ এবং মধুকৈটভ এই দুটি শব্দের নাম রহস্যের রূপক ভাঙলে এক অভিনব বৈজ্ঞানিক সূত্র বেরিয়ে পড়ে। 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা' শিরোনামায় তা আলোচনা করা হয়েছে। মধুকৈটভের (মধু অর্থে জল, কৈটভ অর্থে কীট) মৃত্যুর পর কীট ধ্বংস হলো। কিন্তু জলে রইল আর এক কীট। কীটের রাজা। জল ছাড়া বাঁচে না। পুরাণকার এই আদিম প্রাণীর কথা বলতে গিয়ে বললেন 'ঈশ্বর' প্রথম জীবে অবতার হলেন : মৎস্য।

তারপর জলেতে মাটি জাগল। সৃষ্টির ক্রমবিবর্তনের ধারায় আর এক শ্রেণীর জলচর, এবং স্থলচর প্রাণী জন্মাল। অর্থাৎ ঈশ্বর জীবে দ্বিতীয় অবতার হলেন কূর্ম। মৎস্যের পরে কূর্ম দেহের আঁশ হয়েছে শক্ত। বিদেশী ভূতত্ত্ববিদগণও বলেন এই সময়ে 'প্লিনিওসরস্' নামক এক অদ্ভুত দর্শনের জীব ছিল, যার মুখ গোসাপের মতো, দাঁত কুমিরের, ডানা তিমির, গলা রাজহাঁসের ধরনে — একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ আর কি। একেই হরিবংশকার এবং পুরাণকারেরা বললেন কূর্মঅবতার।

এরপর মাটি শক্ত হলো। নানারকম প্রাণী জন্মাল। তাদের জন্যে খাদ্য চাই। শক্ত মাটিতে উদ্ভিদ জন্মাবে কি করে? সেজন্যে দন্তী প্রাণী চাই। যে দাঁত দিয়ে খোঁচাতে পারবে। মাটি কর্ষণ করে উদ্ভিদ সৃষ্টির উপযোগী জমি তৈরি করবে। প্রয়োজনে একটু জায়গা হলেই জলে-স্থলে থাকতে পারবে। সৃষ্টিধারায় এই অদ্ভুত প্রাণীটির বিস্ময়কর অবদান স্মরণ করে পুরাণকারেরা বললেন ঈশ্বর জীবে-বরাহ হলেন। পুরাণে যে বরাহ অবতার : তার রোমগুচ্ছ ছিল পর্বত শৃঙ্গের মতো কঠিন অর্থাৎ শুধু দন্তী নয়, শৃঙ্গীও বটে অর্থাৎ দাঁত শিংওয়ালা জীব হলো ধীরে ধীরে। এদের ভেতর বরাহ আগে, তাই ভগবানের অবতার বলা হলো তাকে।

সৃষ্টি বিবর্তনের ধারায় বহু যুগ পরে উদ্ভব হলো আর এক নতুন আকৃতির প্রাণী। অর্ধ-মানুষ এবং অর্ধপশুর মিশ্রিত এক জীব। ফল ও পাতা তার খাদ্য। বুকে হাঁটে না, চার পা মেলেও চলে না, হাঁটে পায়ে। আবার গাছেও চড়ে। এরা মানুষের পূর্বপুরুষ, বনমানুষ, গরিলা, বানর প্রভৃতি। পুরাণকার একে বললেন নৃসিংহ অবতার। যার মাথা হতে কোমর পর্যন্ত নরাকৃতি এবং কোমরের নিম্নদেশ সিংহের মতো লেজবিশিষ্ট।

এরপরে মানুষের আবির্ভাব। নিখিল সংসারের পরিমাণে চেহারাটা তার 'বামন'। সৃষ্টি বিবর্তনের ধারায় লেজ খসে বা বাদ গিয়ে রইল 'নর' অর্থাৎ বনমানুষ হলো মানুষ। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল — এই ত্রিলোকে সে চরণ রাখল। ত্রিলোক বিজয় করল। ত্রিবিক্রম বামন হলো ঈশ্বরের পঞ্চম অবতার।

তারপরই মানুষ ধীরে ধীরে সভ্যতার পথে এগোল। কুঠার নিয়ে নির্ভয়ে জঙ্গল কেটে, পথে হেঁটে, শত্রুনাশ করে সে সংসার বসাল, গৃহ নির্মাণ করল, পত্তন করল গ্রাম, নগর, রাজ্য। মানুষের সভ্যতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রথম মশালচি হলেন অবতার পরশুরাম। এই যে পর পর জীবের জন্ম এবং সৃষ্টির বিবর্তন ও বিকাশ একেই বলে অবতারবাদ। এর পরে যুগে যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষরূপে যাঁরা আবির্ভূত হলেন, জগতের হিতের জন্যে যাঁরা নিজের জীবন নিঃস্বার্থভাবে উৎসর্গ করে জীবনধারা বদলে দিলেন, যাঁদের মহত্ত্বের আদর্শের আলো পড়ে মানুষের জীবনটা বড় হয়ে গেল। মানুষকে নতুন করে বাঁচতে শেখালো। যুগে যুগে অবতাররূপে তাঁরা পূজা পান।

**সৃষ্টিতত্ত্ব :**

সৃষ্টির বাস্তব ও বিজ্ঞানভিত্তিক রূপ দিতে গিয়ে কপিল, কণাদ প্রভৃতি ঋষিরা এবং শাস্ত্রকারেরা সৃষ্টিতত্ত্বকে নয়ভাগে ভাগ করেছেন। : 'বংশে তার বিস্তৃত তথ্য রয়েছে। প্রথম সৃষ্টি : মহত্তত্ত্ব — শক্তি ও পরমাণুর মিলনে সৃষ্টির যে সূচনা হয়েছিল তার কথা। এর সবটাই দেবতার লীলারহস্য সূত্রে ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় সৃষ্টির নাম : ভূতসর্গ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতে সৃষ্টির প্রারম্ভ। তৃতীয় সৃষ্টি হলো বৈকারিক যুগ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের উদ্ভব। পঞ্চভূত থেকে বিরানব্বইটি ভূতের মিলন। সেই মিলনে হলো নীহারিকা। সমষ্টি থেকে জ্যোতিষ্ক, সৌরজগৎ, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি। চতুর্থ সৃষ্টি হলো : মুখ্যসর্গ। এই সময় থেকে বস্তুময় পৃথিবীর উদ্ভব। দেখা দিল জল, সমুদ্র, পর্বত এবং সমতল প্রদেশ। বাসের উপযুক্ত হলো পৃথিবী। পঞ্চম সৃষ্টির নাম : তির্যকস্রোতা। জলে কীট জন্মাল। এঁকেবেঁকে চলে তারা, হাড় মাংস হয়নি। যা থেকে মধুকৈটভ কাহিনীর উৎপত্তি। এই স্তরে জন্মাল সাপ, কেঁচো, মাছ প্রভৃতি। ষষ্ঠ সৃষ্টি বা দেবসর্গ : উর্ধ্ব স্রোতের সৃষ্টি হলো। অর্থাৎ, আকাশের দিকে তার গতি হলো। এল পাখির দল। এবার জীব থেকে জীবের সৃষ্টি নয়, ডিম থেকে শাবক সৃষ্টির এক নতুন যুগের সূচনা হলো। সপ্তম সৃষ্টির নাম অর্বাকস্রোতা। অর্থাৎ বাক্য নেই, কার্য আছে। সন্তান হয়, স্তন্য পান করে, হাত পা দিয়ে মাটিতে চলে বেড়ায়, কিন্তু কথা বলে না। এরা কূর্ম, বরাহ, বানর প্রভৃতি। অষ্টম সৃষ্টি হলো অনুগ্রহ যুগ। এসময় জীব ধীরে ধীরে অনুগ্রহ ছাড়াই স্বাধীন ভাবে চলাফেরা শুরু করে। গ্রহণ বা ধরতে হয় না কিছুই। শিম্পাঞ্জী থেকে সে অভ্যাস ছড়াল বনমানুষ এবং পরে মানুষে। নবম সৃষ্টিকে কৌমার যুগ বলে। কুমারী কাল এল, কুমার পুরুষ হলো। মানুষ জন্মাল। মানুষের প্রথম রূপ হলেন স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা। তাঁর থেকে সৃষ্টি হলো মনু বা মানুষ। এই পর্যায়ে মৎ-লিখিত বিজ্ঞানভিত্তিক পৌরাণিক উপন্যাস : "মহাবিশ্বে মধুকৈটভ"-এ পুরাণকারদের বিজ্ঞান ভাবনায় এক দিগন্ত উন্মোচন করেছি।

**উপনিষদ ভাবনা :**

বেদের দেব-দেবী স্তুতি এবং উপনিষদে বিশ্বরহস্য ভেদের আকৃতি — এই দুই ধারার সম্যক প্রভাব হরিবংশের কাহিনীকে করেছে অধ্যাত্মসমৃদ্ধ। বলাবাহুল্য, হরিবংশের বহুপূর্ব যুগে বেদ ও উপনিষদ রচিত হয়েছে। তাই, কোন ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য বেদ-উপনিষদের ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত নয়। হরিবংশেও তার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে, উপনিষদের চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিবাদী মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হবে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে অভিন্নতা লাভ করেছে। ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনায় এবং দার্শনিক চিন্তায় প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে দৈবিক অলৌকিক এক শক্তিকে অনুভব করা এবং একটিমাত্র নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে বিশ্বের মৌলিক শক্তিরূপে গ্রহণের সূত্রে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা,

জ্ঞানমার্গে ও ভক্তিমার্গে সেই পরমপুরুষের রহস্যময় অবস্থান এবং পরমসত্তার অন্বেষণ প্রভৃতি ঔপনিষদিক চিন্তাধারার সঙ্গে হরিবংশের দর্শন এবং অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা মিলে যায়।

সৃষ্টি কোথা হতে এল? কেমন করে হলো? কে করল? দেবতা এক, না বহু? নিজেকে তিনি বহু করলেন কেন? এইসব জিজ্ঞাসার সদুত্তর বহু অধ্যায়ে আছে। বিশ্বসৃষ্টির মূলে একটি নৈর্ব্যক্তিক মহাশক্তি নিঃশব্দে কাজ করছে। সেই তেজোময় মহাশক্তি হলেন শ্রীহরি বা শ্রীকৃষ্ণ। এই জিজ্ঞাসার ফলে যে দর্শন গড়ে ওঠে তাতে বিশ্বসত্তা এক সর্বব্যাপী শক্তিরূপে প্রচ্ছন্ন। সমস্ত জীব, মানুষ, বস্তুকে জড়িয়ে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে সব কিছু ব্যাপ্ত করে আইন বলেই তাঁকে ব্রহ্মা বলা হয়েছে। মানুষের নিরন্তর অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল চরিতার্থ করার প্রবণতা থেকে এই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উদ্ভব।

বিশ্ব হলো সৃষ্টি। আর তার স্রষ্টা হলেন ব্রহ্মা। পরিব্যাপ্ত বিশ্বের মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্ন। এই হলো উপনিষদের ব্রহ্মবাদের মূল কথা। হরিবংশ ও অন্যান্য পুরাণে সেই উপলব্ধি ব্যাপ্ত হয়ে আছে। বিশ্ব সৃষ্টির মূলাধারে রয়েছেন সোহহং — তিনিই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি আকাশ- বাতাস ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সব কিছু ধারণ করে আছেন, সব কিছুর অন্তরে অধিষ্ঠান করছেন। হরিবংশের আদি ও অন্ত পর্বে বারংবার সেকথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বহুভাবে বলা হয়েছে। ব্রহ্ম কৃষ্ণময়। শ্রীকৃষ্ণই এই বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত শক্তি। ব্রহ্মা হয়ে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, নারায়ণ হয়ে জগৎ পালন করছেন এবং রুদ্ররূপে জগৎ সংহার করছেন।

সব পুরাণেই জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে এই ঔপনিষদিক উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে। হরিবংশে তার প্রথম প্রকাশ ও ব্যাপ্তি। ব্রহ্মমণ্ডলে পৃথিবী প্রথমে কি অবস্থায় ছিল, কেমন করে প্রাণের অঙ্কুর হলো, জীবের সমাগম হলো — তার বিস্তৃত বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানী কৌতূহল পুরাণকারদের চেতনা ও অনুভূতিকে আলোড়িত করল। তার কারণগুলির বর্ণনা বিজ্ঞান নির্দেশিত পথে হয়নি তবু চেষ্টা করলে বিজ্ঞানী ধ্যান-ধারণায় পৌঁছানো কিছু অসম্ভব নয়।

ব্রহ্ম যে বিশ্বের উপাদান এবং কারণ — এই কথাটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন, মৃৎপাত্রের উপাদান হলো মাটি, আর পাত্র হলো রূপ বা প্রকাশ। কিন্তু নিমিত্তের কারণ হিসাবে কুম্ভকার যে পাত্রটি নির্মাণ করে সে থাকে নেপথ্যে। তেমনি ব্রহ্মও বিভিন্নরূপে প্রকট হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়। এইভাবেই এক উপাদান বহুরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু তার সৃষ্টির নিয়ামক শক্তি বাহ্যত প্রচ্ছন্ন। আসলে, বস্তুর অভ্যন্তরে মৃৎপাত্রের নির্মাতা কুম্ভকারের মতোই স্থিত হয়ে আছে। অণুর মধ্যে যে প্রোটন, ইলেকট্রন সংহত হয়ে থাকে, তার নিয়ামক শক্তি তাদের অভ্যন্তরেই লুকিয়ে থাকে। যে শরীরটা নড়াচড়া করছে, চলছে ফিরছে, সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে তার নিয়ামক শক্তি কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে নিহিত। তেমনি বিশ্বজগৎও বিশ্ববিধানের স্বনিয়মে চলছে। সেই অদৃশ্য শক্তি-

সত্তার রহস্যকে ভক্ত আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে বহুরূপে কল্পনা করেছেন। তাই, তাঁর স্বরূপ অন্বেষণে ভক্তের তৃপ্তি নেই। বিবিধরূপে বিশ্বরূপের মধ্যে তাকে খুঁজেছে। এই খোঁজার যেমন শেষ নেই, তেমনি পরিতৃপ্তিও নেই। শেষ হয়েও হয় না তার অন্বেষণ। তাই হরিবংশের বিস্ময় ও কৌতূহল পরবর্তীকালের রচনা বিষ্ণুপুরাণ থেকে শ্রীমদ্ভাগবতে এবং অন্য পুরাণের দিকে সাগরে যাওয়া নদীর মতো অনন্ত উৎসারে বয়ে গেছে। ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির যে ধ্যান-ধারণা ও বৈশিষ্ট্য বেদ ও উপনিষদের পাতায় আছে তা হরিবংশ এবং পুরাণগুলিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। কোথাও বা অভিনবরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ভক্তের চোখে শ্রীকৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন সর্বৈশ্চয্যময় ভগবান। এর কারণ অদৃশ্য শক্তিরূপী বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বর এবং শ্রীকৃষ্ণ আলাদা নয়। তিনি বিশ্বশক্তিরই অংশ। বিশ্বের সব কিছুর মধ্যে বর্তমান। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতররূপে প্রকাশমান। সেই অচ্যুত ব্রহ্মের দিব্য ও অচিন্ত্যস্বরূপ বলেই তাঁর অনন্ত মহিমার কথা বারংবার স্তুতি করতে হয়ে। কি অপূর্ব সে স্তুতি।

**বিশ্ব আমির রচনার আসরে :**

বিশ্বসৃষ্টির উৎপত্তি সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। বুদ্ধির অতীতবোধের সে সন্ধান মিলেছে দর্শনে। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ তাতে তুষ্ট হলো না। জ্ঞানের রথে প্রজ্ঞার পথে চলল তার অন্তহীন সাধনা। বস্তুনিষ্ঠা জ্ঞানের রথে তার যাত্রা মহাসত্যের দুর্গম পথে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান প্রেয় কিন্তু বিজ্ঞান শ্রেয়। শ্রেয়কে সবাই চায়। প্রেয় দৃষ্টির অতীত এক সামগ্রী। তাকে শুধু অনুভব করা যায়। সে হলো মনের সামগ্রী। কিন্তু শ্রেয় হলো মনের বিচার। কিন্তু প্রাচীন ভারত বস্তুকে নয় আত্মিক তত্ত্বময় উর্ধ্বতর শক্তির সাধনা করেছে। কারণ, বিশ্বসৃষ্টির মূলে বিবিধ প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধি ও বোধের অতীত এক দুরূহ জিজ্ঞাসা। বাইরের জ্ঞান কিংবা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ রহস্যের কিনারা করতে যখন অক্ষম, মন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অনুভূতির গভীরের মধ্যে ডুবে গিয়ে বোধ ও বুদ্ধির অগম্য স্বরূপের দার্শনিক সত্য উপলব্ধি করে। বিশ্বসৃষ্টির মূলে এক পরম শক্তি নিঃশব্দে পৃথিবীকে তার প্রয়োজনে গড়ছে, ভাঙছে এবং বদলাচ্ছে। পৃথিবীর রূপান্তর, পরিবর্তন, বৈচিত্র্য, অভিনবত্ব, বিস্ময় সবই মহাশক্তিধর সেই পরমপুরুষের লীলা। তাঁর কাছে ব্রহ্মাণ্ড কেন, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি মুহূর্তের খেলা। তাঁর খেয়ালও বটে। নইলে, মহাশূন্যে মহাব্যোম থেকে বারিপাত হয়ে কেমন করে জলোধি হলো? সাগর থেকে মাটি, পাহাড়, মাথা উঁচু করে উঠল কার আদেশে? কার শক্তি-সামর্থ্যে সাগরের বুকে প্রাণের স্পন্দন জাগল? কার ইঙ্গিতে কি করে বীজকোষে এল জীব, জীবে এল প্রাণের আলো। জাগল স্ফুরণ ও চেতনা? — এর কোন উত্তর নেই। বিজ্ঞানের এই নীরবতা ভাঙতে দর্শন এগিয়ে গেল তার নিজের পথে, অনেক দূরে।

প্রত্যয় সৃষ্টির জন্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রয়োজন হয় দর্শনের। তাই দেখি, ব্রহ্মোপলব্ধি স্বরূপ অনুধাবনে উজ্জ্বল জ্যোতিসম্পন্ন সূর্যকে অবলম্বন করা হয়েছে। সূর্য ছাড়া ব্রহ্মা আর কে আছে যাকে দিয়ে বিরাট পুরুষের স্বরূপ বোঝানো যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সূর্য একমাত্র উজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জ জ্যোতিষ্ক। আপন আলোকে আপনি দেদীপ্যমান। সর্বলো পরিব্যাপ্ত তার তেজ। তীব্র রশ্মিসমূহ সর্বত্র প্রবেশের শক্তি রাখে। সূর্যের কোন স্রষ্টা নে নিজেই দৃশ্য সে। এছাড়াও সূর্যের স্বরূপে আছে একটি প্রশস্ত চৈতন্যময় অবস্থা। সূর্য স্থি শান্ত গম্ভীর, জ্যোতির্ময়। প্রকৃতিতে তার চাঞ্চল্য নেই, বিকার নেই। নিজের মধ্যে স্ব সম্পূর্ণ। সূর্য হলো আকাশের অধীশ্বর। মহাকাশ জুড়ে তার অনন্ত প্রতাপ, অখণ্ড কর্তৃ গুণকর্মের বিশ্লেষণে ব্রহ্মাকে সূর্য ভিন্ন অন্য কোন প্রাকৃতিক শক্তি বলে মনে হয় না। ব্রহ্মে স্বরূপের সঙ্গে সূর্য অভিন্ন। আবার সর্বশক্তিমান, প্রবল প্রতাপান্বিত সৃষ্টিকর্তা নারায়ণ এ বিষ্ণুর সমকর্মত্বের দ্বারা সর্বব্যাপী তেজশক্তিসম্পন্ন সূর্যের সঙ্গে একাত্মতা প্রতিপাদি করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সূর্য স্বরূপতঃ অভিন্ন। প্রতাপান্বিত সর্বশক্তিমান তেজসমন্বিত বাসুদে শ্রীকৃষ্ণ লোকোত্তর প্রতিভা, দূরদর্শিতা, বীরত্ব, নেতৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, গুণকর্মের বিচা বিষ্ণুরূপে সমাদৃত হলেন। কৃষ্ণের মহত্ত্ব ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিক। কর্মযোগী মহাপুরুষে মহান কর্মের একমাত্র বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গেই তুলনা করা চলে। বিষ্ণুপর্বে ১০৬ অধ্যা করুষরাজ মহাবল দন্তবক্র বলেন "ইহলোকে তিনি একজন প্রাকৃত মনুষ্য নহে দেবলোকেও তিনি দেবশ্রেষ্ঠ। অধিক কি তিনি কেবল দেবলোকের কেন, এই ত্রিলোকের স্রষ্টা" এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশরূপে সম্মানিত হলেন। বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের ভেদ বিলু হলো গীতায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করলেন : "আদিত্যানামহং বিষ্ণু" অর্থা আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু। বিবাদের নিষ্পত্তি হলো। মহাভারতের হরিবংশের শ্রীকৃ বিষ্ণুরূপে অর্চিত হলো। যশোদা দুলাল, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ হলেন বিষ্ণুর অবতারী রূ হরিবংশে তাঁর বিশ্বসৃষ্টির কৃতিত্ব বৃষ্ণিপর্ব পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। হরিবংশের প্রথম অধ্যা আছে, "বিষ্ণু হইতে বিরাটের উৎপত্তি হইল। পরে সেই বিরাট হইতে যে পুরুষের উৎপ হয় তাঁহার নাম মনু। মনুর পূর্বে ভগবান বিষ্ণু হইতে যে-সকল সৃষ্টি হইয়াছে উহা অযো সম্ভব। সুতরাং উহার নাম প্রথম সৃষ্টি এবং মনুর পর অবধি স্ত্রী-পুরুষ ধর্মানুসারে সৃ হইয়া আসিতেছে বলিয়া উহা দ্বিতীয় প্রজা সৃষ্টি নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ দ্বিতীয় সৃষ্টি নামই মন্বন্তর।"

আদি সৃষ্টির বর্ণনা প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত অধ্যায়ে হরিবংশকারের ভাষ্য : "ভগবান স্বয় প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন। জল নরের সুণু বলিয়া উ নার নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রথমে ঐ নার (জল) বিষ্ণুর অয়ন (প্রবেশ স্থান) হইয়াছি বলিয়া উহার নাম হইয়াছে নারায়ণ। পরে ঐ জলে বীজ নিক্ষিপ্ত হইল। সেই ভাসমা

বীজ হইতে একটি হিরণ্যবর্ণ অণ্ড উৎপন্ন হয়। ঐ অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মা জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। ভগবান হিরণ্যগর্ভ এক বৎসরকাল তথায় বাস করিয়া ঐ অণ্ড দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। উহার একভাগ স্বর্গ ও একভাগ পৃথিবী নামে অভিহিত হইল। এই পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যস্থলে যে স্থান রহিল উহার নাম আকাশ। তখন ভগবান স্বয়ম্ভু জল পরিপূর্ণ পৃথিবী ও সূর্যকে সৃষ্টি করিয়া পূর্বাদি দশদিক সৃষ্টি করিলেন।''

সূর্যের স্বরূপশক্তি ও পরমাত্মা একই প্রকাশের পূর্ণ এবং আংশিক এই দুই অবস্থা বোঝাতে হরিবংশকার ভবিষ্যপর্বের ২১৮ অধ্যায় লিখলেন : ''সূর্যদেব বসুন্ধরার মধ্যস্থল বিদীর্ণকরত উর্ধ্বে সমুত্থিত হইলেন। ........ ঐ কলেবর এমনি তেজঃপুঞ্জ বোধ হয় যে শরীর প্রভায় সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলে। ঐ দিব্যমূর্তি পুরুষ ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত হইলেন। বাস্তবিক উনিই নারায়ণ।'' — সূর্য যেমন নিজ স্থানে সর্বক্ষণ বিরাজ করে ভগবান বিষ্ণুও তেমনি স্বধামে সর্বক্ষণ অবস্থান করেন। যোগীদের পরমার্থিক ব্যাখ্যায় দেখি পরমাত্মা যে মন্দিরে, যে লোকে বিরাজিত, যে ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত তা এই দেহভাণ্ড। এই দেহেই তার সৃষ্টি আবার এই দেহেই তার লয়। সমস্ত জৈবিক প্রবাহ নিয়ে দেহটাই হয়ে আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। হরিবংশের ভবিষ্য পর্বের ২০৮ অধ্যায়ে আছে, ''বিকার নিরোধ হইলেই সেই সিদ্ধযোগীর শরীর হইতে নিরালম্ব ব্রহ্ম নির্গত হইয়া বাষ্পাদি মহাভূত অবলম্বনপূর্বক অদৃশ্যভাবে আকাশমধ্যে বিচরণ করেন। ইহলোকে মানবগণ ইন্দ্রসদৃশ বহু চক্ষু লাভ করিলেও তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না। কেবল যে ব্রহ্মসত্তম সাধু ব্যক্তিরা সমুদয় কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই ওঙ্কারভূত বিশুদ্ধ চৈতন্যপ্রাপ্ত হন, তাঁহারাই সেই যোগীকে দর্শন করিতে পারেন মাত্র। বিদ্বান ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ঐ ওঁকারই পরম ব্রহ্মস্বরূপ। ..... ঐ ওঁকাররূপী ব্রহ্ম সূক্ষ্মভাবে সর্বজীবে বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতে লিপ্ত নহেন।'' ওঁকারে প্রবেশ করা মানে ব্রহ্মে লীন হওয়া। ঐ ওঁকাররূপী ব্রহ্ম কে ? তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই রস, ঐশ্বর্যের এক পরমাশ্চর্য পদার্থ।

এইভাবে বুদ্ধি ও বোধের প্রশ্নে বুদ্ধির অতীত যে কথা আধ্যাত্মিকতায় মহান, তার নিগূঢ় রহস্য উন্মোচনে এক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ যাকে চোখে দেখা যায় না, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না, যার কোন রূপ নেই, যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্পর্শের অতীত — সেই নিত্য, বিভু, সর্বগত অত্যন্ত সূক্ষ্মই ব্রহ্ম। এক কথায় নিখিল বিশ্বই ব্রহ্মময়। সাধনা ছাড়া তার স্বরূপ জানা যায় না। সাধকের সাধন মার্গের পথে, প্রজ্ঞাবলে ধ্যানের ধারণায়, বোধে পরম তত্ত্বের যে ইঙ্গিত ঋষিরা হৃদয় দ্বারা অনুভব করেছেন, তার অমৃত কথায় সমৃদ্ধ হরিবংশের নামপর্ব ও ভবিষ্যপর্ব। আর বিষ্ণুপর্ব হলো পরম পুরুষের লীলাপর্ব।

ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডসমষ্টি শূন্যে অবস্থিত। যে শূন্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় সত্তা ভাসছে তাকে বলে ক্ষীরসমুদ্র। শুভ্র আকাশ জলধির ন্যায় প্রতীয়মান হওয়ার জন্যে তাকে ক্ষীর

সলিল নামে ভূষিত করা হয়। এই ক্ষীর সলিলের উপরে তিনি বিরাজমান। ব্রহ্মাণ্ডও শূন্যমধ্যে বিরাজ করছে। বাস্তবিক পক্ষে এই শূন্য; শূন্য নয়। এও সলিলাত্মক পৃথিবী সপ্তদ্বীপময়ী। সপ্তদ্বীপ সপ্তসমুদ্রে বলয়াকারে অবস্থিত। অমৃত সমুদ্রের উপর দেবতাদের ক্রীড়স্থল। এই স্থান সর্বদা সুধাময় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত বলে একে সুবর্ণভূমি নামে অভিহিত করা হয়। এসবই সাধনমার্গের কথা। প্রকৃতপক্ষে এই সপ্তদ্বীপ দেহাভ্যন্তরেই অবস্থিত। আধুনিক কবির ভাষায় 'দেহই অমৃতঘট, আত্মা তার ফেন অভিমান।' সাধক বলেন, সাধনায় নিজের শক্তি হলো উর্ধ্বগামী ষট্চক্র ভেদ করে ছয়লোক ডিঙিয়ে যেতে হবে সপ্তলোকে — ব্রহ্মলোকে যে উর্ধ্বগতির ক্ষমতা হয় পরম সাধনার বলে তাই ভারতের প্রকৃত সাধনার জ্ঞান। আর্য ভারতের এই স্থান নির্দেশ, এই ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ বর্ণনা অথবা সেই লোকপ্রাপ্তির সাধনা কি অপূর্ব! শব্দ ব্রহ্মের অপূর্ব অনুভূতির ফলশ্রুতি হরিবংশের ভবিষ্যপর্ব।

ব্রহ্মের নিরাকার রূপ কল্পনায় আসে না বলেই তিনি মূর্তিহীন। অনুভূতি উপলব্ধির গভীরে তাঁর দিব্য জ্যোতির্ময় রূপের অনুধ্যান চলে নানাভাবে। তাঁর প্রাণ নেই, মন নেই, তিনি শুভ্র এবং জন্মরহিত। অন্তরে ও বাইরে বিদ্যমান। তিনি অব্যক্ত, অনির্বচনীয় — সর্বভূতের অন্তরাত্মা; তাঁর থেকে এই বিশ্ব দুনিয়ার উদ্ভব। সেই বিরাটের কাল্পনিক রূপ দিতে নিরাকার থেকে সাকারে আভাস দিতে পুরাণকার বললেন দ্যুলোকে তাঁর মস্তক, চন্দ্র, সূর্য তাঁর দুই চক্ষু, দিক কর্ণযুগল, বায়ু প্রাণ, নিখিল বিশ্ব হৃদয়, আর পাদদ্বয় হলো পৃথিবী। সবই পরম স্রষ্টার পরম সৃষ্টি। পৃথিবীর প্রাণীকুল, উদ্ভিদ, সাগর, নদনদী, পাহাড়, বন, অরণ্য প্রভৃতি সৃষ্টি করতে পরমপুরুষ আপনাকে বহু অংশে বিভক্ত করলেন। হরিবংশকার বললেন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড একটি নয় অনন্ত। হরিবংশের পাতায় আছে সেই ব্রহ্মাণ্ডের বৃত্তান্ত। মর্তলোক থেকে স্বর্গলোক পর্যন্ত সপ্তলোকের সংবাদ, সপ্ত পাতালের কাহিনী। সপ্তলোক আর সপ্তপাতাল এই চোদ্দটি ভুবন নিয়েই ব্রহ্মাণ্ড।

**ব্রহ্মার আয়ু :**

মহাকালের রথচক্রে ব্রহ্মাণ্ড আবর্তিত হচ্ছে। সে আবর্তন চক্রে চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডেরও ধ্বংস হয়। আসে মহাপ্রলয়। মহাকালের আয়ুষ্কালের সে হিসাব দিতে ভোলেননি হরিবংশকার। অষ্টম অধ্যায় ও ১৯৭ অধ্যায় এবং আরো কিছু অধ্যায়ে তার গাণিতিক পরিসংখ্যা আছে।

উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সূর্যের গতি ও তেজ ভিন্ন ভিন্ন রকমের। সূর্যের গতিপথের হিসাব করে ব্রহ্মের কাল নিরূপণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে : পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়। ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত এবং ত্রিংশৎ মুহূর্তে এক অহোরাত্র হয়।' নিমেষে অর্থাৎ চোখের পাতা ফেলতে যেটুকু সময় লাগে, সেই অতি সামান্য সময়ের হিসাবে ১৫ বার চোখের পাতা পড়লে এক কাষ্ঠা। এইভাবে ৩০ কাষ্ঠা × ১৫ নিমেষ =

এক কলা। এইরূপে ৩০ মুহূর্তে একদিন। ৭ দিন বা অহতে এক সপ্তাহ। ১৫ দিনে এক পক্ষ, ৩০ দিনে এক মাস, দু'মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে দক্ষিণায়ন এবং অপর তিন ঋতু উত্তরায়ণ এবং ঐ দুই অয়নে এক বছর বা বারো মাস।

এর পরের হিসাব একটু জটিল হয়ে পড়ে। হরিবংশকার বললেন এক বছর হলে দেবতাদের এক অহোরাত্র। ৩৬০টি অহোরাত্রে এক দৈব বৎসর। বারো হাজার দৈব বৎসরে এক যুগ। এক হাজার যুগে এক ব্রহ্ম-দিন বা রাত্র। ত্রিশ ব্রহ্ম-দিন ও রাত্র মিলে এক ব্রহ্ম-মাস। বারো ব্রহ্ম-মাসে এক ব্রহ্ম-বৎসর। একশত ব্রহ্ম-বৎসরই ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল। বলাবাহুল্য, ব্রহ্ম, দৈব ও মনুষ্য — তিনটি আয়ুষ্কালই পৃথক। ব্রহ্ম বৎসরকে পার্থিব বৎসরে পরিবর্তিত করলে এক ব্রহ্ম-বৎসর = এক ব্রহ্ম-দিন × একহাজার দৈবযুগ × বারো বৎসর দৈববৎসর × তিনশত ষাট দৈব অহোরাত্র = মানুষের ৪৩২,০০,০০,০০০ বৎসর। ৪৩২ কোটি বছর ব্রহ্মার যেদিন উদয়, সৃষ্টির শুরু সেদিন। সেদিনটিতে মানবাকারের জীবের আবির্ভাব! এজন্য ৪৩২ কোটি বৎসর লাগল। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও অনুরূপ মত পোষণ করেন।

সৃষ্টির প্রথম যেদিন থেকে তুষারপ্রবাহ, সরীসৃপ, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, প্রভৃতি নানাবিধ যুগে ৪৩২ কোটি বৎসর অতিক্রান্ত হল। তারপর এল মানবাকারের জীব। ৪৩২ কোটি পার্থিব বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন রাত্রি হয়। একেই বলা হয় কল্প। প্রত্যেক কল্পে চোদ্দজন মনু রাজত্ব করেন। এক এক মনুর শাসনকালকে বলা হয় মন্বন্তর। আবার একটি মনুর শাসনকালে একাত্তরটি মহাযুগের হিসাবও আছে পুরাণের পাতায়। এক একটি মহাযুগ মানে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। যাদের মোট সময়ের পরিমাণ বারো হাজার দিব্যবৎসর। চার যুগের একত্রিত মান চারশো বত্রিশ কোটি পার্থিব বৎসর। একাত্তরটি চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। এক এক মনুর সময় একাত্তরটি সত্যযুগ, একাত্তরটি ত্রেতা যুগ, একাত্তরটি দ্বাপর যুগ এবং একাত্তরটি কলির আবর্তন ঘটে যায়। এই হিসাব আবার বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রকম। দিব্য বৎসরকে পার্থিব বৎসরে পরিবর্তিত করলে এক একটি যুগের সময় কাল দাঁড়ায় নিম্নরূপ (১৯৭ অধ্যায়ের হিসাব অনুসারে) : —

| | | |
|---|---|---|
| কলিযুগ | = ১২০০ দিব্য বৎসর × ৩৬০ | = ৪,৩২,০০০ পার্থিব বৎসর |
| দ্বাপর যুগ | = ১২০০ ” × ৩৬০ × ২ গুণ কাল কলি | = ৮,৬৪,০০০ ” |
| ত্রেতা যুগ | = ১২০০ ” × ৩৬০ × ৩ গুণ কাল কলি | = ১২,৯৬,০০০ ” |
| সত্য যুগ | = ১২০০ ” × ৩৬০ × ৪ গুণ কাল কলি | = ১৭,২৮,০০০ ” |
| মোট = ১২০০ | | মোট = ৪,৩২,০০০০ ” |

ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল শতবৎসর। যেদিন তার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয় সেদিন স্রষ্টা হন লুপ্ত। আসে মহাপ্রলয়। নতুন করে শুরু হয় আবার সৃষ্টি।

**বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা :**

প্রাচীন ভারতের দার্শনিক জ্ঞানসমৃদ্ধ জিজ্ঞাসা প্রজ্ঞার পথেই বিজ্ঞান চিন্তা এবং গবেষণার দ্বার খুলে দিল। বিশ্বাসের কাঠামোয় তা তৈরি। বেদ-বেদান্ত, উপনিষদের দেশে সৃষ্টিতত্ত্ব নির্ণীত হয়েছে অপরূপ এক পথ ধরে। বাইরে কমলার খোসা, ভেতরে তার কোয়া। তা হলে পূর্ণ কমলা কি? বাইরের খোসা, না খোলা ও কোয়ায় মেলানো ফলটা? দুইয়ে মিলেই কমলার পূর্ণতা। পৃথক করলে একটা সার, অন্যটা অসার। একটা অবিদ্যা, অপরটা বিদ্যা। তবু পরিচয় নেবার সময় দুটো এক হয়ে সামনে দাঁড়াবে। উপরের খোসাটা হলো — পুরাণের আখ্যায়িকা, আর ভিতরের শাঁস বা কোয়া হলো দর্শন বা বিজ্ঞান। বিদ্যা অবিদ্যার মিলনেই বিজ্ঞানসত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে পারমার্থিক বিচারের মোহ ত্যাগ করে পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি ও বিশ্লষণ নিয়ে এগোব বিজ্ঞানের পথে।

হরিবংশ থেকে কয়েকটা কাহিনী উল্লেখ করব। হয়তো তাতে সত্য-মিথ্যেয় ভরা বর্ণনার রূপক থাকবে ; তাই আমাদের প্রচলিত পুণ্যকথা ও ভারতের ধর্মবাণী। বোধ আর বুদ্ধি দিয়ে সত্যদ্রষ্টা ঋষির দেখানো পথেই যাব আমরা। অতি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলব। কবিত্ব ছেড়ে সত্য দর্শন করব। আবরণ কেটে বেরোলে তবেই সত্যদর্শন হবে।

ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় দিতে গিয়ে হরিবংশকার দেব-দেবতার যে অলৌকিক লীলার আখ্যান রচনা করলেন তার সঙ্গে সাম্প্রতিককালের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্য ও তথ্যের কোন অমিল নেই। বিরোধও নেই। সৃষ্টিতত্ত্বের গোড়ায় ঠিক কি হয়েছিল, সঠিক কেউ তা বলতে পারেন না। বর্তমান বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় গ্যাসীয় এক বিশেষ অবস্থা পেরিয়ে যখন সৃষ্ট এক গ্রহের দেহ আঁট বাঁধলো তখন হলো এই পৃথিবী। পুরাণকার সেই পৃথিবীর উৎপত্তির গোড়ার কথা বলতে গিয়ে কত অদ্ভুত সব গল্প বলেছেন।

সেদিন আলো, বাতাস, আকাশ, মাটি, জল কিছুই না। চারিদিকে ছিল শুধু অন্ধকার। তার মধ্যেই লুকিয়ে একটি ছোট্ট জিনিস। পুরাণকার তাকে বলেছেন পরমপুরুষ। বিজ্ঞানের পরিভাষায় পরমাণু। তাকে চোখে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না। তার কোন রূপ নেই, শব্দ নেই, বর্ণ নেই — সে অপ্রকাশ, অব্যক্ত, অনুত্তর! বাক্যে, চিন্তায়, অনুভবে তার অব্যক্ত অনির্বচনীয় সত্তার কোন থই পাওয়া যায় না। অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা তার রহস্য। বেদ ও উপনিষদ পারল না সেই পরমপুরুষের স্বরূপ উন্মোচন করতে। পারবে কেমন করে? চারিদিক জুড়ে শুধু অন্ধকার। আলো, বাতাস, আকাশ, মাটি, জল কিছুই নেই। কেবল সেই একমাত্র বস্তু পরমপুরুষ বায়ুহীন হয়েও টিকে ছিল তার মধ্যে। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণের বর্ণনা সমর্থন করলেন। পৃথিবীর জন্মলগ্নের সময় বিশেষ গ্যাসীয় অবস্থার অভ্যন্তরে যে অস্থিরতা তা থেকে নানারকম আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং রূপান্তর বিবর্তনের ভেতর দিয়ে এই জগতের উদ্ভব হলো।

পুরাণকারের মনে প্রশ্ন — কে করলেন ভূকম্পের এই লীলা? অগ্ন্যুৎপাত কার খেলা?

আবার দীর্ঘদিন পরে কে কিভাবে তা আয়ত্ত করলেন? কে আনলেন সৃষ্টির বীজ? নিজের জিজ্ঞাসাতেই ঋষিরা তখন বিভ্রান্ত। নানা মত ও পথ অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন জ্ঞানী বিভিন্নভাবে প্রমাণ করে গেলেন যে, 'একজন অজ্ঞেয় পরমস্রষ্টা আছেন ; যিনি পরমাত্মারূপে পুরুষ বা আত্মা ও প্রকৃতির মিলনে, জীব ও শক্তি সহযোগে সৃষ্টি করেছেন। পরিব্যাপ্ত এই অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল দুটি জিনিস। একটি ক্ষুদ্রতম কণা অথচ তার মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির বীজ। নাম তার পরমাণু। পরাণকারের পুরমপুরুষ।'

সৃষ্টিতত্ত্বের দ্বিতীয় স্তরে পরমপুরুষ আপনার নিঃসঙ্গ একাকীত্ব দূর করার জন্য এবং লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত আপনাকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনেই হয় সৃষ্টির প্রথম রচনার মহাতত্ত্ব। বিজ্ঞানী বললেন, পরমাণু অন্ধ জড়। তাই শক্তি ঘুরতে ঘুরতে (লীলারস বলা হয়েছে যাকে) যেমনই হাতের কাছে তাকে পেল, ধরলো। অণুর সঙ্গে শক্তির হলো মিলন। পুরাণকারের ভাষায় পুরুষ প্রকৃতির মিলন, আত্মার সঙ্গে শক্তির মিলন। এই মিলনেই হয় সৃষ্টির প্রথম রচনা মহতত্ত্ব। যেই শক্তি মিলল ; পরমাণুর কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল। বোঁ বোঁ করে তারা ছুটলো, দিগ্বিদিক ঘুরছে তো ঘুরছেই। বিজ্ঞানী বললেন, অণুর মধ্যে রয়েছে প্রোটন, ইলেকট্রন এবং নিউট্রন। পরমাণু অন্ধ জড়। আকস্মিকভাবে তার মধ্যে এল আর একটি জিনিস-শক্তি বা তেজ যার নাম। শক্তি ঘুরতে ঘুরতে যেই পরমাণুর সঙ্গে মিলল অমনি কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল। জড়ত্বের ঘুম ভাঙল। এক বিরাট ভাঙাগড়া চলল সেই অচল শূন্যতার ভেতর। অণুর সঙ্গে শক্তির এই মিলনকে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন বলা হয়েছে।

পৃথিবী-পৃষ্ঠে জলভাগ সৃষ্টি হতে এবং ভূ-ত্বক হতে লেগে গেল ২৫০ কোটি বছর। সৃষ্টিতত্ত্বের জটিল প্রক্রিয়ায় পৃথিবী-পৃষ্ঠে জলভাগ সৃষ্টি হওয়ার দরুন প্রথমে জলে এসেছিল জীব। একজাতীয় ক্ষুদ্র কীট। তাদের দেহাবশেষ থেকে কাদা পলি জমে উঠে কালক্রমে সৃষ্টি হয়েছে ভূ-ত্বক। এই বিজ্ঞান সত্যকে উপলব্ধি করেছেন সুপ্রাচীনকালের ঋষিরা। অজ্ঞ মানুষকে বোঝাতে মধুকৈটভের এক সরস উপাখ্যান তৈরি হলো। মধু অর্থে জল, কৈটভ অর্থে কীট। তেমনি নারায়ণ-এর 'নারা' হলো জল, আর সেই 'অয়ন' মানে থাকার জায়গা যিনি নিলেন তাঁর নাম নারায়ণ। মহাজলধির উপর অনন্তনাগের শয্যা নির্মাণ করে তিনি ভাসমান। অনন্তনাগের সহস্র ফণার বিষ নিঃশ্বাসের হিস হিস শব্দ — স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করল। পুরাণকার গল্পে গল্পে পৃথিবীর উৎপত্তির এবং জন্মের যে গল্প শোনালেন তা শুধু গল্প নয়, আরো কিছু। ধুলো আর গ্যাসের সংঘর্ষে একদিন সৌরমণ্ডল সৃষ্টি হলো। গঠনপর্বে সূর্যের অভিকর্ষের বেশ বড় ভূমিকা ছিল। গ্রহরা সব সূর্যের সন্তান। সূর্য একটা সুবিশাল গ্যাসীয় অগ্নিময় গোলক। অহরহ লক্ষ লক্ষ মাইল বিস্তৃত অগ্নিশিখাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিচ্ছে মহাকাশের বুকে। বলদর্পী ঐ সূর্য। সুবিশাল গ্যাসীয় বলয় পিঠে নিয়ে সূর্য তার অয়ন-পথে আবর্তন বেগ বজায় রাখতে অক্ষম হলো। একসময় সূর্যের আকর্ষণ ক্ষমতা থেকে ঐ বলয় অনেকগুলো টুকরো হয়ে ছিটকে গেল। সূর্য থেকে যতদূরে

সরে গেত ততই তাপ হারাল। তারপর বহুকোটি বছর পরে তাদের মধ্যে কেবল পৃথিবী গ্রহেই জল, মাটি, প্রাণী, গাছ, জীব উদ্ভব হলো। জীবসমাগমে শিবময় হলো পৃথিবী, অশিব-অকল্যাণ গেল দূর হয়ে। কার প্রভাবে এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটল? সৃষ্টি রহস্যের সব কথাই আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে চিন্তা করে। ভারত বিরাট পুরুষের বিরাটত্বের কাছে মাথা নুইয়ে সবিস্ময়ে উচ্চারণ করে : 'সকলই তোমার লীলা।'

পুরাণকার বলেছে, সূর্য থেকে দ্বাদশ আদিত্যের উদ্ভব। একালের বিজ্ঞানীরা বলল, সূর্য দশটি গ্রহের জন্মদাতা। পৃথিবীই সূর্যের ভাগ্যবান সন্তান। জন্মলগ্নে পৃথিবীর প্রতি সূর্যের আশীর্বাদ ছিল। তাই বোধ হয় দশটি গ্রহের ভেতর পৃথিবীই সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালিনী। জীবনের মূল উৎস পৃথিবীর পরিবেশেই ছিল বলে সূর্যের গ্রহদের মধ্যে সে একটি ব্যতিক্রম। সূর্য থেকে একটা বিশেষ দূরত্বে অবস্থান করার জন্য খুব বেশি তাপে পৃথিবী ঝলসে যাচ্ছে না অথবা ঠাণ্ডায়ও জমে যাচ্ছে না। পরিমিত পরিবেশের প্রভাবেই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বর্তমান রূপ।

একদিন মহাকাশে যে বিশালাকায় গ্যাসীয় মেঘ থেকে সূর্যের উৎপত্তি হয়েছিল — "ধুন্ধুবধ কথন" অধ্যায়ে তার গল্প বিবৃত করেছেন হরিবংশকার। 'ব্রহ্মালোকে' ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু ও ঋতু পরিবর্তনের প্রসঙ্গ নাই। ... মহাবল পরাক্রান্ত মধু রাক্ষসের পুত্র ধুন্ধু যোগবল অবলম্বন করিয়া ... যখন একবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করে তখন পৃথিবী কম্পিত হইতে থাকে। ধূলিপটল ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া সূর্যকে আবরণ করে। সপ্তাহকাল ভূকম্প হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, অঙ্গার ও ধূমোদ্‌গম হইতে থাকে।" পৃথিবীর উৎপত্তির ব্রাহ্মমুহূর্তে এরকমই এক আবহমণ্ডল ছিল। পৃথিবীর তাপ তখন খুব বেশি। আবহমণ্ডলেও ছিল না যথেষ্ট জলীয় বাষ্প। পৃথিবীর পৃষ্ঠ উত্তপ্ত থাকার জন্য বৃষ্টি হতো না। আবহমণ্ডলের জলীয় বাষ্পকে মধুরাক্ষস, উত্তপ্ত পৃষ্ঠকে ধুন্ধু বললেন। মধু অর্থে জল। বাষ্পে জলীয় কণার অস্তিত্ব বোঝাতে পুরাণকার 'মধু' এই নামবাচক শব্দ ব্যবহার করলেন। কিন্তু ঐ জলীয় বাষ্পের কোন বর্ষণক্ষমতা ছিল না। তার এই অশুভ অকল্যাণকর ধর্মকে বলা হয়েছে রাক্ষস। কিন্তু তার ক্ষতি করার মতো দানবিক ক্ষমতার বর্ণনা নেই। আছে তার পুত্র ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমা অর্থে তাপ। উত্তপ্ত পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে যে গ্যাসীয় ধোঁয়া নির্গত হতে লাগল সেই বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘের আকারে ভেসে উঠল পৃথিবীর আকাশে। কিন্তু পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে তখনও একটা অশান্ত অস্থিরতা চলেছে ভূকম্পন এবং আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে। এই অবস্থা শান্ত করার ক্ষমতা দেবতারও ছিল না। তাই ধুন্ধুমা ভীষণাকার, মহাবল পরাক্রান্ত। তার নিশ্বাসে অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহে আকাশ ধুলোয় ঢেকে গেল। কেমন একটা অস্থিরতা সৃষ্টি হলো ধরিত্রীতে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই অবস্থায় কাটল পৃথিবীর। তারপর একদিন প্রাকৃতিক কারণে বৃষ্টি নামল। উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ জলকে বাষ্পীভূত করে পুনরায় ফিরিয়ে দিল বায়ুমণ্ডলে। কিন্তু সে বৃষ্টির ফলে তাপ কমল। আখ্যায়িকার কুবলাশ্বের সাতানব্বই জন পুত্রের মৃত্যু তারই প্রতীক। অর্থাৎ পৃথিবী

তখনও মনুষ্যবাসের উপযুক্ততা অর্জন করেনি। ভূপৃষ্ঠের তাপে জল সঙ্গে সঙ্গেই বাষ্পে পরিণত হয়ে যায়। তারপর কুবলাশ্ব বরুণের তপস্যা করে বহুকাল কাটায়। বাষ্পীভূত জল ঘনীভূত হয়ে আকাশে যে মেঘ সৃষ্টি করল পুনরায় তা পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত ঘটাল। এই বৃষ্টির দরুন পৃথিবীপৃষ্ঠে যে জলভাগ সৃষ্টি হলো তাতে জন্মাল প্রথম জীব। ধুন্ধুমার অবসানে পৃথিবী শিবময় হলো। ঊষর মরু হলো সরস। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হলো মরুপ্রদেশ।

বৃষ্টিপাতের ফলে ধুলো, গ্যাসের-ধোঁয়ার অবসান হলো। নীল আকাশ বেরিয়ে পড়ল। আকাশের বুকে উদ্ভাসিত হলো এক জ্বলন্ত প্রকাণ্ড অগ্নিগোলক। এই অগ্নিপিণ্ড যে সূর্যদেব তাতে সন্দেহ নেই। সূর্য ভিন্ন অন্য কারো বর্ণনা এরকম নয়। সূর্যের উদয়, অস্ত এবং মধ্যাহ্নের প্রতিবিম্ব জলধি ছুঁয়ে রইল। তার উজ্জ্বল আলোয় ব্রহ্মাণ্ড হলো উদ্ভাসিত। ব্রহ্মার রূপ, রঙ, গুণ ও কর্মের সঙ্গে সূর্যের একটা অভিন্ন সংগতি আছে। সূর্যকিরণ পৃথিবীর চতুর্দিক ছড়িয়ে আছে, ব্যাপারটা বোঝাতে পুরাণকার ব্রহ্মার চতুর্মুখ ও চতুর্বাহুর কল্পনা করলেন। বিজ্ঞান সাধকের চিন্তার ধনগুলি পুরাণকার তাঁর নিজস্ব কল্পনা দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে সৃষ্টি করলেন। মানুষের প্রত্যয় জানানোর জন্যে পরমপুরুষ সম্পর্কিত বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁদের উপলব্ধিকেই একটা বস্তুরূপ দিলেন। রূপকে মোড়া কাহিনী অনাবৃত করলে পৃথিবীর জন্মলগ্নের রহস্য উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

নারায়ণের নাভিপদ্মে ব্রহ্মার আসন, পদতলে লক্ষ্মী, কর্ণমল থেকে মধুকৈটভের জন্ম প্রভৃতি খটমট প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকদের ভাবিয়ে তুলল। মহাপ্রলয় বলতে কোন সময়কে বোঝাবে? মহানিদ্রায় সুপ্ত ভগবান কোন সময়ের অবস্থা? অনন্তনাগের বিষ নিঃশ্বাস কী হতে পারে? এই সব প্রশ্ন বৈজ্ঞানিকদের মনে প্রশ্ন জাগালো।

ভূতত্ত্ববিদরা বললেন, প্রথম অবস্থায় পৃথিবীতে কোন ডাঙা ছিল না। চতুর্দিকে শুধু জল। সেই জলেই পৃথিবীর উৎপত্তি। কিন্তু এই জল কোথা থেকে এল? পদার্থ বিজ্ঞানীরা বললেন, বহু কোটি বছর আগে ধুলোকণা, হাইড্রোজেন এবং অন্যান্য গ্যাসীয় কণায় তৈরি বিরাট বড় বড় মেঘ মহাকাশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল, যেমন রয়েছে এখনো। তবে সেদিন আলো, বাতাস, আকাশ, মাটি, জল কিছু ছিল না। চারদিক ছিল অন্ধকারে আবৃত। পৃথিবীর জন্মের বহু পূর্বে এই অবস্থাকে পুরাণকারের বর্ণিত পরমব্রহ্মের যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে চিন্তা করলে কোন অসুবিধে হয় না। পরম ব্রহ্মের গুণ, কর্ম এবং ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের পরমতত্ত্বের প্রভেদ নেই। পরমব্রহ্ম আছেন সূক্ষ্মদেহে সূক্ষ্মতর রূপে। পরমাণুর প্রকৃতি ও ধর্মের সঙ্গে তাঁর কোন তফাত নেই। পরমাণুর মধ্যে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন। পুরাণকারও বললেন, পরমপুরুষ এক সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি করলেন ত্রিগুণ : ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। গুণ তাদের সত্ত্ব, রজ, তম। এইভাবে গোটা বিষয়টাকে মিলিয়ে চিন্তা করতে কোন বাধা হয় না। পরমপুরুষ থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি

ও বিকাশ। লীলারস আস্বাদনের জন্যে আপনাকে তিনি দ্বিধাবিভক্ত করলেন : পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বৈতের মিলনে সৃষ্টি হলো।

বিজ্ঞানীরা বললেন, পৃথিবী সৃষ্টির আগে একমাত্র পরমাণু সূক্ষ্ম দেহে বায়ুহীন হয়ে ছিল অনন্ত শূন্যের মধ্যে। পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁদের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হলো, লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়ে বিস্তৃত ধূলি ও গ্যাসের ঘনীভূত মেঘপুঞ্জ। একদিন কুণ্ডলীপাকানো ধুলো ও গ্যাসের কণার মধ্যে শক্তির স্ফুরণ ঘটল। সেই শক্তি মিলল পরমাণুতে, অমনি কি যেন ঘটে গেল তার ভেতরে। বিরাট বিস্ফোরণে 'কস্‌মিক এগ্' ভেঙে চৌচির হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল শক্তি বন্দিদশা থেকে ছাড়া পেয়ে চারদিকে দৌড়তে লাগল। হাতের কাছে যাকে পেল তাকেই ধরল। অণুর সঙ্গে শক্তির মিলন হলো। পুরুষ প্রকৃতির মিলন অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে শক্তির মিলন। এই মিলনেই হলো মহাবিশ্বের সৃষ্টি। কুণ্ডলীপাকানো ধুলো ও গ্যাসীয় কণাকে অনন্তনাগের কুণ্ডলীকৃত দেহ বলে কল্পনা করেছেন। হিস হিস করে তার বিষনিশ্বাস ছাড়ারও একটা অর্থ আছে। পৃথিবী সৃষ্টির অভ্যন্তরের অস্থিরতার প্রতীক। ধুলো ও গ্যাসীয় কণাগুলো জড়ো হতে হতে যখন একটা বড় পিণ্ডের আকার নিল তখন অভিকর্ষের বলের খেলা শুরু হলো। ধূলিকণা ও গ্যাসকণার মধ্যে অহরহ সংঘর্ষ চলতে থাকল। ছোট্ট কণা একে অপরের গায়ে আটকে বড় হতে আরম্ভ করল। মাধ্যাকর্ষণ বলে ক্রমেই গ্যাসীয় বৃত্তটি স্ফীত হতে লাগল। শুরু হলো প্রচণ্ড চাপ। সেই চাপে মহাবিশ্বের সমস্ত তাপমাত্রা বেড়ে গেল আরো দ্রুতগতিতে। গ্যাসীয় বস্তুর ভেতর ঘূর্ণিপাকের মতো কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অবর্তনচক্র গড়ে উঠেছিল। সংঘর্ষ ও আলোড়নে সেই অস্থির অবস্থাকে 'হিস্ হিস্' নিঃশ্বাসের শব্দে বাচ্যার্থ করে তোলা হলো। আর বিষনিশ্বাস বলতে বোঝানো হলো, মহাবিশ্বে বিষাক্ত গ্যাসীয় অবস্থাকে। কার্বন, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাসগুলি ছিল আবহাওয়া মণ্ডলে ছড়িয়ে। জীবন বিকাশের অনুকূল অবস্থা এই বিষাক্ত গ্যাসীয় স্তরে সম্ভব ছিল না; ধারণাটাকে মূর্ত করে তুলতে পুরাণকারের বিষনিশ্বাস শব্দটির প্রয়োগ যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত।

আর আকাশে যে বড় জ্বলন্ত গোলক তার নাম সূর্য। পরমপুরুষের বিরাটত্বের ধারণা জাগাতে সূর্যস্তুতি হয়েছে বিভিন্নভাবে। সূর্যের প্রাধান্য সব পুরাণেই বিশেষ রূপ লাভ করেছে। বিজ্ঞানীদের মতে সূর্যই এই দুনিয়ার মালিক। পুরাণকারেরাও সূর্যকে অনুরূপ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের বর্ণনায় কায়াহীন মহাশক্তিধর পরমপুরুষ সূর্যমণ্ডল অবস্থিত থেকে প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা সৌরজগৎ সৃষ্টি করলেন। সেই পরমপুরুষের দ্বারা সমুদ্রের জলরাশি ও মেঘস্থ জলরাশি সৃষ্টি হলো। বর্তমান বিজ্ঞানেও দেখা যায় চারশ কোটি বছর আগে ব্রহ্মাণ্ডে সূর্যই ছিল একমাত্র অধিবাসী। সূর্যের আলোকমণ্ডলে উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থের স্তরের সঙ্গে মহাবিশ্বের জমাট রজোগুণের প্রাবল্যে সৃষ্টিকার্য সম্পাদিত হয় বলে সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মার গাত্রবর্ণের রঙ লাল। সূর্য অনুরূপভাবে রক্তিম। সূর্য থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। সূর্যই সব। তবু প্রাণসৃষ্টির প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তুলতে

পারেনি সূর্য। সৃষ্টিকার্যের উপর ছিল না তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। তাই সূর্যরূপী ব্রহ্মার পক্ষে সম্ভব হয়নি মধুকৈটভের ত্রাস নিবৃত্ত করা অর্থাৎ মধুকৈটভরূপী সৃষ্টির বীজ নিয়ন্ত্রিত করা।

প্রকৃতির রাজ্যে পরীক্ষাগুলো চলেছিল অনেকটা এলোপাতাড়িভাবে। বিজ্ঞানের নিয়মে সবই হয়েছিল। তবু সে পরীক্ষা চলছিল অনন্তকাল ধরে। নির্লিপ্ত প্রকৃতির মতো পরমপুরুষও নিদ্রিত। সৃষ্টির অভ্যন্তরে বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে সুদীর্ঘকাল ধরে একটা পরিবর্তন এবং রূপান্তর চলেছে। মধুকৈটভের তেজ এবং আত্মপ্রকাশের গল্পে তার বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি ঘটেছে। এমনি অসংখ্য রূপক ছড়িয়ে আছে হরিবংশের পাতায়। মৎ-লিখিত "মহাবিশ্বে মধুকৈটভ' পুরাণ-ভিত্তিক কল্প-বিজ্ঞানমূলক উপন্যাসখানি অগ্রহী পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির সহায়ক হতে পারে বলেই এখানে গ্রন্থটির নাম উল্লেখ করলাম।

**মনুর সংসার :**

সৃষ্টির ক্রমবিবর্তনের পথে মানুষের আবির্ভাব। মানুষ জন্মের অবস্থায় পৌঁছতে পৃথিবীর ৪০০ কোটি বছর অপেক্ষা করতে হলো। তবু ধাঁধা রয়ে গেল। নরনারীর পৃথক দুটি সত্তার আবির্ভাব কেমন করে ঘটল; তার সমাধান করতে পারল না কেউ। ঋষি বললেন, ব্রহ্মা নিজের তেজে মনের ইচ্ছায় মানসপুত্র তৈরি করলেন, আর তাই স্বয়ম্ভুর ছেলে স্বয়ম্ভুবের নাম 'মনস্'। আর সেই মনস্ থেকে মনুষ্য বা মানুষ। অর্থাৎ পৃথিবীর ক্রমবিবর্তনের নিয়ম মেনেই প্রকৃতি থেকে উদ্ভুত হয়েছে নর-নারী। তাদের মিলনে হলো সৃষ্টি। এই সত্যটা বোঝাতে এবং লীলারস আস্বাদন করতে ব্রহ্মা নিজেকে দু'ভাগ করলেন — পুরুষ ও নারী।

আদিম মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে এরকম গল্পই প্রায় সারা জগৎ মেনে নিয়েছে। সব দেশের ধর্মগ্রন্থে ও পুরাণে এই গল্পেরই একটু হেরফের হয়েছে মাত্র। কিন্তু আদতে অভিন্ন তারা। মনু কথাটার সঙ্গে দুনিয়ার প্রায় সব জায়গায় আদিম মানুষটির মিল আছে। ইজিপ্টের আদিম মানব মেনস, গ্রীসে মিনস, লিজিয়ার মেনস, ক্রিজিয়ার মনিস, জার্মানিতে মেন্নুস, আদিম মানবের নাম বাইবেলে আদম, মুসলিমদের 'নু' (মনু থেকে) প্রভৃতি গল্পের রূপ এক। শুরু হলো মনুর সংসার। সে সংসার সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল। জয়যাত্রার পথে মানুষ এক এক দিকে এক এক কারণে গেল। নিয়ে গেল ঐ নামগুলোর ভাঙাগড়া নাম। যেমন আদিম থেকে আদম। মনু থেকে নু, মনিস, মেনস। মানুষের আগমনে পৃথিবী হলো সুন্দর। বিধাতার ভুবন পরিপূর্ণ হলো। 'হরিবংশ পর্বাধ্যায়ে' মানুষের সেই অভিযানের বহু আখ্যান রয়েছে। মানবকুলে কেমন করে বিভিন্ন প্রজাতি, গোষ্ঠী উদ্ভব হলো, বর্ণ ও গোত্র আলাদা হলো, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি হলো — দেব, দানব, দৈত্য, অসুর, গন্ধর্ব, রাক্ষস প্রভৃতি এক পিতার সন্তান হয়ে পৃথক হয়ে গেল কেন, কি কারণে পরস্পরের বৈরী হলো, প্রতিদ্বন্দ্বী হলো তার বহু বিবরণ আছে হরিবংশে এবং ভারতীয় পুরাণগুলিতে।

মনুর পুত্র-পুত্রী, নাতি-নাতনীদের নিয়ে শুরু হলো মনুর সংসার। ইনিই হলেন সমাজের প্রথম শাসক — রাজা বা নেতা। এই মনুই মানুষের সমাজকে সুন্দর এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে বিবাহ-প্রথা তৈরি করলেন, সমাজ গড়লেন, বহু রীতিনীতি প্রবর্তন করলেন। তাছাড়া যজ্ঞ, উপাসনা, সাধনার নানা প্রথাও রচনা করলেন। মনু থেকে যাদের উদ্ভব এবং প্রতিষ্ঠা তাদের বলা হলো মানব।

ব্রহ্মার বংশজ পুত্রদের মধ্যে পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, অর্থব্য, ভৃগু, কশ্যপ, অত্রি, অঙ্গিরা থেকেই যত বংশ আর গোত্র। মানুষের বংশবিস্তারের প্রথম যুগে একই পিতামাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তাদের পুত্রকন্যারা পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত থাকত। জননী ছাড়া আর সব নারীর সঙ্গে সঙ্গমে বাধা ছিল না পুরুষের। এই প্রথার প্রতিরোধ করতে গোত্র'র উদ্ভব হলো। "The Gotra is that sex organism of the primitive commune in which all husbands and wives are common to each other i. e.. there is group marraige." ......In such a group marriage the mother only could be known of identifiable parent and she by her position in the *yajna* economy dominated household; hence descent was in the mother line." - S. A. Dange. একই পিতার সন্তান হয়েও মায়ের নামানুসারে তারা বিভিন্ন গোত্রভুক্ত হলো। এইভাবে কশ্যপের স্ত্রী অদিতি থেকে দেবতা, দিতি থেকে দৈত্য, দনু থেকে দানব, সুরভি থেকে রুদ্র, খসা থেকে যক্ষ ও রক্ষ, সুরমা থেকে সর্প প্রভৃতি বিভিন্ন বংশ, গোত্র এবং প্রজাতির সৃষ্টি হলো। অনুরূপভাবে ভৃগুর বংশে ভার্গব, কশ্যপের বংশে কাশ্যপেয়, অত্রির বংশে আত্রেয়, অঙ্গিরার বংশে অঙ্গিরীয়গণের উদ্ভব হলো।

মানব বংশোদ্ভবের প্রথম দিকেই সবাই অসুর। তখন সুর, দেব, দানব, দৈত্য, রাক্ষস, যক্ষ — এসব নামও ছিল না, ভেদাভেদও ছিল না। গুণে মানে সবাই সমান। তার প্রমাণ ভৃগু হিরণ্যকশিপুর কন্যা দিব্যা এবং দনুর পৌত্রী পৌলমীকে বিবাহ করেন। ইন্দ্র বিবাহ করেন দনুর পুত্র পুলোমার কন্যা শচীকে। তারপর একদিন রাজ্যের লোভে, অর্থের লোভে, নারীর লোভে, শক্তির দম্ভে, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব স্থাপনের আকাঙক্ষায় তাদের মধ্যে দ্বেষ, বিদ্বেষ, কলহের সূত্রপাত হলো। বহিরাগত আর্যরা এদেশে পদার্পণ করার পর থেকেই মানব সম্পর্কের অবনতি ঘটে। আধিপত্য স্থাপনের জন্য এবং বিত্তের লোভে, সম্পদের লোভে যারা সর্বাগ্রে পৃথক দল গড়লেন তাঁরা হলেন সুর। এঁরা সবাই শ্বেতাঙ্গ আর্য। এদের সঙ্গে যাদের বিরোধ এবং শত্রুতা তারা অসুর হলো। মনুর সন্তানদের মধ্যে নিঃশব্দে শ্রেণীবিভাগ ঘটে গেল। বলাবাহুল্য এই বিভেদ বিরোধ আর্যরা তথা দেবতারা কৌশলে অন্তর্বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে সংহতি ভাঙল। এই বিবাদের শুরু এবং শত্রুতা, রেষারেষির আরম্ভ হিরণ্যকশিপুর থেকে। হরিবংশের পাঠক-পাঠিকারা আখ্যায়িকা থেকে তা অবগত হতে পারবেন বলে এখানে তার বিস্তৃত বর্ণনা থেকে বিরত হলাম।

ব্রহ্মা যে হরেক রকম প্রাণীর সৃষ্টি করেন; পৃথিবীতে তাদের বংশোৎপত্তির বর্ণনা আছে

তৃতীয় অধ্যায়ে। প্রাণিকুলের ভেতর মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিবলে মানুষ পৃথিবীর অধিপতি হয়ে বসল। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ও প্রাণিকুলকে হয় জয় করল, না হয় নিয়ন্ত্রণে রাখল। মানবভোগ্য হলো বসুন্ধরা। ভোগের রন্ধ্রপথ ধরে শয়তান প্রবেশ করল তাদের জীবনে। প্রভূত সম্পদ ও বিত্তের অধিকার নিয়ে বাধল ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ, পিতা-পুত্রের সংঘর্ষ। সে সংঘর্ষের আজও অবসান হলো না। বরং সেদিনের আসুরিক উন্মত্ততা, পাশব আক্রোশ বিভীষিকায় পরিণত হয়েছে।

পৃথিবীকে দোহন ও ভোগ করার অতুল ক্ষমতা অঙ্গের ছেলে বেনকে করল অহঙ্কারী। অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে বলল : ''আমিই নারায়ণ, আমিই পরমব্রহ্ম বা পরমেশ্বর।'' বেনের আদেশে বন্ধ হলো ঈশ্বর উদ্দেশে পূজা এবং যজ্ঞ। মানুষের দৈব-নির্ভরতা হ্রাস পেল। উগ্র আত্মস্বাতন্ত্র্য মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল করল। সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা নষ্ট হলো। মানুষের মঙ্গল কামনায় পুত্র পৃথু একদল মুনি, ঋষির সহায়তায় বেনকে হত্যা করে রাজা হলো। ক্ষাত্র ধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা হলো। পৃথু বেনের ভ্রান্তনীতির সংস্কার করতে সাধারণ মানুষের সমতলে নেমে এসে চাষীদের সঙ্গে ভূমি কর্ষণের কাজ থেকে আরম্ভ করে সবরকম কল্যাণমূলক কার্যের শরিক হলো। একজন আদর্শ রাজা হওয়ার জন্যে পৃথু সকলের প্রিয় হলো। তার নামানুসারে ধরিত্রীর নাম হলো পৃথিবী। পৃথিবী যে শুধু ভোগ করবার নয়, তার শ্রী, সম্পদকে সাজিয়ে গুছিয়ে আরো সুন্দর করার দায়িত্ব এই মানুষকেই নিতে হবে। একদিকে জননীর মতো পৃথিবী জীবকুলের ভরণপোষণের জন্য নিজেকে যেমন বিলিয়ে দেবে তেমনি তার প্রতিদিনের ক্ষয় এবং রিক্ততাকে সেবা আর যত্ন দিয়ে ভরিয়ে দিতে না পারলে সে মানুষ কিসের? পৃথু মানুষকে সেই সত্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

দিন দিন জনসংখ্যার চাপে মনুর সন্তানরা ভাগ্য ও খাদ্যের অন্বেষণে ছড়িয়ে পড়ল ব্রহ্মাবর্তে, আর্যাবর্তের সিন্ধু উপত্যকায়, গাঙ্গেয় সমতল ভূমিতে। ক্রমে মানুষ দুর্গম হিমালয়ের বাধা পেরিয়ে, বিন্ধ্যপর্বত ডিঙিয়ে দাক্ষিণাত্যের দিকে এগোল। এমন কি সাম্রাজ্য জয়ের নেশায় বহির্ভারতেও পাড়ি দিল নৃপতিরা। ফলে, বিভিন্ন দেশে এবং অঞ্চলে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যে অবাধ সংমিশ্রণ ঘটল তাতে রক্তের অবিমিশ্র বিশুদ্ধতা আর রইল না। বাসভূমি, ভাষা নিয়ে গড়ে উঠল দেশের সীমানা। জাতির বিচার। মানুষের এই বংশ বিস্তারের বৈচিত্র্য আর বিশালতা নিয়ে কত কাহিনীই না উৎপত্তি হলো। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, নাগবংশের উলুপী বভ্রূবাহন কথা, অসুর বংশের কন্যা শচীর সঙ্গে ইন্দ্রের বিবাহ, কৃষ্ণের সঙ্গে ঋক্ষ কন্যা জাম্ববতীর বিবাহের ঘটনা হরিবংশের আখ্যায়িকাতেই আছে।

মনুর সংসার বড় হয়ে পড়লে গুণ কর্ম বিভাগে যে শ্রেণীর উদ্ভব হলো তা বর্ণ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্বর্ণের মাধ্যমে আর্যরা বংশধারাকে ভাগ করে একটা সুন্দর সুস্থ সমাজব্যবস্থা এবং শাসন শৃঙ্খলা গড়ে তুলল। সমাজে সব লোক সমান গুণ ও কর্মসম্পন্ন

নয়। সকলের মনের গতিও সমান নয় তাই কর্মভেদে বর্ণ বিভাগ হলো। তারপরে জীবনযাত্রা আরো জটিল হয়ে পড়ল, তখন সমাজের নিয়ম অটুট রাখতে, শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, যে যে বর্ণের সন্তান, সেই বর্ণের পরিচয় হলো তার সামাজিক বংশের পরিচয়। বংশপরম্পরায় সে তার কুলগত বৃত্তিই করে যাবে। বর্ণের নিগড়ে তাকে শৃঙ্খলিত করার জন্যে নানাবিধ নিয়ম-রীতির উদ্ভব হলো। এর ফলে, কালক্রমে গড়ে উঠল নানাবিধ লোকাচার, বিধি-নিষেধ, খাদ্যাখাদ্যের বিচার, পাপ-পুণ্যের ইঙ্গিত। এইভাবেই প্রাচীন সমাজকে মজবুত এবং দৃঢ় করা হলো। হরিবংশের বহু অধ্যায়ে তার বর্ণনা আছে।

**মোহনা : সমন্বয়**

হরিবংশ দ্বাপর যুগের বৃত্তান্ত। তবু চার যুগের টানাপোড়ন ঘটেছে এখানে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর থেকে কলিযুগ পর্যন্ত যে সব যুগ-লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে তার পরিচয় আছে। মানব সভ্যতার প্রথম যুগের সরলতা, সততা, মানবতা, ধর্মপ্রাণতা যুগের অগ্রগমনের সাথে সাথে একটু একটু বদলাতে আরম্ভ করল। দৃষ্টির অগোচরেই নিঃশব্দে যুগের চরিত্র ও প্রকৃতি বদলে গেল। চারযুগের পরিবর্তনের রূপান্তরের ইতিহাস — অজস্র ঘটনার পাক খেতে খেতে আসছে। কলিযুগে তার পরিণতি যে আরও অবনতি প্রাপ্ত হবে এবং কিরূপে হবে হরিবংশকার তার স্পষ্ট আভাস দিয়েছেন। কলিযুগ বর্ণনা অধ্যায়ে তার সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। সর্বকালের পৃথিবীর বাস্তব পতন, অবক্ষয়, ধ্বংসের লক্ষণগুলো প্রকট হয়েছে। ইতিহাসের গতিপথেই যুগের সংকট দেখা দেয়, উত্তরণের জন্যে মানুষের কি প্রাণান্তকর চেষ্টা। তবু মুক্তি কোথায়? অধর্মের উৎপাত, লোভ ও স্বার্থের নির্লজ্জ ভ্রষ্টাচার, ব্যাপক দুর্নীতি, অন্যায়ের প্রশ্রয়, দুর্জনের দুঃশাসনে স্বেচ্ছাচারে, ব্যভিচারে সংযমহীন উচ্ছৃংখলতায় নিয়মনীতির অবহেলায় সমৃদ্ধি ও শ্রীর ক্ষয়, এবং দূষণীয় সামাজিক ব্যাধির ভয়ঙ্কর সংক্রামক রূপ মানুষের বাসস্থানকে কি করে নোংরা করে ফেলে, বসবাসের অযোগ্য করে তোলে দ্বাপর যুগের ইতিবৃত্ত থেকে হরিবংশকার তার বাস্তব পাঠ গ্রহণ করে সর্বকালের মানুষকে সতর্ক এবং সাবধান করেছেন। কলিযুগ অধ্যায়ে তাঁর সেই সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাঁর অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর থেকে সহজে প্রতীয়মান হয় যে কলি কোন স্বতন্ত্র যুগ নয়। সব যুগের গর্ভেই কলিরূপী অসুন্দর অসুর বাস করে। কীট যেমন ফুলের গর্ভদেশে বাস করে তার দলগুলিকে কেটে কেটে নষ্ট করে, ফুলকে শ্রীহীন করে, তেমনি কলি যুগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে মানুষের বহুপরিশ্রমে গড়ে তোলা সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে অনুরূপভাবে দৃষ্টির অগোচরে অসুন্দর করে, অবক্ষয়িত ধ্বংসের চিহ্নগুলোকে প্রকট করে। সে কথা বোঝাতেই হরিবংশকার কলিযুগের কথা তুলে আগামী প্রজন্মকে সাবধান করে দিয়ে কার্যত একজন সৎ-সামাজিক মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন। এ জন্যে তিনি আমাদের শ্রদ্ধার্হ।

**"অসূয়কায় অসৃজবে অয়তায় ন মাং দাঃ, বীর্য্যবতী তথা স্যাম—"**

(হিংসুক অবিশ্বাসী. মিথ্যাচারীর হাতে আমায় দিও না তবেই আমি থাকব বীর্যবতী।)

# ব্রহ্মাজির ব্লু প্রিন্ট

লঙ্কা এবং কুরুক্ষেত্রের মত দুটি মহাযুদ্ধকে চোখের উপর রেখে রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করলে দেখা যাবে একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ফলশ্রুতি এই দুই যুদ্ধ। আর এই দুটি যুদ্ধের বুদ্ধিদাতা ও পরিকল্পনাকার হলেন ব্রহ্মা। যুগল মহাকাব্য হল তাঁর সফল পরিকল্পনার রাজনৈতিক রূপায়ণের কাহিনী। অর্থাৎ দুটি মহাকাব্য পাঠ করলে জানা যায় বহিরাগতরা ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে কতকাল ধরে, কতভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে অনলস পরিশ্রম করে এদেশের আদি অধিবাসীদের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাদের অধিকার খর্ব করেছে। এ কার্যে ব্রহ্মার বুদ্ধি ও পরামর্শ সব।

রামায়ণ মহাভারতে বর্ণিত ব্রহ্মার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করলে তাঁকে একজন প্রজ্ঞাবান রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে মনে হয়। এর কারণ ব্রহ্মা পুরাণের দেবতা। বেদে, উপনিষদে তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই। বদরিকাশ্রম পেরিয়ে যে বৃহৎ পার্বত্য ভূ-ভাগ সেটাই ছিল হৈমবত বর্ষ। হৈমবত বর্ষের অন্তর্গত সুমেরু অঞ্চলের ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মা বাস করতেন।

সে যাই হোক, ব্রহ্মার ভূমিকাটুকু না বুঝলে যুগল মহাকাব্য দুর্বোধ্য থেকে যায়। কারণ উক্ত দুই মহাকাব্যে ব্রহ্মাজির পরিকল্পনামতই সব ঘটনা ঘটেছে। তাহলে ভারতের মাটিতে ব্রহ্মা কি করতে চেয়েছিল এই প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে।

যুগল মহাকাব্যেই অবতারদের আবির্ভাবের পশ্চাৎপটটি পাঠ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে দেবগোষ্ঠীর মন্ত্রদাতা এবং নেতা ভারতের মাটি থেকে দেবগোষ্ঠী বহির্ভূত জাতিগুলিকে খুব কৌশলে বিতাড়িত করে, অথবা তাদের দমন করে ভারত ভূ-খণ্ডে দেবজাতিরা নিজেদের জায়গা করে নিল। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজটা বহু শতাব্দী ধরেই চলছিল মুনি, ঋষিদের সহায়তায়। পরবর্তীকালে (অর্থাৎ মহাভারতে) দেবজাতীয়রা আপন আপন শৌর্য ও বীর্যবলে এক বিশাল আর্যাবর্ত প্রতিষ্ঠা করল। কালক্রমে, ক্ষাত্রগর্বে অন্ধ হয়ে ব্রহ্মা ও তাঁর এজেন্ট মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব, নির্দেশ এবং প্রাধান্যকে মানতে অস্বীকার করায় এক নতুন সংকট সৃষ্টি হল। এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে ব্রহ্মা এক অভিনব পরিকল্পনা করলেন। দেব-যাজকদের অনুগামী ও অনুরাগী মানবী মাতার গর্ভে

দেবপুত্র ও ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করে এক নতুন জাতির উদ্ভব ঘটালেন। কারণ, ব্রহ্মা বুঝেছিলেন, এক সার্বিক ধ্বংস ছাড়া নতুন রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্যে ব্রহ্মা সুপরিকল্পিতভাবে এক নতুন বংশধারা সৃষ্টি করলেন কুন্তীর গর্ভে।

যুগল মহাকাব্যের সূত্র ধরে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে কার্যকারণ সূত্রে আমরা যদি একটু অন্বেষণের চেষ্টা করি তাহলে হয়ত ইতিহাসের বন্ধ মলাটটা খুলে যাবে আমাদের জিজ্ঞাসু চোখের সামনে।

একথা স্বীকার করতে হবে যে, রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে ভারত ইতিহাসের সূচনায় আদি অধিবাসীদের সঙ্গে বহিরাগত আর্যগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব বিরোধের যে অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় তার মূল্য কম নয়। তার একটু পরিচয় নেওয়া যাক। অপুত্রক দশরথ পুত্রকামনায় যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছেন তার কোন বিঘ্ন যাতে না হয়, সেজন্য দেবগোষ্ঠীর লোকেরা ব্রহ্মাকে বলল, "ভগবন্! রাবণ নামে কোন রাক্ষস আপনার প্রাসাদে বীর্যমদে মত্ত হইয়া আমাদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে। আমরা কিছুতেই তাহাকে শাসন করিতে পারি নাই। ঐ দুর্মতি ত্রিলোক পরিতাপিত করিতেছে... সে বরলাভে মোহিত হইয়া সুররাজ ইন্দ্রকে পরাভব করিবার বাসনা এবং মহর্ষি যক্ষ, গন্ধর্ব, ব্রাহ্মণ ও অসুরগণকে তাড়না করিতেছে। ....আমরা সেই ঘোর দর্শন রাক্ষসের ভয়ে যারপরনাই ভীত হইয়াছি। এক্ষণে কিরূপে সেই দুষ্ট বিনষ্ট হইবে, আপনি তাহা উপায় অবধারণ করুন।"

উদ্ধৃতিই প্রমাণ করে যে রাক্ষসেরা ঋষিদের যজ্ঞানুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটায়। দেবগোষ্ঠীর এজেন্ট মুনি, ঋষি, ব্রাহ্মণদের দেবোপাসনা, ধর্মাচরণের পশ্চাতে আর্য উপনিবেশ স্থাপনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যটি আদিবাসী ভারতীয়দের কাছে গোপন ছিল না। আদি অধিবাসী রমণীদের গর্ভে তারা পুত্রোৎপাদন করে এক অনুগত নতুন জাতি সৃষ্টি করল (গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, বানর এই শ্রেণীর অন্তর্গত)। এরাই ছিল আর্য উপনিবেশ স্থাপনের বিশ্বস্ত সৈনিক। এইভাবেই দেবগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা ব্রহ্মার পরিকল্পনামত আদি অধিবাসীদের নিঃশব্দে উৎখাত করতে লাগল। তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ল। বহিরাগতদের ক্রিয়াকলাপে অসহিষ্ণু হয়ে তারা মুনি-ঋষিদের যাগযজ্ঞ নষ্ট করে তাদের বিদ্রোহ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল।

কিন্তু প্রশ্ন হল, রাবণ ব্রহ্মার আশীর্বাদপুষ্ট। তবু তার এজেন্টরা রাবণের বিরুদ্ধে নালিশ করতে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হল কেন? এই ঘটনা সম্ভবত দেবগোষ্ঠীর উপনিবেশ স্থাপনের দ্বিতীয় স্তরের সংকট। রাবণ বিশ্রবা মুনির ঔরসজাত এক অনার্যা রমণীর সন্তান। অর্থাৎ, দেবপুত্র ও ব্রাহ্মণ ঔরসজাত যে নতুন ভারতীয় জাতির সৃষ্টি হল তারা শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে বহিরাগত ব্রহ্মা ও তার এজেন্টদের কর্তৃত্ব ও বশ্যতা স্বীকার করল না। সেইজন্যে রাবণের সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধল। রাবণ আদি ভারতীয় গোষ্ঠীর মতই মুনি-

ঋষিদের কার্যের অন্তরায় হল। অর্থাৎ রাক্ষস স্বভাব ত্যাগ করল না বলে তাকে রাক্ষস বলা হল। এজন্য তার ধ্বংস ও পতন ঘটানোর জন্যে দেবগোষ্ঠী, যক্ষ, গন্ধর্ব, মুনি-ঋষিরা ব্রহ্মার বুদ্ধি ও পরামর্শ প্রার্থনা করল।

ব্রহ্মার এই নতুন পরিকল্পনা কার্যকরী করতে আরো কিছুকাল সময় লাগল। অনুগত দেবগোষ্ঠীর একজন নরপতি (দশরথ) বাছা হল। তার ঔরসজাত পুত্রদের (রাম-লক্ষ্মণ) নিয়ে একেবারে বাল্য থেকে মুনি-ঋষিদের তত্ত্বাবধানে ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করা হল। ভবিষ্যতে যাতে কোন সমস্যা পূর্বের মত উদ্ভব না হয় সেজন্য অবিমিশ্র আর্যরক্ত এবং তারা কতখানি দেবানুরাগী তা বিচার করে (ভরত-শত্রুঘ্ন বাদ দেওয়া হল। কারণ তাদের মা অনার্যা রমণী) তাদের ট্রেনিংএ পাঠানো হল (বিশ্বামিত্রের কাছে)। অর্থাৎ রামায়ণের রাম-রাবণের যুদ্ধ একটি সুপরিকল্পিত ঘটনা। সীতা উদ্ধারের কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথও "বানানো গল্প" বলেছেন।

পরিকল্পনা রচনায় ব্রহ্মার তীক্ষ্ণ মেধা যত পরিপক্ক তার ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে তত ফলপ্রসূ নয়। বিশুদ্ধ আর্যরক্তের উত্তরাধিকারীদের শৌর্য-বীর্য দিয়ে যে বিশাল আর্যসাম্রাজ্য স্থাপিত হল সেখানেও কালক্রমে দেবগোষ্ঠীর মন্ত্রণাদাতা ব্রহ্মার কোন কর্তৃত্ব থাকল না। মুনি-ঋষি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ক্ষাত্রশক্তির বিরোধ প্রবল হয়ে উঠল। এই দুই বিবদমান আর্যগোষ্ঠীর একপক্ষে পাণ্ডব, অন্যপক্ষে কৌরব। দেবগোষ্ঠীর বিরোধীদের ব্রহ্মা মহাভারতে "ভূ-ভার হরণ" অধ্যায়ে পৃথিবীর ভারস্বরূপ বলেছেন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণদের নির্দেশ দিলেন আর্যাবর্ত থেকে সেই মহাভার অপসারণ করতে।

সেরকম একটা ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হল। শান্তনুর সময় থেকে খুব ধীরে দেবপুত্র ও ব্রাহ্মণ ঔরসজাত এক নতুন ভারতীয় জাতির সৃষ্টি সুরু হল (অদ্রিকা>সত্যবতী>দ্বৈপায়ন> ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু>কুন্তীর মধ্য দিয়ে)। ব্রহ্মা তার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার জমি প্রস্তুত করে পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর গর্ভে দেব ঔরসে উৎপাদন করল দেবপুত্র। এবার তাদের হাতেই আর্যাবর্তের শাসনভার তুলে দেবার পরিকল্পনা ব্রহ্মার। কিন্তু দেববিরোধীরা সে পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেওয়ার সব রকম চেষ্টা করল। শক্ত হাতে ব্রহ্মা তার মোকাবিলা করার জন্যে খোদ স্বর্গে অর্জুনকে উন্নত ধরনের সমর শিক্ষা দিল এবং সেই সঙ্গে প্রচুর অস্ত্রও দিল। এরপর বিরোধীদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। দেব গোষ্ঠীর এজেন্ট পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্মিলিত ক্ষাত্রশক্তির মধ্যে সংঘর্ষ বাধল। এই যুদ্ধ কৌরব-পাণ্ডবদের ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব নয়। তা যদি হত তাহলে গোটা ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ এতে জড়িয়ে পড়ত না। হস্তিনাপুরের সিংহাসনে কে বসবে এই নিয়ে গোটা আর্যাবর্তের মাথা ঘামানোর কিছু ছিল না। আসলে এটা ছিল অস্তিত্ব রক্ষার স্বাধীনতা যুদ্ধ। তাই ভারতীয় রাজন্যবর্গ দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে লড়াই করেছিল নিজেদের স্বার্থে। যুদ্ধের শুরুতেই ব্রহ্মা আর্যাবর্তের রাজন্যবর্গের নৈতিক সমর্থন পাননি। তাই মুষ্টিমেয় রাজা দেবপক্ষের পাণ্ডবদের সমর্থন করেছিল। এক অসম

সামরিক ও গণশক্তির লড়াইতে দেবগোষ্ঠীর পাণ্ডবেরা মনোবল হারিয়ে সবরকম দুর্নীতি ও অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে যে কোন উপায়ে জয় আদায় করে নিল। দুই মহাকাব্যেই ব্রহ্মার ব্লু-প্রিন্ট ছিল দেবগোষ্ঠী বিরোধী বীরদের শ্মশানভূমি রচনা করা। বলা বাহুল্য সে কার্যে তিনি সম্পূর্ণ হয়েছেন। দেবগোষ্ঠীরা তাঁর জয়ধ্বনি দিয়েছে ব্রহ্মাজি কী জয়। সে জয়ে মানুষের কোনো সার্বিক কল্যাণ কিংবা মঙ্গল হল না। এক সর্বাত্মক ধ্বংস যে শ্মশান সৃষ্টি এই দুই মহাকাব্য যতদিন থাকবে ততদিন মানুষ ভুলবে না।

# অযোধ্যার সিংহাসন

যোধ্যার সিংহাসনে রামচন্দ্রের অভিষেককে কেন্দ্র করে যে জটিলতা উদ্ভব হল তার স্রষ্টা শরথ নিজে। আংশিকভাবে রামচন্দ্রও কিছুটা দায়ী। কিন্তু কৈকেয়ীর কোনো দোষ নেই। তবু ামচন্দ্র'র বনবাসে যাওয়ার জন্য তাকে দোষী করা হল। সে দোষ হাজার হাজার বছর পরেও গল না। সত্যিই কি কৈকেয়ী দোষী? প্রশ্নটা বড় হয়ে ওঠে যখন রবীন্দ্রনাথও বলেন, পিতৃসত্য ক্ষার জন্য রামচন্দ্রের বনগমন পরবর্তীকালের একটা বানানো গল্প। তখন কেমন যেন ামকে যেতে হয়। নতুন করে ভাবতে হয় অযোধ্যার সিংহাসনেব উত্তরাধিকার নির্বাচন নিয়ে শরথ এত চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন কেন? তাঁর সব উৎকণ্ঠার মূলে আছে কৈকেয়ীর পুত্র ভরত। ারণ তাকেই রামচন্দ্রের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছে দশরথ। কিন্তু কেন?

রামায়ণ পাঠকেরা জানেন, ভরতের সঙ্গে রামচন্দ্রের কোনো বিরোধ নেই। বরং সে ্যতান্ত ভ্রাতৃবৎসল এবং রামের খুবই অনুগত এবং বাধ্য। কৈকেয়ীও সপত্নীপুত্র রামচন্দ্রকে ীষণ ভালোবাসেন। রামচন্দ্র তাঁর কাছে পুত্রাধিক প্রিয়। তবু রামচন্দ্রের অভিষেক সম্পর্কে শরথের মনের সংশয় ঘোচে না। অযোধ্যার নরপতির নিরন্তর এই উৎকণ্ঠা রামায়ণ পাঠককে াভাসে ইঙ্গিতে অবহিত করে যে অযোধ্যার সিংহাসনে রামের দাবির একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বা াতিপক্ষ আছে । আর সে প্রতিপক্ষ নিশ্চয়ই ভরত। মজার কথা, ভরত কিংবা তার মা কৈকেয়ী সেই কথা জানে না। তবে, ব্যাপারটা দশরথ ছাড়া আরো কেউ কেউ জানে। দশরথের য় সেকারণে। পাছে, সেকথা ফাঁস হয়ে যায় তাই দশরথ খুব সাবধানে চুপি চুপি রামের ভিষেকটা সেরে ফেলতে চান। অযোধ্যার সিংহাসনে রামের অভিষেকটা ভালোয় ভালোয় মেটা পর্যন্ত দশরথ স্বস্তি পাচ্ছেন না। যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ ভরত এবং কৈকেয়ী কাঁটার বিঁধে আছে মনে।

রামচন্দ্রের অভিষেকের দিন পর্যন্ত কৈকেয়ী দশরথের কাছে কোনো অন্যায় আব্দার কিংবা করনি যাতে রামের অভিষেক অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং দশরথকে নিরন্তর দুশ্চিন্তায় হয়। তবু দশরথের সব ভয় কৈকেয়ীকে। তাকে দেয়া তিনটি প্রতিশ্রুতিই কি উদ্বিগ্ন রছে তাঁকে। প্রতিশ্রুতি তিনটি যে কি; কেউ জানে না। কৈকেয়ীও না। তবে, কৈকেয়ী তার যে কোনো সময়ে তা দাবি করতে পারে।

দশরথের তাই ভাবনা হয়। স্বার্থপরের মত কৈকেয়ী যদি সপত্নীপুত্র রামকে বঞ্চিত করে ভরতের জন্য সিংহাসন দাবি করে , এই আশঙ্কায় দশরথের সুস্থ থাকা মুশকিল হল। কিন্তু রামায়ণ পাঠক জানেন, পুত্রাধিক রামকে কৈকেয়ীর অদেয় কিছু নেই। নিজের মায়ের চেয়ে কৈকেয়ীকে বেশি ভালোবাসে রাম। প্রকারান্তরে রামের কারণে ভরতকে মাতুলালয়ে পাঠানো হল। কৈকেয়ীর শূন্য কোল রামকে স্থানান্তরিত করে দশরথ রামের নিরাপদ অভিষেকে পথ প্রশস্ত করলেন। দশরথের অভিপ্রায় সম্পর্কে কৈকেয়ীর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। ভরতের শূন্য স্থানে রামকে বসিয়ে সে খুশ মেজাজেই ছিল। অপরপক্ষে ভরতও মায়ের সঙ্গে থাকার জন্য কোনো পীড়াপীড়ি করেনি। সেও মামার বাড়িতে বেশ যত্নে ও আদরে ছিল। তা-হলে কৈকেয়ীকে দশরথের ভয় পাওয়ার কী আছে? এক কাল্পনিক ভয় ও উৎকণ্ঠা বুকে করে দিন যাপনের গ্লানি ভোগ করার মত কোনো কারণ ছিল না দশরথের। তাঁর এই আশঙ্কাই প্রমাণ করে অযোধ্যার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ব্যাপারে কোথাও কোথাও একটা লুকনো রহস্য আছে।

গোয়েন্দা গল্পের মত রামায়ণের কবি দশরথের উৎকণ্ঠার মধ্যে পাঠককে এমন মজিয়ে রেখেছেন যে, কোনো কিছু যেন তার নজর এড়িয়ে না যায়। তবু দশরথের দুর্ভাবনার রহস্য ভেদ করতে পারল না পাঠক। একবারও জানবার কৌতূহল হল না দশরথের ভরত ভীতি কেন অমূলক? কৈকেয়ীর তিনটি প্রতিশ্রুতির নাট্যচমক, দশরথের ভয়, উদ্বেগ দুর্ভাবনার প্রতি সহমর্মিতা এবং রামভক্তির এক ত্রিবেণী সংগম সৃষ্টি হয়েছে অযোধ্যাকাণ্ডে। সংগমের এ ঘূর্ণিপাকের আবর্তে কৈকেয়ী ও তার পুত্রকেই ভেসে ওঠতে দেখল পাঠক। রামায়ণ কবি আশ্চর্য লেখনীর গুণে কৈকেয়ী সম্পর্কে পাঠকের অন্তরে এক বিরূপতা সৃষ্টি হল।

কেকয়রাজ অশ্বপতির অপরূপ সুন্দরী কন্যা কৈকেয়ীর রূপমোহে আকৃষ্ট হয়ে দশরথ তাকে বিয়ে করতে চাইল। অশ্বপতি বৃদ্ধ রাজার মনোবাঞ্ছা পূরণের কতগুলি শর্ত দিলেন তার মধ্যে অন্যতম হল কৈকেয়ীর গর্ভের সন্তান ছাড়া অন্য কেউ অযোধ্যার রাজা হতে পারবে না। এই শর্ত মানলে তবেই কৈকেয়ী ও দশরথের বিবাহ হতে পারে। সন্তান প্রজননে অক্ষম দশরথ, অশ্বপতির প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। কারণ, ঐ প্রতিশ্রুতি পালনের কোনো দায়িত্ব তাকে বহন করতে হবে না। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে কনিষ্ঠা রানী কৈকেয়ীর সঙ্গে বিবাহের অল্পকাল পরেই দশরথ পুত্রের জনক হল। শুধু কৈকেয়ীর নয়, বড় ও মেজরানীর গর্ভে মোট চারটি সন্তান হল। অযোধ্যার সিংহাসনকে উত্তরাধিকারী সংকটের সেই সূচনা। সংকটের কেন্দ্র কিন্তু রাম-ভরত নয়, আর্য-অনার্যের রক্ত সংস্কার এবং ব্রাহ্মণ্য শক্তির সঙ্গে ক্ষাত্র শক্তির বিরোধ। রাম ভরত শুধু উপলক্ষ। বলা যায়, বিবাদের দুটি পক্ষ। দশরথ উভয় সংকটে পড়ে দোদুল্যমান।

রামায়ণের কবি খুব রসিক। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব উপভোগ করার জন্য তিনি এক আশ্চর্য সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি করলেন। কাহিনীতে দেখা গেল, বড়রানী কৌশল্যার পুত্র রামচন্দ্র এবং ছোট রানী কৈকেয়ীর পুত্র ভরত এক দিনে একই সময়ে জন্মগ্রহণ করল। নিখুঁত সময়ের বিচারে কে

অগ্রজ সেই জটিল জিজ্ঞাসা এখানে অবাস্তব। কারণ, কেকয়রাজের শর্তানুসারে অযোধ্যার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ভরত। ন্যায়ত, ভরত অযোধ্যার ভাবী নরপতি। সুতরাং সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবু রামকে যে অধিকার দেয়া যায়, সে অধিকার ভরতকে দিতে দশরথের কোথায় যেন একটু দ্বিধা ও সংকোচ চিল। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা তাঁর কাছে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। রাম ও ভরত দুজনেই তাঁর ঔরসজাত সন্তান। তবু উভয়ে তাঁর চোখে সমান নয়। তাঁর পিতৃস্নেহের মধ্যে বড় রকমের বৈষম্য ছিল। এই বৈষম্য হেতু ভরত অপেক্ষা রাম দশরথের কাছে অধিকতর প্রিয়।

দুর্ভাগ্যের কথা পিতা হলেও দশরথ সমদর্শী হতে পারলেন না। প্রতিশ্রুতি পালনের দায়িত্ব বহন করলে অযোধ্যার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের কোনো সমস্যা থাকত না। তবু রামকেই অযোধ্যার সিংহাসন দিতে চান তিনি। ভরত বা তার মা ঐ সিংহাসনের স্বপ্ন দেখে না। তথাপি সিংহাসনের সবরকম দাবি ও অধিকার থেকে ভরতকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে দশরথ তার জন্ম থেকে অনেক কপটতার আশ্রয় নিল। রামের স্বার্থে পিতা হয়ে দশরথ অন্য এক নির্লোভী পুত্রের সঙ্গে এই শঠতা করল কেন? রহস্য এখানেই। আসুন আমরা সেই রহস্যের পাতা ওল্টাই।

রাম ও ভরত একই দিনে একই সময়ে জন্মগ্রহণ করল। রামায়ণ গবেষকদের মতে চুলচেরা সময়ের বিচারে ভরত শ্রেষ্ঠ। রামায়ণের কবি দশরথের মনের আসল অভিপ্রায়টি পরিষ্কার করতেই যেন এই সংকটের গোড়াপত্তন করেছেন। বাহ্যত, রাম-ভরত যেই রাজা হোক, দশরথের কাছে দুই সমান। কিন্তু কার্যে তা হচ্ছে না। আসলে, রামায়ণ কবি একই সঙ্গে আর্য-অনার্যের বিরোধ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্মের বিরোধকে বড় করে দেখাতে চেয়েছেন।

অযোধ্যার সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্বের সঙ্গে উপরোক্ত সমস্যা যুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে, নব নব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। রাম ও ভরতকে নিয়ে জাতিতত্ত্বের ঐ সংকট দশরথের মনের গভীরে শিকড় মেলে দিয়েছিল। রাম আর্যকন্যা কৌশল্যার গর্ভজাত সন্তান হওয়ায় আর্যরক্তের বিশুদ্ধতা তার মধ্যে অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু অনার্য কন্যা কৈকেয়ীর গর্ভজাত পুত্র ভরতের মধ্যে আর্য-অনার্যের মিশ্র রক্ত ছিল বলে আর্যসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব দিতে দশরথ কিছু কুণ্ঠিত ছিল। আর্যত্বের অভিমান ও সংস্কার দশরথের কাছে পিতৃস্নেহ ও সত্যরক্ষার চেয়েও বড়। রামায়ণের মূল সমস্যা হল আর্য-অনার্যের বিরোধ। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন নিয়ে দশরথের আর্য-অনার্যবোধই ভরতের সিংহাসন প্রাপ্তির অন্তরায় হল। ভরত অনার্যমাতার পুত্র বলে দশরথ তাকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করার এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করল। অযোধ্যার সিংহাসনের ওপর অবিমিশ্র আর্যরক্তের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে দশরথ রামচন্দ্রকে উত্তরাধিকারী করার এক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এখানে পিতা নিজেই চক্রান্তকারী। এ হল পুত্রের বিরুদ্ধে পিতার ছলনা এবং মিথ্যাচার। কারণ রাজনীতিতে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগিনী, বান্ধব-মিত্র বলে কিছু নেই। স্নেহ-মমতা, বাৎসল্য ন্যায়, ধর্ম,

নীতি কিছু নেই। যে কোন উপায়ে নিজের নীতিতে ও বিশ্বাসে জয়ী হওয়াই আসল কথা। দশরথও অনুরূপ জয় চেয়েছিল।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই কৈকেয়ী এবং ভরত তার বিন্দু-বিসর্গও জানে না। অথচ, দশরথ ভরতকে রামের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে আগে-ভাগে সতর্ক হলেন এবং এক গোপন চক্রান্তে লিপ্ত থাকলেন। বালকাণ্ডে ভরত শত্রুঘ্নের জন্ম (মহারাষ্ট্রীর রামায়ণে এরা কৈকেয়ীর যমজ পুত্র বলে কথিত।) এবং বিবাহ ছাড়া আর কোনো সংবাদই নেই। রাজপুরীতে তাদের উপস্থিতিও নজর কাড়ে না। অথচ, সর্বক্ষেত্রে রাম-লক্ষ্মণের শৌর্য-বীর্য, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণকীর্তন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অযোধ্যার প্রজাসাধারণের সঙ্গে তাদের গণসংযোগ ঘটানোর জন্য রাজ্যের প্রশাসনকে কাজে লাগানো হয়েছিল। অযোধ্যার জনগণ রাম-লক্ষণকেই চেনে। ভরত-শত্রুঘ্নর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। এই পর্বে, ভরত-শত্রুঘ্নের শরীরী উপস্থিতি নেই। বোঝা যায়, তারা অযোধ্যায় বাস করত না। ছোট থেকেই তাদের মাতুলালয়ে রাখা হয়েছিল। অনার্যরমণীর পুত্র বলে এই দুই বালক পিতার কাছ থেকে বিমাতৃসুলভ আচরণ পেল !

রামচন্দ্রের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করতে ছোট থেকে ভরত শত্রুঘ্নকে পরিকল্পনা করে মাতুলালয়ে রাখা হল। জননীর কোল থেকে সন্তানকে কৌশলে বিচ্ছিন্ন করে মাতাপুত্রের স্নেহ-মধুর সম্পর্কের মধ্যে একটা দেয়াল তুলে দেয়া হল। শুধু তাই নয়, রাজপরিবারের আত্মজন এবং রাজ্যপ্রশাসনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার কোনো পথ খোলা রাখা হল না। বরং অনার্য মাতার স্নেহ মমতায় অভিষিক্ত করে রামচন্দ্রকে ভরত অপেক্ষা কৈকেয়ীর কাছে প্রিয়তম করে তোলার নিখুঁত পরিকল্পনাটি সফল হল। অপরপক্ষে, তাদের অনুপস্থিতিতে রাম লক্ষ্মণের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে দশরথকে অনেক বুদ্ধি খাটাতে হয়েছিল। দশরথের এই কূট কৌশলে কৈকেয়ী রামচন্দ্রের অভিষেকের বাধা হল না। তেমনি কেকয়রাজের কাছে সত্যরক্ষার কোনো দায় থাকল না তার। ভরত শত্রুঘ্নকে মাতুলালয়ে পাঠিয়ে দশরথ এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল।

'অযোধ্যাকাণ্ডে' দেখা গেল রামচন্দ্রের অভিষেকের আয়োজন চলল খুব সংগোপনে এবং সাবধানে। সব আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর দশরথ বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে বলল : "অদ্য যে রামের অভিষেক হইবে কৈকেয়ী ইহা জানিতে পারে নাই।" অভিষেক অনুষ্ঠানে বহু নরপতি, মান্যগণ্য, পূজিত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হল। কিন্তু বাদ পড়ল ভরত শত্রুঘ্নের মাতুলালয়ের কেকয়রাজ অশ্বপতি এবং তাদের শ্বশুরালয়ের মিথিলা অধিপতি কুশধ্বজ। রাজপরিবারের সন্তান এবং অযোধ্যার রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রিয় ভ্রাতার অভিষেকের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ আনন্দানুষ্ঠানে ভরত শত্রুঘ্ন ভাতৃদ্বয়কে রামের অভিষেকের কোনো সংবাদ দেওয়া হল না। তাদের বাদ দিয়ে রামের অভিষেক সম্পন্ন করার এই প্রয়াস দশরথের নির্লজ্জ ষড়যন্ত্রের সাক্ষী শুধু নয়, তাঁর বিমাতৃসুলভ মনোভাবের পরিচয়।

রামের অভিষেকে বেছে বেছে ভরত-শত্রুঘ্নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করা হল না। ব্যাপারটা দশরথের এতই ইচ্ছাকৃত ছিল যে, ভরত শত্রুঘ্নের অনুপস্থিতি তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। কোনো বিবেক দংশন কিংবা মনস্তাপও ছিল না সে জন্য। পিতা দশরথের এই কপটতা, শঠতার কোনো নজির নেই।

ক্ষমতালোভীর মস্ত রামচন্দ্র পিতার কার্যকে অনুমোদন এবং সমর্থন করার জন্য আংশিক অপরাধী হয়ে আছে। জীবনের একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠানে অনুজ দুই ভ্রাতার অনুপস্থিতির জন্য তার কোনো মনোবেদনা নেই। এমন কি তাদের জন্য পিতার কাছে কোনো অভিযোগও করেনি। একবারও প্রিয়তম ভ্রাতাদের অভাব অনুভব করেনি। কৈকেয়ীর পুত্রাধিক প্রিয়তম হওয়া সত্ত্বেও অভিষেকের শুভ সংবাদ রামচন্দ্র বিমাতার কাছে ঘূণাক্ষরে প্রকাশ করেনি। পাছে অভিষেক পণ্ড হয়ে যায় এই ভেবেই রাম নীরব ছিল। রাম এবং দশরথ উভয়েই কৈকেয়ীকে বিশ্বাস করেনি। কৈকেয়ীর সরল বিশ্বাস, পবিত্র প্রেম, নিঃস্বার্থ স্নেহ-মমতার কানাকড়ি মূল্য রামচন্দ্র এবং দশরথ দেয়নি। বরং, সন্দেহের চোখে দেখে অপমান করল তাকে। তাই কৈকেয়ী যখন সব জানতে পারল তখন পিতা-পুত্রের শঠতা, কপটতা, অবিশ্বাস, মিথ্যাচার ও সন্দেহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। অথচ, একটু বিশ্বাস করলে কৈকেয়ী অসংকোচে পুত্রের দাবি তুচ্ছ করে পুত্রাধিক প্রিয় রামচন্দ্রের সিংহাসনের অভিষেক সহজ মনে মেনে নিত। রামকে তার অদেয় কিছু ছিল না। তবু সেই রাম তাকে বিশ্বাস করল না। যেখানে ভালোবাসায় অবিশ্বাস, বিশ্বাসে সন্দেহ, প্রেমে ঘৃণা, আন্তরিকতায় বৈষম্য — সেখানে দোষীকে অপরাধীকে ক্ষমা করা বিড়ম্বনা, এই অপমান , অসম্মান কৈকেয়ীকে নতুন করে ভেঙে গড়ল অন্য এক ধাতুতে। সিংহাসনের ওপর নিজ পুত্রে দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে রাম ও দশরথের শঠতা ও কপটতার জবাব দিল। এই জটিলতার উৎস খুঁজতে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাদের মৎ-লিখিত 'জননী কৈকেয়ী' গ্রন্থটি অবশ্যই পাঠ করতে হবে।

অযোধ্যার সিংহাসনের ওপর ভরতের আচমকা দাবি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। রাজনীতিতে কোনো কিছু অতর্কিতে ঘটে না। যা কিছুই ঘটে তা আগে ঠিক করা থাকে। সবকিছুই একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে ধরা হয়। অভিষেকের অন্তিমমুহূর্ত কৌশলে রামকে সরিয়ে ভরতকে এনে রাজনৈতিক পালাবদলের কাজটি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করল। ভরতকে সামনে রেখে যারা ক্ষমতায় ফিরল রামায়ণে মূল সংঘর্ষ তো তাদের সঙ্গেই। অযোধ্যার রাজনীতির নেপথ্যে ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্রধর্মের বিরোধ— বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের ক্ষমতার আধিপত্যের ঠাণ্ডা লড়াই রামায়ণে একটা আলাদা পশ্চাৎপট সৃষ্টি করেছে। এই রাজনীতির শিকার হয়েছে কৈকেয়ী ও ভরত। তাদেরকে সামনে রেখে যারা ক্ষমতায় ফিরল মূল সংঘর্ষ তো তাদের সঙ্গেই। এই কারণেই ভরতের অনুনয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতে পারেনি। রামায়ণ কাহিনীতে সে এক অন্যধারা।

সিংহাসনের দাবি হারিয়ে রামচন্দ্রের বনগমনে যাওয়া সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। এর সঙ্গে কৈকেয়ীর কোনো সম্পর্ক নেই। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ বললেন : পিতৃসত্যরক্ষার জন্য রামচন্দ্রের বনগমন পরবর্তীকালের বানানো গল্প।

# সীতার বনবাস একটি চক্রান্ত

রামানন্দ সাগরের "রামায়ণ" টি. ভি. সিরিয়ালের জনপ্রিয়তা এক সময় ছিল তুঙ্গে। এটা রামচন্দ্রের কৃতিত্ব, না রামায়ণ কাহিনীর কাব্যগুণ, কে জানে? যাই হোক, কালজয়ী মহাকাব্যের সরস কাহিনীর চিত্ররূপ দর্শকের মন কেড়েছে। কিন্তু বাণিজ্যিক সাফল্য এবং জনপ্রিয়তার স্রোতে ভেসে গেছে মূল রামায়ণ। তৈরি হয়েছে এক নতুন পাঁচমিশেলি সাগর রামায়ণ।

টি. ভি. সিরিয়াল আমার আলোচনার বস্তু নয়। রামায়ণের পাঠক ও টিভি. সিরিয়ালের দর্শক-এর মেজাজ ও জগৎটাকে জানা ও বোঝা। রামায়ণ পাঠের সময় যে কাহিনী, অবাস্তব, আজগুবি এবং উদ্ভট হওয়ার জন্য পাঠক ক্লান্ত বোধ করে, সেই বাতিল কাহিনী কিন্তু টি. ভির পর্দায় দেখতে ভাল লাগে। ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে পরবর্তী রবিবারের প্রতিক্ষা করে। এর কারণ চোখে দেখার তৃপ্তি বই পাঠে মেলে না বলে দু'য়ের জগৎ আলাদা। চোখ যা কিছু সুন্দর, উদ্ভট, অভিনব, কৌতুককর, রোমাঞ্চকর তাতেই আকৃষ্ট হয় এবং নির্বিচারে গেলে তাকে। তার হজমের কোন দরকার নেই। দেখার তৃপ্তিটাই বড়। কিন্তু গ্রন্থপাঠের জন্যে দরকার হয় মন এবং একাগ্রতা। মনে আগ্রহ এবং কৌতূহল জাগলে তবে পাঠে আগ্রহ জাগে। মন গেলে না, হজম করে। সব জিনিস আবার হজম হয় না। তাই মন বাছবিচার করে।

পাঠের সময় এটা বোঝা যায়। টি. ভির দর্শকের মত পাঠকে নির্বিচারে সব গ্রহণ করে না। বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে গ্রহণ বর্জন করে। তাই চোখে যে জিনিস ভাল লাগে পাঠে লাগে না --এ হতেই পারে। দেখার সময় মন ও চেতনা আবেগাচ্ছন্ন হয়, বিচার বিশ্লেষণের সময় কোথায় তখন? কিন্তু পাঠের সময় মন বুদ্ধি সজাগ থাকে। আমার একথা বলার কারণ হল, রামায়ণ কাহিনী নিয়ে ভারতীয়দের মনে যখন একটা ভিন্ন ধরনের, ভাবনা ও বোধ গড়ে উঠেছে তখন বক্ষ্যমান নিবন্ধটি তাঁদের মনে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তাই লেখক ও পাঠকের সমঝোতা করতে ভুমিকাটুকু করতে হল। টি. ভির রামায়ণ, যুগের পরিপ্রেক্ষিতে রামায়ণ কাহিনীর কোন নতুন মূল্যায়ন করল না। একটা বড় উদ্যোগের এতবড় অপচয় কোন উন্নত দেশে হয় না। যাই হোক, পাঠকের

দরবারে যখন এই নিবন্ধটি পৌঁছবে তখন সীতার বনবাসের ব্যাপারটা এসে আর থাকবে না। সচেতন পাঠক একটু সতর্ক নজর রাখলেই টের পাবেন সতী-সাধ্বী পত্নী আসন্ন প্রসবা সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে রামচন্দ্র বধূহত্যার এক গর্হিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সরাসরি কথাটা বলার জন্য অনেকে হয়ত চমকাবেন। কিন্তু চমকানোর মত এটা কোন ঘটনাই নয়, একটু চোখ আর মন খোলা রেখে বাল্মীকি রামায়ণ পাঠ করলে সীতার বনবাসকে একটি নিছক হত্যাকাণ্ডের ছলনা এবং চক্রান্ত ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারবেন না, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আসুন, আমরা সেই সত্য উদঘাটন করি।

রাজধানীর বাইরে চোদ্দ বছর কাটিয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করল। নানা কারণে রামের ভাবমূর্তি পূর্বের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল না। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে একটা তীব্র অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল। রামায়ণ বর্ণিত বেশ কয়েকটি ঘটনায় সেই বিশৃঙ্খলার ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রামায়ণের কবি অবশ্য প্রজানুরঞ্জন রাজা রামচন্দ্রর ভাবমূর্তি অম্লান রাখার জন্য প্রজাবিদ্রোহের কথাটাকে একটু চেপে-চুপে, রেখে-ঢেকে বলেছেন। তবু সবটা ঢাকা পড়েনি। প্রকৃত সত্যকে বোধ হয় গোপন করা যায় না।

যাই হোক, কাহিনীতে দেখা গেল শোকার্ত এক ব্রাহ্মণ পুত্রের অকালমৃত্যুর জন্যে রামচন্দ্রকে সরাসরি অভিযোগ করেছে। তার শাসননীতি রাজনীতি প্রজাদের দুঃখকষ্টের যুক্ত কারণ। ব্রাহ্মণের কণ্ঠেই অভিযোগ শোনা যাক।

"এক্ষণে তোমার রাজ্যে সামান্যই সুখ।... এই রাজ্য নিশ্চয় অরাজক। প্রতিপালিত প্রজারা রাজার দোষে নষ্ট হইয়া থাকে।....গ্রাম ও নগরের অধিবাসীরা নানারূপ পাপ আচরণ করিতেছে এবং সেই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে না।.... শূদ্র আজ অধিকারের তপস্যা করিতেছে। সেইজন্য এই বিপ্র বালক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে।" (৭৩ সর্গ, উত্তর কাণ্ড, পৃঃ- ৯১৪, হেরম্ব ভট্টাচার্য, ভারতি সং।)

অনার্য নেতা শূদ্র শম্বুকের "অধিকারের তপস্যা" যে স্বাধীনতা অর্জনের পুনঃপ্রচেষ্টা তাতে কোন সন্দেহ নেই। শম্বুকের বিপ্লব, বিদ্রোহ রামচন্দ্রকে বেশ অসুবিধায় ফেলেছিল। রামচন্দ্রর সুনামও নষ্ট হয়েছিল তাতে। প্রশাসন ভেঙে পড়েছিল। অরাজক শব্দটি আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলাকেই ইংগিত করছে।

ব্রাহ্মণ, পুত্রের অকালমৃত্যুর জন্যে রামচন্দ্রের উপর দোষারোপ করে ক্ষান্ত হয়নি, তাকে অভিযুক্তও করল। শূদ্র শম্বুকের "অধিকার তপস্যা" আর্য সাম্রাজ্যের ভয় ও ভীতির কারণ। তাই এই পাপ গ্রহকে এখনি ধ্বংস করা দরকার। রামচন্দ্র শম্বুককে দমনের জন্যে এমন সব কঠোর শাসন নীতি এবং রাজনীতি গ্রহণ করেছিল যে অযোধ্যায় ত্রাহি ত্রাহি পড়ে গিয়েছিল। রাজ্যজুড়ে দারুণ অর্থাভাব ও অন্নাভাব দেখা দিয়েছিল। আইন-কানুন বলে কিছু ছিল না। দেশব্যাপী বিশৃংখলাজনিত ক্লেশ ভোগ করছিল প্রজারা। এই উদ্ভূত অবস্থার মূলে ছিল অনার্য ভূমির জন্যে শম্বুকের রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের সংগ্রাম।

অনার্যদের আর্যবিরোধিতায় কুপিত হয়ে আর্যবংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রকে ভর্ৎসনা করে বলল, "পাপের যথোচিত প্রতিবিধান হইতেছে না, তজ্জন্যই স্বভাবতই প্রজাদিগের এই অকাল মৃত্যু উপস্থিত হইতেছে।" (ঐ)

এই নিয়ে আর্যবংশোদ্ভূত প্রজাকুলের মধ্যে একটা তীব্র অসন্তোষ দিন দিন মাথা চাড়া দিচ্ছিল। পুত্রশোকাতুর ব্রহ্মাণের ক্ষোভ, দুঃখ, আর্ত হাহাকার, ভর্ৎসনা, তিরস্কার অভিযোগের মধ্যে তা প্রকাশিত। বস্তুত উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রামচন্দ্রও দারুণ অসহায়। তার গৌরব এবং মর্যাদা বিপন্ন।

এই দুঃসহ সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে রামচন্দ্র সীতাকেই টোপ হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল। এই মুহূর্তে সীতাকে নির্বাসনে পাঠালে প্রজাদের দৃষ্টি মূল সমস্যা থেকে সীতার দিকে সরে যাবে। খুব সংগোপনে গুপ্তচরকে দিয়ে রামচন্দ্র তার জমি প্রস্তুত করতে লাগল। সুপরিকল্পিতভাবে তার সব আয়োজন ও প্রচার ঠিক ঠিক সম্পন্ন হওয়ার পর রামের অভিসন্ধি প্রকাশ পেল।

কপট শিরোমণি রামচন্দ্র কার্যকলাপকে সন্দেহের উর্ধ্বে রাখার জন্য সভাসদ্ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজসভায় কথাটা উত্থাপন করল। কিন্তু তার আগে বেশ খোশমেজাজে গল্প করছিল এবং শুনছিল। হঠাৎ কথায় কথায় রামচন্দ্র সীতা সম্পর্কে প্রজাদের কৌতূহল ও ঔসুক্যের খবর জানতে চাইল। গুপ্তচরবৃত্তিধারী সভাসদ্দের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল:

'এখন নগরে কি জল্পনা হইয়া থাকে ? প্রায়ই নগর বাসীরা আমার বিষয় কি বলিয়া থাকে ? সীতা সংক্রান্ত কোন কথা হয় কি-না? সকলে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের বিষয় কি বলে?" (৪৩ সর্গ, পৃ : ৮৮৪, পূর্ব গ্রন্থ)। নরমে গরমে মেশানো এক অপূর্ব কূটভাষণ।

রামচন্দ্র'র উপরোক্ত উদ্দেশ্যমূলক জিজ্ঞাসা দুটি বিষয়কে পরিষ্কার করে। এক, রামচন্দ্রর কার্য প্রজারা সমালোচনা করে। আর সে সমালোচনা সীতাকে জড়িয়ে হয় এবং এ সম্পর্কে তার ভাইদের আচরণ প্রজারা কোন্ চোখে দেখে ও বিচার করে সুকৌশলে সকলের সামনে তা জানা। দুই, রামচন্দ্র এবং সীতা প্রজাদের আলোচনার বিষয় হলে রাজার সম্মান রক্ষার্থে রামচন্দ্রও একটা রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে পারে।

কিন্তু সে কাজে সফল হওয়ার পথে বাধাও বিস্তর। নিজের ভাবমূর্তির জন্য সীতার মত সাধ্বী স্ত্রীকে নির্বাসন দিলে পরিবারের অভ্যন্তরেই ঝড় উঠবে। অথচ নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য সীতা বিসর্জন রামচন্দ্রের কাছে খুবই জরুরি। অনুগত ভ্রাতৃমণ্ডলীর সঙ্গে যাতে কোনরূপ বিরোধ ও সংঘাত না হয় সেজন্য পূর্বাহ্নেই তাদের সাবধান করার জন্য একান্তে ডেকে বলল .

"সীতা সম্পর্কে যেরূপ কথা রটিয়াছে তাহাতে আমার অত্যন্ত অপবাদ হইয়াছে। ....(লক্ষ্মণকে) সীতাকে কোন নির্জনে শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া আইস। ....জানকীর জন্যে আমায় কোন অনুরোধ করিও না। ভালমন্দ বিচারের আবশ্যকতা নাই। এই বিষয়ে নিবারণ

করিলে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইব। ......যিনি কোন কথা কহিবেন তিনি আমার অভিষ্টের ব্যঘাত সম্পাদন হেতু পরম শত্রু। যদি তোমরা আমার মতস্থ হও তবে আমার সম্মান রাখ এবং সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আইস। (৫৪ সর্গ, পৃ-৮৮৭, পূর্বগ্রন্থ)

প্রতিবাদ, বিরোধিতা আশংকা করেই রামচন্দ্র ভাইদের শাসিয়ে ছিল। এবং এটা রাজাদেশ সেকথা জানাতে ভুলল না। রাজাদেশ লংঘন করলে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে তাকে। ভাই হলেও, রাজার করুণা পাবে না। "আমি অপবাদের ভয়ে তোমাদেরও পরিত্যাগ করিতে পারি।" (ঐ) একথা বলার অর্থ অনুগত ভ্রাতাদের সীতার কাছ থেকে দূরে রাখা এবং বিচ্ছিন্ন করা। ভ্রাতৃবধূর পক্ষাবলম্বন করে ভাইরা স্বেচ্ছায় তাকে অনুরোধ, উপরোধ করতে পারে, এরকম অনুমান করেই রামচন্দ্র পূর্বাকেই নির্বাসন দণ্ডের ভয় দেখিয়ে রাখল তাদের।

পৃথিবীর ইতিহাসে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে কূট রাজনীতির খেলা নরপতিদের একটা পুরনো খেলা। মহাভারতেও পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে কুরু-পাণ্ডবের জটিল রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দের ঘোলা আবর্তের মধ্যে টেনে এনেছিল রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে। রামচন্দ্রও অভিভাবকালীন রাজনৈতিক সংকট এড়াতে সীতাকে নিয়ে চতুর্দশ বৎসর বনবাসে কাটিয়ে ছিল। সীতা অপহরণ না হলে তো লঙ্কা যুদ্ধ হত না। লঙ্কা পর্যন্ত আর্য উপনিবেশ স্থাপন করায় কূট অভিসন্ধি নিয়ে রামচন্দ্র বনবাসী হয়েছিল। রামের অভিপ্রায় অনুমান করে ত্রিলোকবিজয়ী রাবণ সংঘর্ষ এড়িয়ে চলছিল। কিন্তু রাম নিজের স্বার্থে রাবণের সঙ্গে এক বিরোধ সূচনা করল। আরোমুখীর স্তন কর্তন করে, শূর্পনখার নাসিকা ছেদন করে রাবণের রাজমর্যাদাকে আঘাত করল। রাম রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝেছিলেন যে রাবণ বিপন্ন আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে তাবই পথ অনুসরণ করবে। তাই সীতাকে বেইজ্জতের টোপ হিসাবে ব্যবহার করল।

দেশময় অরাজকতা বিশৃংখলা এবং অশুভ প্রভাব যেভাবে রামচন্দ্রের ভাবমূর্তি নষ্ট করল প্রজাবিদ্রোহ সৃষ্টি হল। তার পুনরুদ্ধার করতে পতিপরায়ণা সীতাকেই রামের দরকার হল। রামের প্রাণে সীতার জন্যে এতটুকু প্রেম কিংবা মমতা ছিল না। যা ছিল তা অভিনয়। (মৎ লিখিত, "আমি তোমাদেরই সীতা" পাঠ করলে আগ্রহী পাঠক এই রহস্য আরো বিস্তৃতভাবে জানতে পারবেন।)

নারীর প্রেম, ভালবাসা, শ্রদ্ধা একনিষ্ঠতা নিয়ে পুরুষরা চিরদিন খেলা করেছে। এ হল নারীর অদৃষ্ট লিখন। সীতার ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যত্যয় হয়নি।

সীতা পরিত্যাগের ব্যাপারটা রামচন্দ্রর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর মধ্যে অন্যের প্রবেশ করা একটু জটিল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে বিবাদ এমনই একটা ঘটনা যে, অন্যেরা সুচতুর রামচন্দ্র সে কথাটা মনে রেখে বেশ ঠাণ্ডা মাথায় সাধ্বী পত্নী সীতাকে নির্বাসন দেবার এক সুন্দর ছক তৈরি করল। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, এবং জাগা স্বাভাবিক যে,

রাজমহিষীকে হেনস্তা কিংবা অসম্মান করলে রামচন্দ্রের সুনাম, গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে ছাড়া বাড়বে না। কিন্তু প্রজানুরঞ্জন রাজার কাছে প্রজারাই ধ্যান-জ্ঞান। প্রজাদের মনে রাজমহিষী সম্পর্কে যে ক্ষোভ রয়েছে প্রজানুরঞ্জন রাজা রয়েছে তার প্রতিকারও তারা চাইবে। সীতাকে বনবাসে পাঠানো মানে প্রজাদের বাসনা পূর্ণ করা। এটা ছিল রামচন্দ্রর পক্ষে একটা কঠিন কাজ। তবু সে অসাধ্য সাধন যদি করতে পারে তা-হলে তার হারানো খেতাবের গৌরব ও মর্যাদা ফিরে পাবে। এই ফিরে পাওয়ার ব্যাপারটা সীতার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল এবং পুনরুদ্ধারের জন্য সীতাকে নির্বাসন দেওয়া ছাড়া রামচন্দ্রের অন্য উপায় ছিল না।

অপরপক্ষে, সীতাকে বনবাসে পাঠানোর মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। এতে ক্ষুব্ধ আর্য বংশোদ্ভূত প্রজাদের দৃষ্টি শম্বুকের দৌরাত্ম্য থেকে সীতাকে ত্যাগ করার মতন একটা কঠিন আদর্শের দিকে ফেরানো যাবে। এবং তারা তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। তার ভাবমূর্তির গায়ে ত্যাগের ও সেবার আদর্শের আলো এসে পড়বে এবং তার ব্যক্তিত্ব আরো দীপ্ত ও উজ্জ্বল হবে। প্রজারা গর্বের সঙ্গে অনুভব করবে প্রজানুরঞ্জন রাজা রামচন্দ্রের পত্নীপ্রেমের চেয়ে প্রজাপ্রেম ও স্বার্থত্যাগ অনেক বড়। এর ফলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং অসহিষ্ণুতা কমবে।

সবচেয়ে নিন্দনীয় ঘটনা হল, রামচন্দ্র যখন বৈদেহীকে বনবাসে পাঠানোর মত কঠিন সিদ্ধান্ত নিল তখন আসন্ন প্রসবা সে। এরকম সময়ে স্থানান্তরে পাঠানো মানবিক অপরাধ। অধর্ম তো বটেই। প্রজার সন্তোষের জন্য সীতাকে বনবাস দেওয়া রামচন্দ্রের যদি একান্ত জরুরি হয়ে থাকে, তা হলে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই কাজটা করা যেত। অথবা সীতার প্রসবান্তে করলেও চলত। কিন্তু রামচন্দ্র তা করল না। কেন করল না, এ প্রশ্ন করে না কেউ? এটাই আশ্চর্য? যাই হোক, এই রহস্য উদঘাটনের সূত্রে সীতার বনবাস যে রামচন্দ্রের একটি নিখুঁত চক্রান্ত ছিল, এই সত্যে পৌঁছনো সহজ হবে।

যে কোন কারণেই হোক রাম ও সীতার মধ্যে মিল ছিল না। রামচন্দ্র সীতাকে সহ্য করতে পারছিল না। রামের দোষ ঢাকতে অবশ্য রামায়ণের কবি রামচন্দ্রের বুক ফাটা এবং হাহাকারের কথা বলেছেন, কিন্তু পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলির সাথে সেগুলি বিচার করলে রামচন্দ্রের কপটতা, ছলনা বেশি করে প্রকাশ পায়। রামচন্দ্রের পূর্বাপর কার্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, সীতাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য এবং মতলব নিয়ে রাম তাকে বনবাসে পাঠিয়ে ছিল। একথা শুনে চমকালেন তো। হ্যাঁ, চমকানোরই কথা। বাল্মীকির রামায়ণ অনুসরণ করে এখন প্রতিপাদ্য বিষয়টি উত্থাপন করব।

রামচন্দ্রের উদ্দেশ্য যদি সৎ এবং মহৎ আদর্শের হত, তাহলে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করার সময় অন্তত সীতাকে বিদায় জানাতে একবারটি আসত। এতে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হত না। এমনকি সীতাকে রামের সঙ্গে দেখা করতেও দেওয়া হয়নি। কারণ, রামচন্দ্র

নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী। এই অপরাধবোধেই হয়ত সীতার মুখোমুখি হতে লজ্জা পেল।

বাল্মীকির আশ্রমে সীতাকে নির্বাসিত করা হল, অথচ সে সংবাদটা বাল্মীকিকে পূর্বাহ্নে জানানো হল না। ঘটনায় প্রকাশ, বাল্মিকী তার আগমনের কোন খোঁজই রাখত না। সীতাকে মিথ্যে বলে রামচন্দ্র তাকে অযোধ্যার বাইরে নির্বাসন দিল। একবারও ভাবল না সীতা গর্ভবতী। অন্য একটি জীবনের দায়িত্ব বহন করছে। আর সে প্রাণ তারই বীজাংকুর জাত। সীতার প্রতি এই সময় নজর দেওয়া এবং যত্ন নেওয়া ভীষণ দরকার। সব গর্ভিনী নারীর প্রতি পরিবাবের লোকেরা এই কর্তব্যটুকু করে থাকে। কিন্তু রামচন্দ্র স্বামী হয়ে সীতার উপর সবচেয়ে বেশি অবিচার করল। রামচন্দ্রের এই অমানবিক আচরণ নিষ্ঠুরতার কোন তুলনা হয় না। সীতাকে বনবাসে পাঠানো মানেই হল এক অনিশ্চিত এবং নিরাপত্তাহীন অসহায় অবস্থার মধ্যে জেনেশুনে তাকে ঠেলে দেওয়া এই জন্যে বলছি, রামচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল সীতাকে হত্যা করা। প্রমাণবিহীন, নজিরহীন এক হত্যা।

রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ বাল্মীকির আশ্রমের নাম করে তাকে গঙ্গার পরপারে এক নির্জন নদীতীরে ঘন অরণ্যে নির্বাসন দিল। লক্ষ্মণ তাকে বাল্মিকীর আশ্রমে পৌঁছে দিল না। ("আমি তোমাকে আশ্রমের প্রান্তভাগে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। ঐ, পৃ:৮৮৮) ঋষির ওপর তার দেখাশোনার ভার অর্পণও করল না। বড় অবহেলায়, অপমানজনকভাবে তাকে বনমধ্যে একাকী ছেড়ে তিল। তার নিরাপত্তারও কোন ব্যবস্থা করল না। সীতা নির্জন বনভূমির প্রান্তে বসে অসহায়ভাবে কাঁদতে লাগল একটু আশ্রয় এবং সাহায্যের প্রত্যাশায়। বাল্মীকির মুখেই সে কথা শোনা যাক,

ঋষিকুমারেরা বনমধ্যে সীতাকে রোদন কবিতে দেখিয়া বাল্মীকির নিকট ধাবমান হইল ...কহিল ভগবান্! কোন একটি স্ত্রী শোকমোহে কাতর হইয়া বিকৃতমনে আর্তনাদ করিতেছে। আমরা উহাকে কখন দেখি নাই। ....চলুন আপনি গিয়া তাহাকে দেখিবেন। ....আমরা দেখিয়া আসিলাম, তিনি নদীতীরে শোক দুঃখে অতিমাত্র আকুল হইয়া .... অনাথার ন্যায় কাঁদিতেছেন...(ঐ, ৪৯ সর্গ, পৃ:-৮৯০)

রামচন্দ্র রাজমহিষীর যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে বনবাসে পাঠায়নি বলে সীতাকে এই দুর্দশা ভোগ করতে হল। সীতার জন্যে একটা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা পর্যন্ত করল না। অযোধ্যার রাজমহিষীর নিরাপত্তার জন্যে একজন রক্ষী কিংবা শুশ্রূষাকারিণী পর্যন্ত দেওয়া হল না। এতেই রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যটা প্রকট হয়ে পড়ে। রামের নির্দেশেই লক্ষ্মণ তাকে শ্বাপদসংকুল অরণ্যে একা ছেড়ে দিয়ে এল কোন্ উদ্দেশ্যে? রাজবধূকে এভাবে রক্ষী, প্রহরী, দাসী ছাড়া বাল্মীকির আশ্রমে একা যেতে বলাটা লক্ষ্মণের শোভন হয়নি। কিন্তু লক্ষ্মণের কোন দোষ নেই। সে রামের আজ্ঞাবাহী মাত্র। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য হওয়ার জন্যই যে, তাকে অসহায়ভাবে বনে ছেড়ে দেওয়া হল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাই বলছিলাম এটা বনবাস নয়, সীতার নির্বাসন। রামচন্দ্রের আদেশ অমান্য করার রাজদণ্ড; সীতাকে হত্যা করার এক গভীর চক্রান্ত।

সীতার নির্বাসনের কিছুকাল পরে মধুবনে লবণের রাজ্য জয়ের নিমিত্ত শত্রুঘ্ন সসৈন্যে বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হল। এবং সেই রাত্রি আশ্রমে অবস্থান করল। বিস্ময়ের কথা সেদিন গভীর রাত্রে সীতা দুই যমজ পুত্র প্রসব করল। ("যে রাত্রিতে শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আশ্রমে ছিলেন, সেই রাত্রিতেই জানকী দুইটি পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ, পৃঃ-৯০৯) আশ্চর্যের কথা হল যে, শত্রুঘ্ন বাল্মীকির সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত অনেক কথাই বলল কিন্তু ভুলেও সীতা সম্পর্কে কোন কৌতূহল প্রকাশ করল না। সে এ আশ্রমে আছে কি না, কিংবা কেমন আছে জানতেও চাইল না। বাল্মীকিও সীতা সম্পর্কে কিছু জানাল না। বাল্মীকির আশ্রমে শত্রুঘ্নের আকস্মিক আগমন এবং অবস্থান দুই রহস্যাবৃত রইল। কিন্তু প্রশ্ন থেমে থাকল না। সীতা সম্পর্কে শত্রুঘ্নের কৌতূহলহীন নির্বিকারত্ব ঘটনার গুরুত্ব সূচনা করে। বাল্মীকির আশ্রম থেকে সীতার কোন সংবাদ না পেয়ে রামচন্দ্র ধরেই নিয়েছিল সীতার মৃত্যু হয়েছে। শত্রুঘ্নের আগমনের সংবাদ আশ্রমে জানাজানি হওয়ার পরেও যখন সীতাকে আশ্রমে কোথাও দেখল না, তখন শত্রুঘ্ন ধরে নিয়েছিল সীতা বাল্মীকির তপোবনে নেই। সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে রামচন্দ্র কোনদিন বাল্মীকির আশ্রমে দূত বা সংবাদদাতা পাঠিয়ে তার কোন সন্ধান করেনি। লোকমুখেও নয়। সীতা সন্তানসম্ভবা জেনেও স্বামী হিসেবে তার খোঁজ-খবর করার প্রয়োজন অনুভব করেনি। সীতার কোন সন্তানাদি হল কি না, তা জানারও কৌতূহল হয়নি তার। সেই সন্তান কেমন দেখতে হল, তারা কিভাবে আছে, কেমন আছে এসব কিছুই রামচন্দ্র বাল্মীকির কাছে জানতে চায়নি কখনও। জনকের কোন কর্তব্য রাম করেনি। এই সব ঘটনাই প্রমাণ করে রামচন্দ্র বনবাসে পাঠানোর নাম করে কার্যত তাকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলার চক্রান্ত করেছিল। রামের ভেতর সীতার জন্যে এতটুকু প্রেম কিংবা মমতা ছিল না থাকলে এত নির্লিপ্ত এবং নির্বিকার কখনও হত না। রামচন্দ্র সম্পর্কে সন্দেহের উৎস এখানেই। সীতার মৃত্যু সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতেই রামচন্দ্র যে শত্রুঘ্নকে সসৈন্যে বাল্মীকির তপোবনে সীতার সরজমিনে পাঠায়নি, কে বলতে পারে?

রামচন্দ্রের মনোভাব বুঝতে বোধ হয়, সীতার যমজ পুত্র প্রসবের সংবাদ বাল্মীকি অযোধ্যায় পাঠায়নি। লবকুশের কোন পরিচয় রামচন্দ্র জানত না। সীতার খোঁজখবর রাখত না বলেই জানত না। রামচন্দ্রের কাছে সীতা মৃত। তাই অশ্বমেধযজ্ঞের সময় স্বর্ণসীতা তৈরি হল। বাল্মীকি জানতে পেরে লব-কুশকে নিয়ে অযোধ্যায় উপস্থিত হল। অশ্বমেধ যজ্ঞে আমন্ত্রিত মান্য-গণ্য অতিথিদের সম্মুখে রামের গুণ-কীর্তনের সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করে সীতাকে নির্বাসনের বৃত্তান্ত শোনাল।

রামচন্দ্র বিপন্ন বোধ করল। যার থেকে রামচন্দ্রের আর পালানোর কোন উপায় ছিল না। পাছে আমন্ত্রিত নৃপবর্গের সামনে তার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে পড়ে তাই চক্রান্ত ঢাকতেই

রামচন্দ্র সীতাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে বাল্মীকির তবোপনে গেল আর এক চক্রান্ত মাথায় নিয়ে। সে হল সীতাকে আরো একবার অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে সবার সামনে। যেন তেন প্রকারে রামচন্দ্র সীতাকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। তাই অগ্নিপরীক্ষার নামে তাকে পুড়িয়ে মারা হল। পাছে রামের মহিমার গায়ে কলঙ্ক লাগে তাই রামভক্তেরা আগামী প্রজন্মের কাছে এক সত্যকে গোপন করে আর এক সত্যকে প্রকাশ করল। সে হল অগ্নিদগ্ধ হওয়ার বদলে মেদিনী তাকে গ্রাস করল। অথাৎ, তার অগ্নিদগ্ধ দেহাবশেষ মৃত্তিকাগর্ভে সমাধিস্থ করা হল।

বিশ শতকের শেযে পৌঁছে রামচন্দ্রের এই মানবিকতা বিরোধী কার্যকে যদি নিশ্চিতভাবে স্বীকার করার দায় আমরা এড়িয়ে যাই, তাহলে নারীমুক্তি আন্দোলনের দিনে নারীর অস্তিত্বের সংকট থেকেই যাবে। এটা বোঝার মত চোখ ও মন টি. ভি. সিরিয়ালের দর্শকদের হোক, এই শুধু প্রার্থনা। নেই, কেবল রামায়ণ পাঠকেরাই গভীর করে অনুভব করতে পারে যে, সীতার বনবাস, এবং অগ্নিপরীক্ষা রামচন্দ্রের একটা চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।

# হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ

প্রচলিত মহাভারতে কৃষ্ণের দেবত্ব অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণের বংশ পরিচয় জানার যে কৌতূহল হল তারই সূত্র ধরে হরিবংশের আবির্ভাব। হরিবংশ হল শ্রীহরি বা বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের বংশ বৃত্তান্ত। শাখা-প্রশাখায় যে বংশধারা গোটা মহাভারত ও পুরানের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে তার শৌর্যবীর্য এবং বংশ সূত্র অন্বেষণের একটি কোষগ্রন্থ। বহাবাহুল্য, মহাভারতের কৃষ্ণের আকর্ষণী ব্যক্তিত্ব চরিত্র মাধুর্য সহৃদয় সহানুভূতি, মহানুভবতা, মমতা, দরদ, করুণা, প্রেম, ব্যক্তিত্ব, ভালবাসা প্রভৃতির জন্য কৃষ্ণ সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর শৌর্য, বীর্য, সাহস, দৃঢ়তা রণকৌশল, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, লোকচরিত্রজ্ঞান, অসাধারণ আশ্চর্য ক্ষমতা। কৃষ্ণের লোকোত্তর প্রতিভা মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত ছিল। লৌকিক বিচারবুদ্ধি দিয়ে কৃষ্ণের অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্য এবং আশ্চর্য গুণের পরিমাপ সম্ভব নয়। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা হয় না মানুষ তাকেই বলে দৈবশক্তি। কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষী প্রকৃতি ও গুণের উপর ঈশ্বরত্বের প্রলেপ পড়ল। কৃষ্ণ হলেন নররূপী নারায়ণ। তথা যুগন্ধর দেবতা। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের মানুষীসত্তার এই রূপান্তর প্রত্যক্ষ করলেন ঐতিহাসিকেরা।

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণ চরিত্র' গ্রন্থে লিখলেন, "প্রথম স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সচরাচর পরিচিত নহেন। নিজে তিনি আপনার দেবত্ব স্বীকার করেন না, এবং মানুষী ভিন্ন দৈবী শক্তি দ্বারা কোন কর্ম সম্পন্ন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে তিনি স্পষ্টত বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অর্চিত, নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষিত করেন।" কবিও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে যত্নশীল। ......তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া 'বেশ রচিয়াছি মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পুরিয়া দিয়াছেন।' এই দ্বিতীয় তৃতীয় স্তরে মহাভারতের **স্বর্গারোহণ পর্বে সম্ভবত হরিবংশ কীর্তন শ্রবণের ফল বর্ণিত হয়েছিল।** তৃতীয় স্তরের চলতি মহাভারতে সমুদয় অধ্যায় জুড়ে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক রূপের মহিমা কীর্তন। কাজেই, স্বর্গারোহণ পর্বে হরিবংশ শ্রবণের ফলশ্রুতি বর্ণিত হল। সে কারণ হরিবংশকে মহাভারতের পূর্ববর্তী গ্রন্থ বলা যায় না।

তবুও প্রশ্ন থেকে যায়। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে রাজনৈতিক মহাভারত রচনার পূর্বে কোন বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করলেন? তাঁর বাল্য কৈশোর কোথায় কি অবস্থায় কাটল এসব সম্পর্কে মহাভারতকারেরা কোন কৌতূহল দেখাননি। কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তকে সচেতন ভাবে বর্জন করে তাকে একটা পরিণত মানুষরূপে কুরু পাণ্ডবের পারিবারিক কলহ ও সংঘর্ষের আবর্তের মধ্যে টেনে আনলেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমন আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। দেশকালোদ্ভূত এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে তাঁর জন্ম। নিপীড়িত মানুষের আকুল করা ডাকে তাঁর সুখশয্যা টলে উঠল।

মহাভারতকার পাঠককে সেই সংবাদ জানাতে বসুমতীকে পাঠালেন ব্রহ্মার কাছে তার আর্জি জানাতে। ব্রহ্মা বসুমতীর মিনতির কথা নারায়ণকে বললে তিনি নররূপে মর্তে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কৃষ্ণ নররূপী দেবতা, পরিত্রাতা, দুর্গতের রক্ষক, ধর্মের ধারক রূপে ধরাতলে এসেছেন, এ জ্ঞান পাঠকের অবচেতন মনকে পুষ্ট করেছে। তাই দ্রৌপদীর স্বয়ম্ভর সভায় কৃষ্ণ সম্পর্কে পাঠকের অন্য কোন কৌতূহল জাগে না। পাণ্ডবদের আত্মপ্রকাশের সংকট পাঠকচিত্তকে বিব্রত ও অশান্ত করে রাখে। দুর্গত, লাঞ্ছিত, ভাগ্যহত পাণ্ডবেরাই একমাত্র কৌতূহল। কৃষ্ণ কিছু নয় তখন। তবু তাঁর রহস্যপূর্ণ অবস্থান পাঠককে ভাবায়। কিন্তু বেশিক্ষণ চিত্ত স্থির হয় না। কৃষ্ণের পরিচয় জানার সময় তখন অভাব। স্বয়ম্বরসভায় ব্যর্থ, ক্রুদ্ধ রাজন্যবর্গের সঙ্গে ভীষ্ম ও অর্জুনের সংগ্রামে তারা রোমাঞ্চিত এবং মুগ্ধ তখন। তারপর, ভার্গবের কুটীরে কৃষ্ণের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হল, কুন্তীর সঙ্গে কৃষ্ণের আত্মীয় সম্বন্ধই শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়। এটুকুই যথেষ্ট ছিল বলে ব্যাসদেব ভাবলেন। তাই, ফ্ল্যাশব্যাক রীতিতে কৃষ্ণের বংশপরিচয় কীর্তন কবা তাঁর পছন্দ হয়নি। সেজন্য সচেতনভাবে তা এড়িয়ে গেলেন।

কর্মযজ্ঞের মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে সাধারণের কৌতূহল ও আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল। কৃষ্ণ অর্চিত হতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণের কর্মনীতি, রাজনীতি লোকের দ্বারা সমাদৃত হলে নারদ ব্যাসদেবকে মহাভারতের আখ্যানভাগে শ্রীকৃষ্ণের অসম্পূর্ণতার কথা জানালেন এবং পূর্ণাঙ্গ কৃষ্ণচরিত্র রচনার পরামর্শ দিলেন। নারদের পরামর্শে ব্যাসদেবের হরিবংশ রচনায় উদ্বুদ্ধ হহলেন।

হরিবংশের কাহিনী মোট তিনটি পর্বে বিন্যস্ত। এক : হরিবংশ পর্ব : সৃষ্টি, শ্রীকৃষ্ণের বংশের বিস্তৃত বিবরণ, পৌরাণিক ইতিবৃত্ত এবং বিভিন্ন রাজ্য ও রাজা এবং তাদের কুল বর্ণনা। দুই : বিষ্ণুপর্ব, শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও লীলা। জন্ম থেকে বাণযুদ্ধ পর্যন্ত এক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষ ও সংগ্রাম করে কিভাবে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন কার্য করলেন তার ঘটনাবহুল এক উপন্যাস। তিন : ভবিষ্যপর্ব ভবিষ্যৎ কথা, যুগের অবক্ষয়জনিত পাপ, দুষ্কৃতি, ব্যভিচার, অসদাচার, অধর্মচার নীতি-জ্ঞানহীন অমানবিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি বর্ণনা, পৃথিবীর কথা (কেমন করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হল, ব্রহ্মা কি, ব্রহ্মাণ্ড কি, পরমপুরুষ কে ও তাঁর স্বরূপ কেমন ইত্যাদি সূত্রে অধ্যাত্মবাদ দর্শন এবং

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার বিবিধ বর্ণনা), কলিযুগের পাপ বর্ণনা। অখ্যানাংশে জনমেজয়ের পর থেকে চন্দ্রবংশ বিস্তার ও ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

হরিবংশের প্রচলিত সংস্করণে মোট শ্লোকসংখ্যা ১৬,০০০। কিন্তু পূর্ব্বোধৃত সংস্কৃত শ্লোকে ১২,০০০ শ্লোকের উল্লেখ আছে। তাহলো, বাড়তি শ্লোকগুলি (৪,০০০) প্রক্ষিপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, মহাভারতে হরিবংশ যেমন প্রবিষ্ট হয়েছে, তেমনি বিষ্ণুপর্ব হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। সেকারণ; বঙ্কিমচন্দ্র হরিবংশকে মহাভারতে এবং বিষ্ণুপুরাণের পরবর্ত্তী রচনা বলেছেন। বলাবাহুল্য, এছিল শিল্পী সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের নিছক অনুমান। অনুমান প্রমাণ নয়। তবে, হরিবংশ রচনার সময় কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাই, বিষ্ণুপুরাণের সঙ্গে বিষ্ণু পর্বকে মিশিয়ে ফেলা কিছু অসংগত নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস , হরিবংশ মহাভারতের পরেই রচিত। কেননা, শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাণ্ডে বিষ্ণুপুরাণের মত অতিলৌকিক বাষ্প চাপ নেই। উদাহরণস্বরূপ উভয় গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণের জন্ম , শকটভঙ্গ, পুতনাবধ , কালীয়নাগ দমন, যমলার্জ্জুনভঙ্গ বৃত্তান্তগুলি পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে সচেতন পাঠক মাত্রেই সে পার্থক্য দেখতে পাবে। বিষ্ণুপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ কিন্তু হরিবংশে তিনি দ্বিভুজ মনুষ্যশিশু মাত্র। হরিবংশে বিষ্ণুপুরাণে রূপকত্ব নেই। ঘটনা থেকে অনেক বাস্তব এবং লৌকিক। বিচক্ষণ পাঠক মাত্রেই হরিবংশ পাঠে তা উপলব্ধি করবেন।

হরিবংশের আখ্যানভাগ পুরাণতত্ত্ববিদ্ সৌতি নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিদের শোনাচ্ছেন। বেদব্যাসের তিরোধানের পর বহুবর্ষ কেটে গেল। কিন্তু বেদব্যাসের মুখনিঃসৃত সে কাহিনীর সমাদর এবং জনপ্রিয়তা একটুও হ্রাস হয়নি। বরং উত্তরোত্তর মানুষের মুখে মুখে তা গীত হয়েছে। পল্লবিত হয়েছে। মূল কাণ্ড শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে বিশালত্ব লাভ করেছে।

সে যাই হোক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শিষ্য বৈশম্পায়ন পরীক্ষিত নন্দন জনমেনজয়কে মহাভারত কথা শোনালে, মহারাজ কৃষ্ণের চরিত্রমাধুর্য এবং তাঁর লোকোত্তর প্রতিভ ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এই গুণগানে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর বংশ বৃত্তান্ত শুনবার কৌতূহল প্রকাশ করলেন। তখন, বৈশম্পায়ন তাঁকে যে বৃত্তান্ত শোনালেন, সৌতি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিদের কাছে তার আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। প্রচলিত হরিবংশ-এর ১৬,০০০ শ্লোক পুরুষোত্তম পরম-পুরুষের বিশ্ব সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশের উদ্ভব ও বিস্তার এবং শ্রেষ্ঠত্বের সূত্রে সমগ্র বংশাবলী কীর্তিত হয়েছে। এই সূত্রে এসেছে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, লোকাচার প্রভৃতি।

যে মহাভারত কৃষ্ণ চরিত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি এবং দেবত্ব লাভের মাধ্যম সেই মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে। কিন্তু সেখানে শ্রীকৃষ্ণ দেবত নন। সভাপর্বে যুধিষ্ঠির যখন অক্ষক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত, পাঞ্চালী অক্ষপণে বিক্রীতা এবং

নিঃসহায়া, যখন দুরন্ত দুঃশাসন তাকে সর্বজন সমক্ষে বিবস্ত্র করেত উদ্যত তখন নিরুপায় দ্রৌপদী মহাসংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য আকুলস্বরে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের দয়া ও সহায় প্রার্থনা করল। বিপদ্‌তারণ পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে অন্তরাল হতে যে সাহায্য করলেন তা ভগবদ্বিভূতিবাচক। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় শ্রীকৃষ্ণ প্রথম ভগবানরূপে আত্মপ্রকাশ। তারপর থেকে তিনি ঈশ্বররূপে সম্মানিত ও পূজিত হলেন। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্‌। শ্রীকৃষ্ণই ভগবান। নররূপে নারায়ণ।

ভগবান কাকে বলে? 'ভগবৎ' শব্দের আক্ষরিক তাৎপর্য কি ? বিষ্ণুপুরাণ-এ, ষষ্ঠাংশ পঞ্চম অধ্যায়ে আছে — সূর্য প্রকাশিত হলে যেমন সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হয় তেমনি বিবেক দ্বারা পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করলে সমস্ত অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়। জ্ঞান দুই প্রকার। এক আগম থেকে ও দুই বিবেক থেকে উৎপন্ন হয়। আগম দ্বারা শব্দব্রহ্ম এবং বিবেকদ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানা যায়। ব্রহ্মও দু'প্রকার। প্রথম শব্দময়, দ্বিতীয় পরম। প্রথম ব্রহ্মকে জনলে তবে পরম ব্রহ্মকে জানতে পারে। পরমব্রহ্ম শব্দের অগোচর হলে পূজার জন্যে ভগবৎ শব্দ দ্বারা তাঁর কীর্তন করা হয়। ভগবৎ শব্দে ভ'কারের দুটি অর্থ; প্রথম তিনিই সকলের ভরণকর্তা। দ্বিতীয় সমস্তের আধার তিনি। 'গ' কারের অর্থ গময়িতা (অর্থাৎ সমস্ত কর্ম ও জ্ঞানের ফলের প্রাপক) ও স্রষ্টা এই দুই প্রকার। ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য — এই ছয়টির নাম ভগ। 'ব'কার অর্থে অখিলের আত্মভূৎ পরমাত্মার ভূতগণের অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে। এরূপ অর্থসম্পন্ন ভগবৎ শব্দ পরমব্রহ্মস্বরূপ সেই বাসুদেব ব্যতিরেকে আর কারো বেলায় প্রযুক্ত হয় না। সেই পরমব্রহ্মেই এই ভগবৎ শব্দ সার্থকতা লাভ করে থাকে। ভূতসমূহের উৎপত্তি, প্রলয়, অগতি, গতি, এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাকে তিনি জানেন এই জন্যেই তাঁকে ভগবান বলা হয়। জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য, তেজ প্রভৃতি সদ্‌গুণসমুহ ভগবৎ শব্দের অর্থ। সমস্ত ভূতগণ পরমাত্মাতেই বাস করছে বলে সকলের আত্মস্বরূপ সেই বাসুদেব সমস্ত ভূতেই বাস করছে। এই অর্থে তিনি বিশ্বস্রষ্টা।

বিষ্ণুপুরাণে ভগবানের এই লক্ষণ কীর্তন করে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে অভিহিত করলেন। হরিবংশ ও হরির বংশকীর্তনে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি এবং জীবকুলের সৃষ্টির সঙ্গে সর্বভূতাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়; বিদ্যা-অবিদ্যা সবাই যে তাঁর অধিগত এরূপ একটা ধারণা তৈরি করে ভগবদ্বিভূতি বর্ণনা করা হয়েছে। অবতারী কৃষ্ণের অংশে যে এই ত্রিলোক সমুৎপন্ন তার কীর্তন করা হয়েছে সৃষ্টি পর্বে বা সূচনাংশে।

শ্রীকৃষ্ণের নাম তত্ত্ব সম্পর্কে দুচার কথা আবশ্যক। বিভিন্ন পুরাণ এবং প্রাচীন সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য নাম বিষ্ণু, বাসুদেব, নারায়ণ শ্রীহরি প্রভৃতি নামে অভিহিত। এঁরা অভিন্ন কি পৃথক ব্যক্তি সেই পণ্ডিতী তর্ক এখানে উত্থাপন করা আমার ইচ্ছে নয়। কৃষ্ণ নামটি মহাভারতের পূর্বেও ছিল। ঋগ্বেদ সংহিতায় অন্যান্য দশ স্থানে 'কৃষ্ণ' নামের উল্লেখ আছে। ৮ম মণ্ডলে ৯৬ সুক্তে, ৮৫ সুক্তে ৮৬ সুক্তে ১০ম মণ্ডলে ৪২,৪৩ ও ৪৪ সুক্তে ৭ম মণ্ডলে ৯৯, ১০০ সুক্তে আছে। সেখানে কৃষ্ণ নামে এবং বিষ্ণু নামে তাঁর মহিমা কীর্তিত হয়েছে।

অথর্ববেদে শ্রীকৃষ্ণকে কেশী দৈত্যের সংহারকর্তা বলা হয়েছে। হরিবংশে কেশী দৈত্যের বিবরণ বিস্তৃতভাবে লেখা আছে। শ্রীকৃষ্ণের বধ কামনায় কংস কেশীকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিল। এবং তার অত্যাচারে বৃন্দাবন শ্মশানে পরিণত হলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যা করে। অতএব, অথর্ব বেদে যে বৃন্দাবন বিহারী শ্রীকৃষ্ণের বিষয় বর্ণিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। উপনিষদেও শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব পূর্ণ প্রতিভাত। কিন্তু প্রশ্ন, বেদে বা উপনিষদে মহাভারতের কৃষ্ণ নাম থাকবে কি করে? শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের দ্বাপর যুগে বহু পূর্বের শাস্ত্রগ্রন্থে যদি শ্রীকৃষ্ণের নামমাহাত্ম্য প্রচারিত হয় তবে বুঝতে হবে, এ অংশ প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্তীকালের অনুপ্রবেশ ব্যতীত কিছু নয়। এই কথার স্বপক্ষে বলছি — ছান্দোগ্যোপনিষদ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গিরসের শিষ্য। তিনি দেবকীপুত্র। গুরু হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করে তিনি বলেন : "তুমি অক্ষয়, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত। [তদ্ধৈতদ্‌ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এবব স বব সোহ বেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমস্যচ্যুততসি। প্রাণসংশিতমসীতি তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ ।। ৩।১৭।৬/ হরফ প্রকাশিত, পৃ: ১০৩] মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হন তাহলে ঋগ্বেদের বা উপনিষদের (মহাভারত পূর্বযুগের) কৃষ্ণের সঙ্গে তার অভিন্নতা কি সম্ভব? — এই প্রশ্ন থেকেই যায়।

· মহাভারত থেকে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আত্মীয় পরিজন মথুরা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে বসবাস করতেন। জরাসন্ধের সাম্রাজ্য-ক্ষুধার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মথুরা থেকে দ্বারকায় চলে আসেন। মহাভারতের আখ্যানভাগে কৃষ্ণ দ্বারকার অধিবাসী। যাদব নামে পরিচিত। যযাতি পুত্র যদুর বংশোদ্ভব ব্যক্তিরা যাদব নামে অভিহিত। ঋগ্বেদে যে সব আর্যগোষ্ঠীর নামোল্লেখ আছে যদু তাদের একজন। ভারতবংশীয় বাজা দিবোদাস-এর সঙ্গে যদুদের সংঘর্ষ লেগে থাকত। ঋগ্বেদে যদুর সঙ্গে তুর্বশ, দ্রুহ্যু, অনু, পুরু জাতির ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল। মহাভারতেও যদুবংশ ও পুরুবংশের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান।

শ্রীকৃষ্ণের আরো একটি পরিচয় তিনি বৃষ্ণিবংশসম্ভূত। শুধু তাই নয়, বিষ্ণুর অংশে বাসুদেবের জন্ম। বসুদেবের ঔরসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশীয়; বৃষ্ণিবংশোদ্ভব এবং বসুদেব নন্দন। মনে হয় যদুনামক প্রাচীনতম জাতির শাখা বিষ্ণুবংশ। হরিবংশের মতে নহুষ পুত্র যযাতি পৃথিবী জয় করে তাঁর পঞ্চপুত্রকে তা বণ্টন করে দিলেন। উত্তর পূর্বাংশ পেল যদু, আর মধ্যভাগ পেয়েছিল পুরু। যদুর পঞ্চপুত্র সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নীল ও অঙ্গিক। সহস্রদেব বংশে কার্তবীর্যার্জুন জন্মগ্রহণ করেছিল। কার্তবীর্যার্জুনের শতপুত্রের মধ্যে শূরসেন, শূর, কৃষ্ণ এবং জয়ধ্বজ জীবিত ছিলেন। এদের বংশে ভোজ, অবন্তী, ভরত, বৃষ প্রভৃতি যাদবগণ জন্মগ্রহণ করেন। এর মধ্যে বৃষের পুত্র মধু, মধুর পুত্র বৃষণ, বৃষণের পুত্রগণ বৃষ্ণি। বিষ্ণুপুরাণেও বিষ্ণুবংশোদ্ভবের অনুরূপ পরিচয় আছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যদুর বংশজাত বলে যাদব, মধুর বংশোদ্ভব বলে মাধব, বৃষ্ণিবংশে জন্ম বলে বার্ষ্ণেয় আর বসুদেবের পুত্র বলে বাসুদেব নামে অভিহিত।

শ্রীকৃষ্ণ এবং বৃষ্ণিবংশ সম্পর্কে ঐতিহাসিকতায় সন্দেহের অবকাশ নেই। মহর্ষি পাণিনি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) বলেছেন : বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে বাসুদেব শ্রেষ্ঠ। ঐতিহাসিকদের মতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব খৃঃ পূর্ব নবম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ভিতর। ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক মহাপুরুষ রূপে গণ্য করেন। "ভাগবত ধর্মের প্রাচীন ইতিহাস (৩য় খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন তিনি পার্থিব জীবনে ঐতিহাসিক মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায় ধর্ম-সংস্থাপন ও প্রকৃষ্ট কর্মানুশীলনের পরে সমসাময়িক ও পরবর্তীযুগের ভারতীয় জনগণকর্তৃক দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতে থাকেন।" (পৃ: ১৯৮)। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ "প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস" গ্রন্থে অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। ছান্দোগ্যপনিষদে কৃষ্ণ, মহাভারতে কৃষ্ণ, আর শ্রীরাধার মানভঞ্জনকারী কৃষ্ণ এক কি না এ কথা জোর করে বলা শক্ত কিন্তু আমার মনে হয় একই কৃষ্ণ ভক্তদের কৃপায় ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে শিখিপুচ্ছধারী ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম গোপীজনবল্লভ রাধিকারঞ্জন বংশীধর শ্যামসুন্দরে পরিণত হয়েছেন। (পৃ: ১৩) আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় "বৈদিক সূর্য বিষ্ণুর সঙ্গে অনার্য (দ্রাবিড়) সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক মানব কৃষ্ণের সংমিশ্রণে পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণের উৎপন্ন হয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন।"—হিন্দুদেবদেবীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (২য়) হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য। পৃ: ৩৩২।

শ্রীকৃষ্ণের তিনটি বিভিন্ন সত্তা—মনুষ্য, প্রকৃতি, দেবতার একীকরণ হরিবংশে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। হরি স্বয়ং কেমন করে ভুবন নির্মাণ করলেন, ত্রিলোক রক্ষার জন্য কি কঠোর সংগ্রাম করতে হল তাঁকে এবং তার ফলশ্রুতিই বা কি হল এই সব বিবরণ ও তথ্যাদি হরিবংশকে করেছে সমৃদ্ধ।

হরিবংশ এবং মহাভারত পাশাপাশি রাখলে স্পষ্টত মনে হবে হরিবংশের কাহিনী আদি ও অন্ত যুক্ত। মধ্যভাগের ঘটনা হল মহাভারত কথা। আদ্যন্তের মিল যোজনার জন্য মধ্যস্থ আখ্যানভাগের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখা পাণ্ডবদের দু'একটা প্রসঙ্গ সংক্ষেপে উত্থাপন করে উভয়ের সাদৃশ্য রক্ষা করা হয়েছে। এইজন্য হরিবংশকে কখনও খাপছাড়া বা বিচ্ছিন্ন কাহিনী মনে হয় না। আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত পরিপূর্ণ নিটোল আখ্যানকাব্যের স্বাদে ভরপুর।

হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণ মানুষ রূপে কেন পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতেও আছে সে কথা। দায়িত্বজ্ঞানহীন অত্যাচারী শাসকের নিষ্পেশণে, ব্যভিচারে, লাঞ্ছনায় বসুমতীর জীবন দুর্বিহ, ভয়ংকর যন্ত্রণাময়। অধর্ম, অসত্য, মিথ্যায় জীবনের ক্ষয় ও ধ্বংস, অধঃপতনের পাপ জীবনের অসম্মান, সুখ ও শান্তির অবসান বসুমতীকে অস্থির করে তুলল। সহায়-সম্বলহীন মানুষের নিরন্তর ব্যাকুলতা মুক্তির অধীরতা বসুমতীকে বিচলিত করল। অবশেষে ব্রহ্মার কাছে আর্ত্ত পীড়িতা বসুমতী মুক্তির আকুল আবেদন জানাল। বসুন্ধরাকে মানুষের বসবাসের যোগ্য করে তোলবার জন্য

মানুষকে আরো সুন্দর করে গড়বার জন্য তার মধ্যে ধর্মবুদ্ধি এবং ঈশ্বরানুভূতি জাগানো জন্য বৈকুণ্ঠের নারায়ণকে সুখনিদ্রা ত্যাগ করে মর্তে যেতে হল। একা এলেন না তিনি তাঁর অংশোদ্ভূত সকল শক্তিই পৃথিবীতে জন্মগ্রণ করল তাঁকে সাহায্য করতে।

আসলে এ হল এক রূপক। রূপকের প্রচ্ছন্ন সত্য হল, অবক্ষয়, দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছন নির্যাতন শোষণ, বঞ্চনা, সহ্য করতে করতে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হয় যখন নিদ্রিত মানুষের মধ্যে তার মার খাওয়া আত্মাটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে জেগে ওঠে। শুরু হয় আত্মপ্রক্ষালনের মহড়া। আত্মার নবজন্ম বরণ করে এক নবীনযুগকে। তার জন্যে কত কঠোর দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তাদের। এই সত্যোপলব্ধির বাস্তব রূপ সম্পাদন করতে শ্রীকৃষ্ণকে মানবোদ্ধারের জন্য যে দুঃসহ দুঃখ, কঠোর আত্মত্যাগ এবং নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয় তার এক ঐতিহাসিক গল্প পুরাণকার সত্য-মিথ্যায় মিশিয়ে রচনা করলেন। কালের বিশেষ সংকট সময়, সন্ধি মুহূর্তে এই রকম শক্তি ও মানুষী তেজের বিস্ফোরণ হয়। আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মা অবিনশ্বর। মাঝে মাঝে সেখানে জড়ত্ব আসে অবসাদ দেখা দেয়, পঙ্গুতা সৃষ্টি হয়, অনীহা জাগে - কিন্তু সে সাময়িক। কারণ জীবন থেমে নেই ; নদীর স্রোতের মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে চলেছে। জোয়ার-ভাটার নিত্য যাওয়া আসার মধ্যে নদীর মত জীবনেরও গতিপথ বদল হয়। জীবনের নিজস্ব নিয়মেই জাগে মুক্তির তৃষ্ণা। এই জীবন সত্যকে দার্শনিকের পরিভাষায় শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে বলা হয়েছে :

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজ্যমহম্।।

ঘুমন্ত সত্তাকে জাগ্রত করার জন্যে আমিত্বের বোধন প্রয়োজন। এই তেজের স্ফুরণে সে হয় সর্বশক্তিমান। গীতায় আমিত্বের এই অহমিকা প্রকাশিত। বিশ্বাত্মার মধ্যেও আমিত্বের চেতনা পরিব্যাপ্ত। জন্ম-জন্মান্তর পরিক্রমার ভেতর দিয়ে মানুষের আবির্ভাব বিশ্বরূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে আমরা সে সত্য অবগত হলাম। প্রতি মানুষের মধ্যে আছে ব্যক্তিত্বের দ্যুতি, আত্মার জ্যোতি, শক্তির তেজ। কিন্তু তাকে জানানোর জন্যে একজন সর্বশক্তিমান প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ মানুষরূপে জ্ঞানী অজ্ঞ মানুষকে শক্তি ও তেজের সেই দৃপ্ত প্রকাশ দর্শন করলেন। বীর অর্জুনকে নিয়ে তার এক রূপক গল্প সৃষ্টি হয়েছে মহাভারতে। বিপন্ন পৃথিবীর মুক্তির জন্যে, রক্ষার জন্য সর্বশক্তিমান ভগবান মানবশিশুরূপে আবির্ভূত হন যুগে যুগে। অর্জুনকে তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেন, আমিই হোতা, তুমি কর্মী। সেই কর্মযজ্ঞে তোমার কর্ম আহুতি দাও অর্জুন। এমনি করে কাহিনী রূপক, বাস্তব, দর্শনের সমন্বয়ে উপভোগ্য হয়েছে।

দেশকালের যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা এবং উত্তেজনার মধ্যে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছেন তার কথা আছে — হরিবংশে। এই বিচারে

হরিবংশ ঐতিহাসিক মহাকাব্য। শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা হয়েছে। ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ঐতিহাসিক যদুবংশে।

কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষরূপে সকল ইতিহাসবেত্তা স্বীকার করেন। মহাভারতের প্রাণ ও অন্যতম নায়ক শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালটি সঠিক নির্ণয় না হলেও আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ভারতযুদ্ধের কাল গণনা করে কৃষ্ণের যুগ স্থির করেছেন। কৃষ্ণের আবির্ভাব তাঁদের হিসেবে খৃস্টজন্মের একহাজার বছর আগে। হরিবংশের পুরাতনী কাহিনীতে ঐতিহাসিক সত্য কবি বর্ণনার অলঙ্কারে স্থানে স্থানে রঞ্জিত ও পল্লবিত, তথাপি ঐতিহাসিক তথ্য নিয়েই তা সমৃদ্ধ হয়ে আছে।

গ্রন্থের রচয়িতারা প্রাচীন। মূল ঘটনা প্রাচীনতর, গল্প কথকের মুখে তার বিবরণ পেলেও হরিবংশের কাব্যকথায় শ্রীকৃষ্ণের বংশবৃত্তান্তে সেকালের ইতিহাসের সাক্ষ্য পাই। পাঠকের অবগতির জন্য এখানে সংক্ষেপে তার উল্লেখ করছি। চন্দ্রবংশীয় রাজা দ্বিতীয় যযাতির পুত্র হল যদু। তাঁর দুই পুত্র সহস্রজিৎ ও ক্রোষ্টা। যদুবংশ তিলক শ্রীকৃষ্ণ বা কার্তবীর্যার্জুনের (১০ম পুরুষ) মত দু'চারজন ছাড়া বড় নৃপতির পরিচয় আজ জানা যায় না। যদুবংশীয় আর এক রাজা মহিষ্মান নর্মদা তীরে মহিষ্মতীপুরী নির্মাণ করেন বলে জনশ্রুতি আছে। এর কয়েকপুরুষ পরে যদুবংশীয় রাজা কৃতবীর্যের (৯ম পুরুষ) পুত্র সহস্রবাহুর সন্তান অর্জ্জুন পিতামহের নামের সঙ্গে তাঁর নামটাও জুড়ে দিয়ে পিতার সহস্রবাহু নাম বিশেষণরূপে ব্যবহার করেন। এই সহস্রবাহু (অর্থাৎ সহস্রবাহুর শক্তি তিনি ধরতেন), কার্তবীর্জ্জার্জুন (১২শ পুরুষ) স্মরণীয় হয়ে আছেন পৃথিবীতে। তিনি জামদগ্নি ঋষিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলেন বলে তাঁর পুত্র পরশুরাম প্রতিশোধ নিতে পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিল। কার্তবীর্যার্জুনকে হৈহয়-বংশীয় বলেন অনেকে। কিন্তু হৈহয় (৪র্থ পুরুষ) যদুবংশের একজন রাজার নাম। হৈহয় বংশের পুণ্যশীল রাজা বৃষণের নাম ও পুত্রগণ থেকে যথাক্রমে বৃষ্ণিগণ, মধু থেকে মাধব এবং যদু থেকে যাদবগণ — সম্ভূত হয়েছে। যদুবংশের পুণ্যকর্মা ক্রোষ্টুর তিনপুত্র (অনামিত্র, যুধাজিৎ, দেবমীঢ়ষু) থেকে বৃষ্ণিবংশ তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে। বৃষ্ণি ও অন্ধক ও ভোজ। ক্রোষ্টার পুত্র বৃজিনীবানের বংশে দেবক ও উগ্রসেনের (৩২তম পুরুষ) জন্ম। দেবক ও উগ্রসেনের সন্তান কৃষ্ণজননী দেবকী এবং কংস (৩৩তম পুরুষ)। বৃষ্ণিবংশের শূরসেনের (৩১পুরুষ) পুত্র বসুদেব (৩২) এবং তাঁর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ (৩৩ পুরুষ)। যদুবংশের খ্যাতি এই বসুদেব, দেবকী, কংস ও কৃষ্ণকে নিয়ে।

যুগাবতার কৃষ্ণ যে সময় আবির্ভূত হলেন সে সময় সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎশক্তি গোষ্ঠীর অন্যতম নায়ক জরাসন্ধের পরাক্রমে ভারতবর্ষের সুখ, শান্তি এবং নিরাপত্তায় বিঘ্ন হল। একশ্রেণীর স্বার্থপর, দুর্বল, সুবিধাভোগী রাজন্যবর্গ জরাসন্ধের পক্ষপুট আশ্রয় করে নিরাপদ ভোগ-বিলাসের পঙ্ককুণ্ডে ডুবে রইল। আর, তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন মূঢ়তার দায় বহন করতে হল জনগণকে। জরাসন্ধের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য, এবং রাজন্যবর্গের ভোগ-

বিলাসিতা-আমোদ-স্ফূর্তির জন্য জনগণের উপর জুলুম করে অর্থ আদায়ের নিপীড়ন চলল, ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ ও দুর্বিষহ হয়ে উঠল। জরাসন্ধের আগ্রাসী নীতি জরাসন্ধবিরোধী রাজ্যগুলিকে শংকিত সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। ভারতবর্ষ জুড়ে এক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অসহায়তা মানুষের আত্মশক্তি ও বিশ্বাসকে পঙ্গু করে রাখল। হতাশা-নৈরাশ্য অবসাদ এবং মৃত্যুভয় তাদের সাহস, তেজ, বীর্যাবর্তা কিছুই ছিল না। এইরকম এক যুগসংকটে মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণের জন্ম — একথা পূর্বেই বলেছি। বসুমতীর আকুল আর্তিতে যুগযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ হল। অত্যাচারীর অত্যাচার দমনের জন্য বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। এই রূপক কাহিনীর বাস্তব রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস মৎ-লিখিত শ্রীকৃষ্ণ এলেন দ্বারকায় (১ম ও ২য় খণ্ড)। হরিবংশ যা আভাসে-ইংগিতে বলেছে, উক্ত উপন্যাসে তাকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ এবং কালোপযোগী করে তোলা হয়েছে। বিষ্ণুপর্বে শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলা অংশে রাজনৈতিক সংঘাত, অর্থনৈতিক জটিলতা, ঘটনার ব্যাপ্তি ও বিশালতা, কূট রাজনীতির বন্ধন, বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের লোভ, যুদ্ধের উত্তেজনা, যড়যন্ত্র, বিদ্রোহ গণঅভ্যুত্থান, রাজনৈতিক সংগঠন, মনস্তাত্ত্বিক সংকট, আত্মিক ক্ষয়, শত্রুর ভয়, বিপদ বাধা উত্তরণের সাহস, শক্তি দৃঢ়তা, মনোবল প্রভৃতি নিয়ে যুগের যে অস্থিরতা দেখা যায়, উক্ত উপন্যাস তারই দর্পণ।

পীড়িত দেশবাসীকে মুক্ত করার স্বপ্ন, চিন্তা কৃষ্ণের শৈশব থেকে। বাল্যে, কৈশোরে, তারুণ্যে কেবল বর্ধিত হল। জ্ঞান বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে মুক্তি ব্যাকুল জাতির প্রাণে তার তীব্র আবেগ সঞ্চার করে বিপ্লবের জমি প্রস্তুত করলেন। তারপর একের পর এক উৎপাটিত করলেন কংসের কুকর্মের অন্যতম, বিশ্বস্ত শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক শুভানুধ্যায়ী ও সাহায্যকারীদের। পরিশেষে আঘাত হানলেন কংসের উপর। কংসকে হত্যা করে পুরাতন শাসনকর্তা উগ্রসেনের হাতে ফিরিয়ে দিলেন রাজক্ষমতা। গণতন্ত্রের জয় হল। মথুরায় বৈপ্লবিক গণশক্তির অভ্যুদয় সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হল। কংসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর অন্যতম নায়ক ও নেতা জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করল।

দীর্ঘ আঠারো বৎসর মথুরা অবরুদ্ধ রইল। তবু কৃষ্ণের নেতৃত্বে বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থান তাদের অটুট মনোবল নিয়ে জরাসন্ধের বিশাল বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ চালিয়ে গেল। অবশেষে সংঘর্ষের কৌশল বদলালেন কৃষ্ণ। মথুরা থেকে গোপনে যুদ্ধ ঘাঁটি সরিয়ে নিল দক্ষিণে, সেখান থেকে পশ্চিম সাগর তীর দ্বারকায় নিয়ে গেল। তাতে পরাজয় এড়ানো গেল কিন্তু সম্পূর্ণ জয় হল না। অত্যাচারী জরাসন্ধের অস্তিত্ব নস্যাৎ করা গেল না। ভারতবর্ষ থেকে চিরতরে তাকে উৎখাত করার জন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে সখ্যের প্রয়োজন হল তাঁর। যুধিষ্ঠিরকে সামনে রেখে এক নতুন রাজনৈতিক বন্ধন গড়ে তুললেন ভারতবর্ষে। শান্তি-মৈত্রী-একতা-সহযোগিতার পারস্পরিক আদান-প্রদানে বিশ্বাসী

গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন রাজ্যগুলিকে নিয়ে এক নতুন রাষ্ট্র জোট গড়ে উঠল। জরাসন্ধের শক্তি শিবিরের উপর প্রত্যক্ষ চাপ তাদের সংযত রাখল। ভারতবর্ষে এক নতুন রাজনীতির সূত্রপাত হল। পশুবল নয়, বুদ্ধিবল হল রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির হাতিয়ার। জরাসন্ধও চুপ করে রইল না। কুরু-পাণ্ডবের ভ্রাতৃত্ববন্ধন এর ফলে দৃঢ় হল না। দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল তারা। শ্রীকৃষ্ণের কূট রাজনীতির সঙ্গে জরাসন্ধ গোষ্ঠীর কূট রাজনীতির এক লড়াইর মহড়া চলল মহাভারতে। মৎ-লিখিত 'ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ' উপন্যাসে তার চমকপ্রদ সংঘাতময় কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে।

কালক্রমে ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণই বৈদিক আদিত্য, বিষ্ণু আর ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে ব্রহ্মাণ্ড-পতিরূপে পূজিত নারায়ণের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছেন। ফলে, তাঁর মানবিক প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গেল। পরমদেবতায় রূপায়িত হয়ে গেলেন তিনি। পরমব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিরক্ষার্থে অবতার মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করল। সৃষ্টি ধর্মের ক্রমবিকাশের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ। মানুষ এবং মনুষ্যেতর জীবরূপ পরিগ্রহ করে সৃষ্টির ধর্ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ঐশীশক্তির আত্মপ্রকাশেব মাধ্যমে তাঁর এই অবতার রূপ প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ঐশীশক্তির যতরূপ পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাই নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এই অবতারবাদ। কৃষ্ণের এই অবতাররূপ অগণ্য। তবে দশরূপের আমরা সঠিক পরিচয় পাই। এই দশাবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ এবং মনুষ্যেতর রূপে ঈশ্বরের ঐশ্বরিক শক্তির আংশিক ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। আর নররূপ ধারণ করে অধর্মের বিনাশ এবং ধর্মের ত্রাণ করতে এলেন তাঁরা। এঁরা হলেন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কি। এঁদের মধ্যে পরমপুরুষের দিব্যশক্তি এবং পূর্ণবিভা একমাত্র কৃষ্ণতেই মূর্ত হল। হরিবংশ পাঠকালে পাঠকের শ্রীকৃষ্ণের এই অবতার রূপ প্রত্যক্ষ করবেন।

হরিবংশে অবতারী শ্রীকৃষ্ণ, পৃথিবীকে আরো সুন্দরতর করার জন্যে এবং তার পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য, মানুষের বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য যে সব বিভিন্ন কাহিনী এবং উপকাহিনীর উদ্ভব হয়েছে, তার সারমর্ম হল এই যে, বিষ্ণু যে জলে ছিলেন সে জলে মধুকৈটভের জন্ম। নারায়ণের কর্ণমল থেকে তাদের সৃষ্টি। এই মধুকৈটভ নিয়ে এল দুনিয়ার প্রথম উৎপাত। হরিবংশকার নারায়ণ এবং মধুকৈটভ এই দুটি শব্দের নাম রহস্যের রূপক ভেঙে বাস্তব অর্থ প্রকাশ করেছেন। এর ফলে সৃষ্টি তত্ত্বে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও সত্য প্রকাশ পেয়েছে। মধুকৈটভের মৃত্যুর (মধু অর্থে জল, কৈটভ অর্থে কীট) পর কীট ধ্বংস হল। কিন্তু জলে রইল আর এক কীট, কীটের রাজা সে। জল ছাড়া বাঁচে না সে। পুরাণকার এই আদিম প্রাণের কথা বলতে গিয়ে বললেন 'ঈশ্বর' প্রথম জীবে অবতার হলেন মৎস্য।

তারপর জলেতে মাটি জাগল। সৃষ্টির ক্রমবিবর্তনের ধারায় আর এক শ্রেণীর জলচর এবং স্থলচর প্রাণী জন্মাল। অতএব ঈশ্বর জীবে দ্বিতীয় অবতার হলেন কূর্ম। বিদেশী

*ভূতত্ত্ববিদ্‌গণও বলেন এই সময় "প্লিনিওসরস্‌" নামক এক অদ্ভুত জীব ছিল। —একেই* হরিবংশকার বললেন কূর্ম অবতার। এরপর মাটি শক্ত হল। নানারকম প্রাণী জন্মাল। তাদের জন্য খাদ্য চাই। শক্ত মাটিতে উদ্ভিদ জন্মাবে কি করে? সেজন্য দন্তী প্রাণী চাই, যে দাঁত দিয়ে খোঁচাতে পারবে, মাটি কর্ষণ করে উদ্ভিদ সৃষ্টির উপযোগী জমি তৈরি করবে। প্রয়োজনে একটু জায়গা হলেই জলে স্থলে থাকতে পারবে। সৃষ্টি ধারায় এই অদ্ভুত প্রাণীটির বিস্ময়কর অবদান স্মরণ করে পুরাণকার বললেন ঈশ্বর জীবে বরাহ হলেন।

এরপর ধীরে ধীরে চলল নানা জীব ও জন্তুর উদ্ভব। মৎস্য পুরাণে তাদের নানারকম মুখ ও আকৃতির পরিচয় আছে। সৃষ্টি বিবর্তনের ধারায় বহু যুগ পর এল আর এক নতুন আকৃতির প্রাণী। অর্ধ মানুষ এবং অর্ধ পশুর মিশ্রিত এক জীব। ফল ও পাতা খায়। কিন্তু চার হাত পা মেলে হাঁটে না, বুকেও চলে না। হাঁটে পায়ে। আবার গাছেও চড়ে। এরা হল মানুষের পূর্বপুরুষ, বনমানুষ, গরিলা, বানর প্রভৃতি। পুরাণকার একে বললেন নৃসিংহ অবতার। যার মাথা হতে কোমর পর্যন্ত নরাকৃতি এবং কোমরের নিম্নদেশ সিংহের মতন লেজবিশিষ্ট।

এর পরের যুগে এল মানুষ। কুঠার নিয়ে জঙ্গল কেটে, শত্রু নাশ করে সে বসাল সংসার, নির্মাণ করল গৃহ, পত্তন করল গ্রাম, নগর, রাজ্য। মানুষের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে প্রথম যাওয়ার মশালচি হলেন অবতার পরশুরাম। এই যে পর পর জীবের জন্ম এবং সৃষ্টির বিবর্তন ও বিকাশ একেই বলা হয়েছে অবতারবাদ।

বলাবাহুল্য, সৃষ্টির বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে শাস্ত্রকারেরা বিজ্ঞান-ভাবনার এক দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।

আঠারোটি পুরাণের মধ্যে দশখানি পুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মাপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ-এ কৃষ্ণ-বৃত্তান্ত আছে। এছাড়া নারদীয়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ-এ বিষ্ণুমাহাত্ম্যেরও বর্ণনা আছে। এর মধ্যে মহাভারত পূর্ববর্তী এবং হরিবংশ তার পরবর্তী। প্রকৃতপক্ষে হরিবংশে কৃষ্ণকে জন্ম থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে পাই। জন্ম থেকে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, তারুণ্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্বের বিভিন্ন কালগুলো কোথায়, কেমন করে, কিভাবে কেটেছে, কি কি করেছেন তিনি, কেন করেছেন, তার প্রতিক্রিয়াই বা কি প্রভৃতি তথ্য হরিবংশ প্রথম জানায়। এই তথ্যই পরবর্তীকালের পুরাণগুলির রচনার প্রেরণা এবং উপাদান। হরিবংশে সমগ্র সৃষ্টিতত্ত্বর সঙ্গে অন্বিত করে শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে নারায়ণ বিষ্ণুর অংশরূপে দেখানো হয়েছে পুরাণগুলিতেও সেই ভাবের অনুকরণ হয়েছে। এজন্য হরিবংশকে উল্লিখিত পুরাণগুলির জনক বললে, অত্যুক্তি হয় না। কারণ মহাভারতে যা আছে তা পুরাণ বা ভাগবতে নেই। কিন্তু হরিবংশের শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা পুরাণ এবং ভাগবতে সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পুরাণ ও ভাগবতের কাহিনীর উৎস হরিবংশ। হরিবংশে যা পাই পুরাণ ও ভাগবতগুলিতেও তা

পাই। মূল কাহিনীর রূপ প্রায় এক। ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির যে ধ্যান-ধারণা ও ইতিহাস হরিবংশে অছে পুরাণ কাহিনীতে তা সম্প্রসারিত হয়েছে। কোথাও বা অভিনবরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সর্বশক্তিমান পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেব অতিমানবিক কার্য ও ক্ষমতা আরাধ্য হয়েছে উপরোক্ত পুরাণ ও ভাগবতে। ভক্তের চোখে পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন সর্বৈশ্বর্যময় ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থগুলিতে। এর ফলে, শ্রীকৃষ্ণ অনৈতিহাসিক অতিলৌকিক জগতের এক পরম পুরুষে পরিণত হলেন। আত্মনিবেদনের সুরে ভগবানের দিব্যমহিমাকে অন্তরে উপলব্ধি করা হল মূল কথা 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।'

হরিবংশের বস্তুঋদ্ধ কাহিনী শ্রীকৃষ্ণের এই মধুর ভগবৎ মহিমার ব্যঞ্জনা দুর্লক্ষ নয়। কিন্তু এই স্বর্গীয় বিভূতি এল কোথা থেকে ? হরিবংশের বহুপূর্ব যুগে বেদ ও উপনিষদ রচিত হয়েছে। বেদের দেব-দেবীস্তুতি এবং উপনিষদে বিশ্বরহস্য ভেদের আকূতি — এই দুই ধারার সম্যক প্রভাব হরিবংশের কাহিনীকে করেছে অধ্যাত্মঋদ্ধ। বলাবাহুল্য, কোন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বেদ-উপনিষদের ধ্যান ধারণায় মুক্ত নয়। তৎসত্ত্বেও হরিবংশের স্বকীয় দ্যুতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত, কিন্তু পুরাণগুলির মধে তার সমস্ত কাহিনী বিভাজিত ও অনুভাবিত হওয়ার জন্যে এর জনপ্রিয়তা শিথিল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ভাগবত-এর প্রগাঢ় ভক্তি হরিবংশ প্রচারের প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করে। ভাগবতই ছিল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

উপনিষদের চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিবাদী মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে অভিন্নতা লাভ করেছে। ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনায় এবং দার্শনিক চিন্তায় প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে দৈবিক অলৌকিক এক শক্তিকে অনুভব করা এবং একটিমাত্র নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে বিশ্বের মৌলিক শক্তিরূপে গ্রহণের সূত্রে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, জ্ঞানমার্গে ও ভক্তিমার্গে সেই পরমপুরুষের রহস্যময় অবস্থান এবং পরমসত্তার অন্বেষণ প্রভৃতি ঔপনিষদিক চিন্তাধারার সঙ্গে হরিবংশের দর্শন এবং অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা মিলে যায়। সৃষ্টি কোথা হতে এল? কেমন করে হলো? কে করল? দেবতা এক, না বহু — এইসব প্রশ্নের মীমাংসা বহু অধ্যায়ে আছে। এই দার্শনিক চিন্তার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বহুদেবতা নিয়ন্ত্রিত বিশ্বের পরিকল্পনা থেকে এই প্রত্যয় গড়ে ওঠে যে বিশ্ব একটি নৈর্ব্যক্তিক মহাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই তেজোময় মহাশক্তিধর হলেন শ্রীহরি বা শ্রীকৃষ্ণ। এই জিজ্ঞাসার ফলে যে দর্শন গড়ে উঠেছে তাতে বিশ্বসত্তা পরিকল্পিত হয়েছে এক সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন শক্তিরূপে। সমস্ত জীব, মানুষ, বস্তুকে জড়িয়ে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে সবকিছু ব্যাপ্ত করে আছেন বলেই তাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। বিশুদ্ধ কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করবার প্রেরণা থেকে এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সূত্রপাত।

বিশ্ব হলো সৃষ্টি। ব্রহ্ম হল স্রষ্টা। বিশ্ব সৃষ্টির মূলে আছে একটি প্রচ্ছন্ন প্রাকৃতিক শাক্তর মহিমা। সেই শক্তিই বিশ্বের আশ্রয় এবং সমগ্রভাবে বিশ্বকে একত্বমণ্ডিত করেছে।

পরিব্যাপ্ত বিশ্বের মধ্যে রয়েছে বিশ্বশক্তি। এই হলো উপনিষদের ব্রহ্মবাদের মূল কথা। হরিবংশ ও অন্যান্য পুরাণে সেই উপলব্ধি ব্যাপ্ত হয়ে আছে। বিশ্বসৃষ্টির মূলাধারে রয়েছেন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি আকাশ বাতাস ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সব কিছু ধারণ করে আছেন, সব কিছুর অন্তরে অধিষ্ঠান করছেন। হরিবংশের আদি ও অন্ত পর্বে বারবার সেকথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বহুভাবে বলা হয়েছে। ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণময়। শ্রীকৃষ্ণই এই বিশ্বসৃষ্টির মূল। ব্রহ্মা হয়ে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, নারায়ণ হয়ে জগৎ পালন করছেন এবং রুদ্ররূপে জগৎ সংহার করছেন।

বস্তুত সৃষ্টিতত্ত্বের উপলব্ধি বা বর্ণনা একমাত্র জ্ঞানী বা যোগীর উপলব্ধির বিষয়। কিন্তু তার মধ্যে একটা ঐক্য আছে। সব পুরাণেই জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে এই ঔপনিষদিক উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে। হরিবংশে তার প্রথম প্রকাশ ও ব্যাপ্তি। ব্রহ্মমণ্ডলে পৃথিবী প্রথমে কী অবস্থায় ছিল, কেমন করে প্রাণের অঙ্কুর হলো, জীবের সমাগম হলো? তার বিস্তৃত বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানী কৌতূহল পুরাণকারদের চেতনা ও অনুভূতিকে আলোড়িত করল। তাদের কারণগুলির বর্ণনা বিজ্ঞান নির্দেশিত পথে সম্পূর্ণভাবে হয়নি তবু ঘটনা পরম্পরকে পরম্পরায় সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত করে জানার চেষ্টা করলে বিজ্ঞানী ধ্যান-ধারণায় পৌঁছানো অসম্ভব হয় না। সে তত্ত্বে পৌঁছোনোর আগে পুরাণকারদের তত্ত্বজিজ্ঞাসু মনের একটি পরিচয় নেওয়া দরকার।

বিশ্বসৃষ্টির মূলে রয়েছে প্রকৃতি। একেই বলা হয়েছে ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে শ্রীহরি বা কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির মূলাধারে আছেন তিনি। ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। সব পুরাণের মত হরিবংশেও এই কথাটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন মৃৎপাত্রের উপাদান হল মাটি আর পাত্র হল তার প্রকাশ বা রূপ। কিন্তু নিমিত্তের কারণ হিসাবে যে মানুষ কাজ করে সে থেকে যায় বাইরে। তেমনি ব্রহ্মার উপাদান বিভিন্ন রূপে প্রকট হয়ে নামের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে বহুরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু তার নিমিত্ত হল সৃষ্টির নিয়ামক শক্তি। মানুষের মত সে কিন্তু বাইরে থেকে যাবার নয়। বস্তুর অভ্যন্তরে তাকে স্থিত থাকতে হয়। অণুর মধ্যে যে প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন, সংহত হয়ে থাকে তার নিয়ামক শক্তি তার অভ্যন্তরেই রয়ে যায়। যে শরীরটা নড়াচড়া করছে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার নিয়ামক শক্তি কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে নিহিত। তেমনি বিশ্বজগৎও বিশ্ববিধানের নিয়মে চলছে। সেই শক্তির অদৃশ্য সত্তাকে ভক্ত আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে বহুরূপে কল্পনা করেছেন। তাই, তাঁর স্বরূপ অন্বেষণে ভক্তের তৃপ্তি নেই। বিবিধরূপে বারংবার তাকে বিশ্বরূপের মধ্যে খুঁজছে। এই খোঁজার যেমন শেষ নেই তেমনি পরিতৃপ্তিও নেই। শেষ হয়েও হয় না শেষ। তাই হরিবংশের প্রথম পর্বের বিস্ময় ও অন্বেষণ-অন্ত পর্বেও সমাপ্ত হয় না! এর কারণ অদৃশ্য সত্তারূপী ঈশ্বর বিশ্ব হতে পৃথক নন। বিশ্বের সঙ্গে তিনিও ওতোপ্রোতভাবে মিশে আছেন। সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর রূপে তিনি প্রকাশ পান। সেই ব্রহ্মা দিব্য ও অচিন্ত্যস্বরূপ বলেই তিনি সচ্চিদানন্দ, পরমপুরুষ তাঁর অনন্ত মহিমার কথা বারংবার স্তুতি করতে হয়। কি অপূর্ব সে স্তুতি।

সৃষ্টির কথা কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়। পৃথিবী সৃষ্টির আগে কী ছিল, সাধারণজ্ঞানে তা জানা সম্ভব নয়। তবু বিশ্বসৃষ্টির উৎপত্তি সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। বুদ্ধির অতীত বোধের সে সন্ধান মিলেছে দর্শনে। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ তাতে সন্তুষ্ট হল না। তাকে তো ছোঁয়া যায় না। জ্ঞানের রথে প্রজ্ঞার পথে চলল তার অন্তহীন সাধনা। আলো-আঁধারের জাল ছিঁড়ে সে যাত্রা করল। এক মহাসত্যের অনুসন্ধানে মগ্ন হল। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সঙ্গমে এক অভিনব সত্য উদঘাটিত হল। বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের রথে বিজ্ঞানের সে জয়যাত্রা অটুট রইল সর্বকালে। তাই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান প্রেয় কিন্তু বিজ্ঞান শ্রেয়। শ্রেয়কে সবাই চাই। প্রেয় দৃষ্টির অতীত এক সামগ্রী। তাকে শুধু অনুভব করা যায়। মনের সামগ্রী সে। কিন্তু শ্রেয় হল মনের বিচার। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষ বস্তুকে অতিক্রম করে আত্মিক তত্ত্বময় ঊর্ধ্বতর শক্তির সন্ধান করেছে।

কে, কেন, কি, কার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে দাম্ভিক মানুষও থমকে গেল। বিজ্ঞানও তল খুঁজে পেল না। বাইরের জ্ঞান যখন রুদ্ধ, বিজ্ঞান স্তব্ধ, তখন মনকে সূক্ষ্মতর অনুভূতির পথে এগিয়ে নিয়ে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে অর্থাৎ অন্তর্নিহিত গভীরের মধ্যে বোধ ও বুদ্ধির অগম্য আত্মাকে ডুবিয়ে দিয়ে চিত্তকে অন্তর্মুখী করে সে পেল আর এক জগতের সন্ধান। বিশ্বসৃষ্টির মূলে আছে এক পরম শক্তি। পৃথিবীর রূপান্তর, পরিবর্তন, বৈচিত্র্য, অভিনবত্ব, বিস্ময় সবই সেই মহাশক্তিধর পরমপুরুষের লীলা। তাঁর কাছে ব্রহ্মাণ্ড কেন, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি মুহূর্তের খেলা। খেয়ালও বটে। নইলে, মহাশূন্যে মহাব্যোম থেকে বারিপাত হয়ে কেমন করে মহাজলধি হল? সাগর থেকে মাটি, পাহাড় মাথা উঁচু করে উঠল কার আদেশে? কার শক্তি সামর্থ্যে আবার সাগরের বুকে প্রাণের স্পন্দন জাগল? কার ইঙ্গিতে কি করে বীজকোষে এল জীব, জীবে এল প্রাণের আলো, জাগল স্ফুরণ ও চেতনা? — এর কোন উত্তর নেই। উত্তর পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানের এই নীরবতা ভাঙতে দর্শন এগিয়ে গেল তার নিজের পথে, অনেক দূর। কিন্তু সেও শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও কর্মকে অবলম্বন করে।

প্রত্যয় জাগানোর জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রয়োজন হয়েছে দর্শনের। তাই দেখি ব্রহ্মোপলব্ধির স্বরূপ অনুধাবনে উজ্জ্বল জ্যোতিসম্পন্ন সূর্যকে অবলম্বন করা হয়েছে। সূর্য ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডে আর কে আছে যাকে দিয়ে বিরাট পুরুষের স্বরূপ বোঝানো সম্ভব। আর সেই পুরুষোত্তমের প্রতীক তো কৃষ্ণ বা বিষ্ণু। বিষ্ণু ও সূর্য এক হয়ে গেল তাদের ভাবনায়। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সূর্যই একমাত্র উজ্জল তেজঃপুঞ্জ জ্যোতিষ্ক। আপনার আলোকে আপনি দেদীপ্যমান। সর্বলোকে পরিব্যাপ্ত তাঁর তেজ। তীব্র রশ্মিসমূহ সর্বত্র প্রবেশের শক্তি রাখে। সূর্যের কোন স্রষ্টা নেই, নিজেই দৃশ্য তিনি। এছাড়াও সূর্যের স্বরূপে আছে একটি প্রশান্ত চৈতন্যময় অবস্থা। সূর্য স্থির, শান্ত, গম্ভীর, জ্যোতির্ময়। প্রকৃতিতে তার চাঞ্চল্য নেই, বিকার নেই। নিজের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সূর্য হল আকাশের অধীশ্বর মহাকাশ জুড়ে তার অনন্ত

প্রতাপ, অখণ্ড কর্তৃত্ব। কৃষ্ণও মানুষের হৃদয়ের রাজা। জনমন অধিনায়ক। তাঁর ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণ, তাঁর এ প্রভা, ব্যক্তিত্বের দীপ্তির সঙ্গে সূর্য মিশে গেল। কৃষ্ণ বিষ্ণুরূপে সূর্যের সঙ্গে অভেদ হয়ে গেল। গুণকর্মের বিশ্লেষণে বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে সূর্য ভিন্ন অন্য কোন প্রাকৃতিক শক্তি বলে মনে হয় না। ব্রহ্মের স্বরূপের সঙ্গে সূর্য অভিন্ন। আবার সর্বশক্তিমান, প্রবল প্রতাপান্বিত সৃষ্টিকর্তা নারায়ণ এবং বিষ্ণুর সকর্মকত্বের দ্বারা সর্বব্যাপী তেজ ও শক্তিসম্পন্ন সূর্যের সঙ্গে একাত্মতা প্রতিপাদিত করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সূর্য স্বরূপতঃ অভিন্ন। প্রবল প্রতাপান্বিত সর্বশক্তিমান তেজসমন্বিত বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ গুণকর্মের বিচারে বিষ্ণুরূপে সমাদৃত হলেন। কৃষ্ণের লোকোত্তর প্রতিভা দূরদর্শিতা, বীরত্ব, নেতৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিক। কর্মযোগী মহাপুরুষের মহান কর্মের তুলনা একমাত্র বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গেই তুলনা করা চলে। বিষ্ণুপর্বে ১০৬ অধ্যায়ে করূষরাজ মহাবল দন্তবক্র বলেন "ইহলোকে ইনি একজন প্রকৃত মনুষ্য নহেন, সুরলোকেও ইনি সুরশ্রেষ্ঠ। ইনি কেবল দেবলোকের কেন, এই ত্রিলোকেরও স্রষ্টা।" এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশরূপে সম্মানিত হলেন। বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের ভেদ বিলুপ্ত হল গীতায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করলেন "আদিত্যনামহং বিষ্ণু" অর্থাৎ আদিত্যগণের মধ্যে আমিই বিষ্ণু। বিবাদের নিষ্পত্তি হল। বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণরূপে অর্চিত হল। মানুষ শ্রীকৃষ্ণ হলেন বিষ্ণুর অবতারী রূপ। হরিবংশে তাঁর সেই বিশ্বসৃষ্টির কীর্তি কাহিনী থেকে বৃষ্ণিবংশ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। "বিষ্ণু হইতে বিরাটের উৎপত্তি হইল। পরে সেই বিরাট হইতে যে পুরুষের উৎপত্তি হয় তাঁহার নাম মনু। মনুর পূর্বে ভগবান বিষ্ণু হইতে যে সকল সৃষ্টি হইয়াছে উহা অযোনিসম্ভব। সুতরাং উহার নাম প্রথম সৃষ্টি এবং মনুর পর অবধি স্ত্রীপুরুষ ধর্মানুসারে সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে বলিয়া উহা দ্বিতীয় প্রজা সৃষ্টি নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ দ্বিতীয় সৃষ্টির নামই মন্বন্তর।"(পৃ:-৩)

আদি সৃষ্টির বর্ণনা প্রসঙ্গে হরিবংশকারের ভাষ্য : ভগবান স্বয়ম্ভূ প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন। জল নরের সুনু বলিয়া উহা নার নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রথমে ঐ নার (জল) বিষ্ণুর অয়ন (প্রবেশ স্থান) হইয়াছিল বলিয়া উহার নাম হইয়াছে নারায়ণ। পরে ঐ জলে বীজ নিক্ষিপ্ত হইল। সেই ভাসমান বীজ হইতে একটি হিরণ্যবর্ণ অণ্ড উৎপন্ন হয়। ঐ অণ্ড মধ্যে ব্রহ্মা জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। উহার একভাগ স্বর্গ ও একভাগ পৃথিবী নামে অভিহিত হইল। এই পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যস্থলে যে স্থানে রহিল উহার নাম আকাশ। তখন ভগবান স্বয়ম্ভূ জল পরিপূর্ণা পৃথিবী ও সূর্যকে সৃষ্টি করিয়া পূর্বাদি দশদিক সৃষ্টি করলেন।" (পৃ:-৩)

সূর্যের স্বরূপশক্তি ও পরমাত্মা একই প্রকাশের পূর্ণ এবং আংশিক এই দুই অবস্থা বোঝাতে হরিবংশকার লিখলেন : "সূর্যদেব বসুন্ধরার মধ্যস্থলে বিদীর্ণ করত উর্দ্ধে সমুত্থিত হইলেন। ..... ঐ কলেবর এমনি তেজঃপুঞ্জ বোধ হয় যেন শরীর প্রভায় সমস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলে। ঐ দিব্যপুরুষ ব্রহ্মাণ্ড নামে বিখ্যাত হইলেন। উনিই নারায়ণ।" (২১৮ অধ্যায়)।

সূর্য যেমন নিজ স্থানে সর্বক্ষণ বিরাজ করে ভগবান বিষ্ণুও তেমনি স্বধামে সর্বক্ষণ অবস্থান করেন। যোগীদের পরমার্থিক ব্যাখ্যায় দেখি পরমাত্মা যে মন্দিরে যে লোকে বিরাজিত যে ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত তা এই দেহভাণ্ড। এই দেহেই তার সৃষ্টি আবার এই দেহেই তার লয়। সমস্ত জৈবিক প্রবাহ নিয়ে দেহটাই হয়ে আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ২০৮ অধ্যায়ে আছে " বিকার নিরোধ হইলেই সেই সিদ্ধযোগীর দেহ হইতে নিরালম্ব ব্রহ্ম নির্গত হইয়া বাষ্পাদি মহাভূত অবলম্বন পূর্বক অদৃশ্যভাবে আকাশ মধ্যে পরিভ্রমণ করেন। ব্রহ্মসত্তম সাধু ব্যক্তিরা সমুদয় কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া ওঙ্কারভূত বিশুদ্ধ চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেই সেই যোগীকে দর্শন করিতে পারেন। বিদ্বান ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ঐ ওঙ্কারই পরম ব্রহ্মস্বরূপ।"

এই 'ওম্' শব্দে ও ব্রহ্মে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। নাভিমূল থেকে উৎসারিত ও'কারধনি তিন মাত্রার সংযুক্ত স্বর : অ, উ, ম। দর্শনের ইঙ্গিত হল; গোড়ার যে জিনিস তিনি পুরুষ। তাঁর সে জ্যোতির প্রকাশ নেই শব্দ নেই বর্ণ নেই। অপ্রকাশ, অব্যক্ত অবর্ণ সেই পরম চিৎশক্তি হলেন অনুত্তর। এই অনুত্তর ধর্ম থেকে পেলাম 'অ'। অনুত্তর মানে অপ্রকাশ, আর এক 'অ' বর্ণ এল বেরিয়ে। দুই অ+অ মিলে হয় আ। যুগল 'অ' এর মিলনে হল আনন্দের উৎপত্তি। সেই আনন্দ ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়। হৃদয়পাত্র ভরে ওঠে। এই আনন্দের অন্তরালে আছে ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছার 'ই' ঘনীভূত আনন্দের মধ্যে প্রকাশ পেল আর এক দিব্যজ্ঞানের উন্মেষ। পেলাম উন্মেষের 'উ'। জ্ঞানের শুধু উন্মেষ হল না। সাধনার পথে সে জ্ঞানের ঊর্মি উঠল, মন তরঙ্গিত হল। সেই ঊর্মির মধ্যে পেলাম ঊ। এখন চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া সব যখন শেষ হল, ঔতে এসে সব কিছুর অবসান হল, তখন সে ধারা সে প্রবাহ সব এসে শেষে মিললো একটি বিন্দুতে। আর সেই বিন্দুই হল "ং"। বৃত্তাকার গতিতে ঐ বিন্দু সমস্ত জীবন, জগৎকে ব্যাপ্ত করে ঘুরে আসে সেই জ্যোতিতে। এসে অ'তে মিশে যায় 'অং'। তাই তো সর্বসিদ্ধিতে পাই অহং। এই যে 'অহং' 'সোহং' তার থেকে এই সব। "ব্রহ্মপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতির সহিত সংযোগ করাইয়া একেবারে সোহং ভাবনায় সিদ্ধ হইবে। এই বিশুদ্ধ চৈতন্য জ্যোতিই আকাশ বিদারণ ওঁকার।" (২০৮ অধ্যায়) ওঁকারে প্রবেশ করা মানে ব্রহ্মে লীন হওয়া। ঐ ওঁকাররূপী ব্রহ্ম কে? তিনিই ব্রহ্মা তিনিই বিষ্ণু তিনিই রস, ঐশ্বর্য এক পরমাশ্চর্য পদার্থ।

এইভাবে বুদ্ধি আর বোধের প্রশ্নে বুদ্ধির অতীত যে কথা আধ্যাত্মিকতায় আদর্শ মহান, তার নিগূঢ় রহস্য উন্মোচনে এক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। সাধকের সাধনমার্গের পথে, প্রজ্ঞাবলে ধ্যানের ধারণায় বোধে পরম তত্ত্বের যে ইঙ্গিত ঋষিরা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন তার কথায় সমৃদ্ধ হয়েছে হরিবংশের ভবিষ্য পর্ব এবং আদিপর্ব। আর বিষ্ণুপর্ব হল পরম পুরুষের লীলাপর্ব।

ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টি শূন্যে অবস্থিত। যে শূন্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় সত্তা ভাসছে তাকে বলে ক্ষীরসমুদ্র। শুভ্র আকাশ সলিলের ন্যায় প্রতীয়মান হওয়ার জন্য তাকে ক্ষীর সলিল নামে ভূষিত করা হয়। এই ক্ষীর সলিললের উপর তিনি বিরাজমান। ব্রহ্মাণ্ডও

শূন্যমধ্যে বিরাজ করছে। বাস্তবিক পথে এই শূন্য শূন্য নয়। এও সলিলাত্মক পৃথিবী সপ্তদ্বীপময়ী! সপ্তদ্বীপ সপ্ত সমুদ্রে বলয়াকারে অবস্থিত। অমৃত সমুদ্রের পর দেবতাদের ক্রীড়াস্থল। এই স্থান সর্বদা সুধাময় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত বলে একে সুবর্ণভূমি নামে অভিহিত করা হয়। এ সবই সাধনমার্গের কথা। প্রকৃতপক্ষে এই সপ্তদ্বীপ দেহাভ্যন্তরেই সন্নিবিষ্ট। সাধক বলেন, সাধনায় নিজের শক্তি হল ঊর্ধ্বগামী ষটচক্রভেদ করে ছয়লোক ডিঙিয়ে যেতে হবে সপ্তলোকে ব্রহ্মালোকে যে ঊর্ধ্বগতির ক্ষমতা হয় পরম সাধনার বলে তাই ভারতে প্রকৃত সাধনার জ্ঞান। আর্যভারতের এই স্থান নির্দেশ, এই ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ বর্ণনা অথবা সেই লোকপ্রাপ্তির সাধনা কি অপূর্ব! শব্দ ব্রহ্মের অপূর্ব অনুভূতির ফলশ্রুতি হরিবংশ'র ভবিষ্যৎপর্ব!

নিরাকার ব্রহ্মের সে রূপ কল্পনায় আসে না বলেই অনুভূতি উপলব্ধির গভীরে তার দিব্য জ্যোতির্ময় রূপের অনুধ্যান চলেছে নানাভাবে। তিনি মূর্তিহীন, তিনি জন্মরহিত। তাঁর প্রাণ নেই, মন নেই, শুভ্র তিনি। অন্তর ও বাইরে বর্তমান। তিনি অব্যক্ত, অনির্বচনীয়। তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা! তাঁর থেকেই এই বিশ্ব দুনিয়ার উদ্ভব। সেই বিরাট রূপের কল্পনা, নিরাকার থেকে সাকারে আভাস দিতে পুরাণকার বললেন দ্যুলোক তাঁর মস্তক, চন্দ্র সূর্য তাঁর দুই চক্ষু, দিক হল কর্ণযুগল, বায়ু হল প্রাণ, নিখিল বিশ্ব হৃদয়, পদদ্বয় হল পৃথিবী। সবই পরম স্রষ্টার পরম সৃষ্টি। প্রাণিকুল, উদ্ভিদ জগৎ, নদ-নদী, সাগর, পাহাড় প্রভৃতি সৃষ্টির জন্য পরমপুরুষ আপনাকে বহু অংশে বিভক্ত করলেন। হরিবংশকার তাই বললেন ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড একটি নয় অনন্ত। হরিবংশের পাতায় আছে ব্রহ্মাণ্ডের সেই বৃত্তান্ত। মর্তলোক থেকে সত্যলোক পর্যন্ত সপ্তলোকের সংবাদ, সপ্তপাতালের কাহিনী। সপ্তলোক আর সপ্তপাতাল এই ১৪ টি ভুবন নিয়েই ব্রহ্মাণ্ড। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের দেহ বলে অভিমান করেন তিনিই সেই হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম থেকেই ব্রহ্মা, সুরু সৃষ্টি। সৃষ্টির কাজ প্রজনন। ব্রহ্মা তাই প্রজাপতি।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় মহাকালের মহালীলা। মহাকালের রথচক্রে ব্রহ্মাণ্ডও আবর্তিত হচ্ছে। সে আবর্তনচক্রে এই চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডেরও ধ্বংস হয়। আসে মহাপ্রলয়। মহাকালের আয়ুষ্কালের সে হিসাব হরিবংশকার দিতে ভোলেননি। কী সূক্ষ্ম সে হিসাব! অষ্টম অধ্যায় মন্বন্তর কীর্তন এবং ১৯৭ অধ্যায়ে তার গাণিতিক পরিসংখ্যা আছে।*

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় দিতে গিয়ে হরিবংশকার ঠাকুর-দেবতার লীলাখেলার যে আখ্যান রচনা করলেন এবং তার স্বরূপ যে ভাষায় বর্ণনা করলেন তার সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের আবিষ্কৃত বিজ্ঞান সত্যের ও তথ্যের কোন অমিল নেই, বিরোধও নেই। বেদে, উপনিষদে পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্বও নির্ণীত হয়েছে এক অপরূপ পথ ধরে। সে পথে দেখি ত্রিবিধ সৃষ্টি, তন্মধ্যে প্রথম পরম পুরুষ। বিজ্ঞানের পরিভাষায় পরমাণু। তাকে চোখে দেখা যায়

---

* প্রসঙ্গ হরিবংশ-এ বর্ণিত অংশটি দ্রষ্টব্য।

চিন্ করছিল। আহ্লাদে বিচিত্রভঙ্গি করে সে সমুদ্র তীরে উল্লাসে ধেই ধেই করে নাচল, গাইল হৃদয় আমার নাচে রে। অকস্মাৎ নিজের মনে আক্ষেপ করে বলল: এই সময় যদি প্যারামেট্রিক অ্যামপ্লিফায়ার থাকত আমাদের কাছে তাহলে কী মজাই হত! এখানে দাঁড়িয়ে ঋষির কথা শুনতাম। ওয়াকিটকিতে কথা বলতে পারতাম।

তারপর আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ধরণী। কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আকুলস্বরে বলল : ওগো বাতাস, আমার কথা ঋষির কানে কি পৌঁছে দিতে পার না? আমি ঋষির মা।

ধরণীর চোখ ছলছল করে উঠল। কণ্ঠস্বর তার সহসা ভিজে গেল। ঋষিকে উদ্দেশ করেই বাতাসের সঙ্গে কথাগুলো বলল: ঋষি! কতকাল বাবা দেখি না তোকে? বুক আমার খাঁ খাঁ করছে। ক্যাপ্টেনকে জাহাজটা একটু তাড়াতাড়ি চালাতে বল বাবা। আমি যে আর ধৈর্য ধরতে পারছি না।

নীল আকাশে দূরবীনের কাচে একটি পাখি ভেসে উঠল। আকাশে ডানা মেলে দিয়ে কখনও সোজা হয়ে কখনও কাত হয়ে তীর বেগে আসছিল। মাঝে মাঝে ডানা দুটো ক্রমাগত নেড়ে গতিবেগ বাড়াচ্ছিল। পাখিটা পায়রা জাতের। পায়ে তার সাদা রঙের কাগজের মত কি যেন একটা রয়েছে। ওটা কি পায়ের পালক ? না, কাগজে পাঠানো কারো বার্তা?

আশ্চর্য ব্যাপার মনে হল চন্দ্রদীপের। পাখি কোথা থেকে এল? গাছ নেই মাঠ নেই, ডাঙার চিহ্ন নেই বললেই হয়, তবু পাখি? দলছুট পাখিটা ছিল কোথায়? বিশালাকৃতির ফড়িংগুলো বিবর্তনের নিয়ম মেনে কি পাখি হল অবশেষে? তাহলে এই দ্বীপে কতকাল আছে তারা? মনে মনে হিসাব করছিল চন্দ্রদীপ। কিন্তু সে হিসাব গরমিল হয়ে যাচ্ছিল। ডায়েরী, ক্যালেন্ডার কাছে না থাকলে যে কত অসুবিধা হয়, বা হতে পারে, চন্দ্রদীপের তা কোন ধারণাই ছিল না। আজই অনুভব করল। ইচ্ছে করলে, আজ কোন্ বার, কত তারিখ, কি মাস কিছুই বলতে পারবে না। অথচ, দিন গণনার এই প্রয়োজন থেকে একদিন ক্যালেন্ডার সৃষ্টি হয়েছিল।

অন্যমনস্ক ভাবে মুখে হাত বোলাচ্ছিল চন্দ্রদীপ। হঠাৎ মনে হল, অনেক কাল দাড়ি কাটা হয়নি। কিন্তু তার দাড়ি গোঁফ কোথায়? গাল তো মসৃণ! ব্যাপার কি ? পৃথিবীর চেহারাটা বদলে যাওয়ার জন্যই বোধহয় সব কল্পনাতীত এবং অবর্ণনীয় ঘটনা ঘটছে।

ধরণী খালি চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ, উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল: দীপ, পায়রা! আমাদের বাড়ির লোটন পায়রার মত। সিরাজ ওর নাম।

ঋষির ল্যাগানো লাল, সবুজ রঙ ওর সাদা পালকে লেগে আছে। দ্যাখ দীপ, পায়রাটাকে বোধ হয় ঋষিই পাঠিয়েছে।

বলতে বলতে পায়রাটা মাথার উপর দিয়ে সাঁ করে উড়ে কাছের একটি পাহাড়ের চূড়ায় বসল। অনেকটা পথ উড়ে এসে হাঁফাচ্ছিল সে। কুঁচের মত লাল দুটি চোখে সন্ত্রস্ত বিষণ্ণতা।

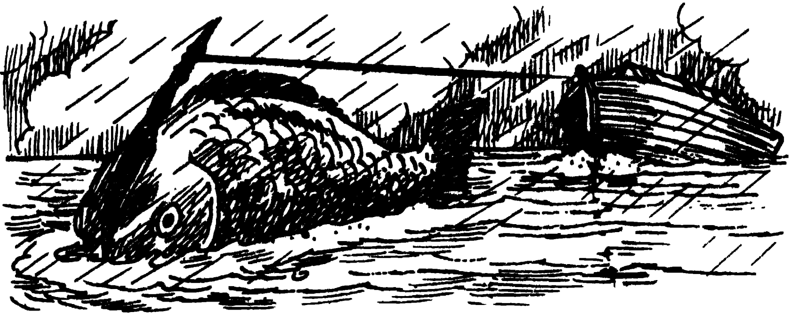
সিরাজ। সি-রা-জ-, নাম ধরে কত ডাকল ধরণী। তবু ভ্রূক্ষেপ করল না। পালকের ভেতর মুখ গুঁজে চুপ করে রইল।

আর এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। আকাশ কালো করে নানা ধরনের পাখি এল সেখানে নেমে। তাদের বিচিত্র কলরবে, কোলাহলে নিস্তব্ধ বনভূমি চকিতে প্রাণ পেল। ছোট ছোট গাছের আকার বড় হতে লাগল। ডালপালায় পাখিরা এসে জড় হল। লেজ দুলিয়ে মনের সুখে গান গাইতে সুরু করল। ডানা ঝাপ্টাঝাপ্টি করে খেলা করতে লাগল। তাদের দেখাদেখি একদল বাঁদর এসে ডালে ডালে লাফালাফি শুরু করল। পাখিরা ভয়ে তারস্বরে চিৎকার করে আকাশে উড়ে গেল। বোঁ করে এক চক্র ঘুরে আবার ডালে বসল।

ছোট্ট পাহাড়ের ওপর বিশালদেহী গরিলা তার চওড়া বুক বাজিয়ে হাঁক ছাড়ল। অমনি পিল পিল করে আরো ছোট বড় গরিলা, শিম্পাজি, বেবুন পাহাড়গুহা থেকে বেরিয়ে এল। এরকম একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখবে সে কল্পনাও করেনি। তবু মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল যে অবাক না হয়ে পারল না।

আশ্চর্য সেই সব দৃশ্য ভোলার নয়। অকস্মাৎ প্রাণের সাড়া পড়ে গেল নির্জন দ্বীপে। চন্দ্রদীপের দু'চোখে বিস্ময়। এত অবাক সে হয়নি জীবনে। ধরণী আনন্দে মুক্ত কণ্ঠে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ আবৃত্তি করতে লাগল। ঋষিকে দেখতে পাওয়া থেকেই তার মনটা খুশিতে ঝলমল করছিল। চোখে মুখে লাবণ্যের ছোঁয়া লেগেছিল।

# স্রষ্টার মালাকার মানুষ



দিন দুই পর জাহাজ এসে ঠেকল দ্বীপের অদূরে। কণ্ঠমিলিয়ে যাত্রীরা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল: দ্বীপ! মাটি! মানুষ! তাজ্জব ব্যাপার!

তাড়াতাড়ি নোঙর টেনে জলে ফেলা হল। লাইফবোট নামল জলে। ক্যাপ্টেন অম্বরীষ বসু এবং ঋষি তাতে চেপে বসল।

অপলক চোখ মেলে চন্দ্রদীপ আর ধরণী দূরবীনে তা দেখতে লাগল। গোটা ব্যাপারটা তাদের কাছে অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্য মনে হল। ধরণীর ভেতর কেমন একটা আত্মবিস্মৃতির ভাব দেখা দিল। হঠাৎ সে স্তব্ধ শান্ত হয়ে গেল।

দাঁড়ের টানে নৌকো ভাসতে ভাসতে তীরে ভিড়ল। লাফিয়ে নামল সপ্তর্ষি। দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল। ধরণী নির্বিকার। সে বোবা, শান্ত। তার মনে অভিব্যক্তি নেই। ঋষিকে বুকের পাঁজরের উপর চেপে ধরল। তার গায়ে মাথায়, হাত বুলিয়ে দিল। অব্যক্ত স্নেহ জানাতে গিয়ে টপ টপ করে জল পড়ল চোখের কোণ দিয়ে। কথা বলতে না পারার যন্ত্রণায় তার পাতলা দুটি ঠোঁট থির থির করে কাঁপছিল। ঋষি মাকে চাঙ্গা করার জন্যে, তার দুই টেপোতে চুমু দিল, চোখের জল মুছে দিল। ঋষির গলা ধরে গেল। চোখের চাহনিতে তার কিসের নিবিড়তা নামল।

ক্যাপ্টেন অম্বরীষ বসু মিলিটারীর লোক। গায়ে তার মিলিটারী ইউনিফর্ম। তবু চোখে মুখে, চেহারায় ধোপ দুরস্থ বাঙালী। বাঙালী রীতিতে চন্দ্রদীপের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করল।

অনেক দিন পর নিজের দেশের মানুষকে পেয়ে চন্দ্রদীপের খুশি ধরে না। ছুটে এসে তাকে আলিঙ্গন করল। বুকের মধ্যে তাকে নিষ্পেষিত করতে লাগল। আবেগগাঢ় স্বরে বলল: উঃ মশাই কতকাল মানুষের মুখ দেখি না। পৃথিবীটা যে এরকম হঠাৎ উল্টেপাল্টে গেল কি করে ভেবে পাই না।

ক্যাপ্টেনের কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। সে বেশ স্থির, ধীর। অবিচলিত শান্ত গলায় জিগ্যেস করল: মহাশয়ের পরিচয়? কার সঙ্গে কথা বলছি? এসব তো কিছুই জানি না।

চন্দ্রদীপ বিমর্ষ হল। আহত আত্মাভিমান বাজল গলায়। বলল: আমি হলাম অধ্যাপক চন্দ্রদীপ চৌধুরী। একজন বাঙালী বিজ্ঞানী। ভারতের প্রথম মহাকাশচারী।

অম্বরীষ উৎফুল্ল গলায় বলল: আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমি ক্যাপ্টেন অম্বরীষ বসু। ভারতের বিমানবাহী বিখ্যাত জাহাজ নীল সাগরের অধিনায়ক। একজন স্বদেশীয় স্বজাতীয় বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার যে কি আনন্দ, দেশের বাইরেই কেবল তা অনুভব করা যায়। আপনি কি বলেন?

চন্দ্রদীপ মাথা নেড়ে বলল: তা-তো বটেই।

আমি কিন্তু আপনাকেই খুঁজতে বেরিয়েছি। আপনার ছেলেকে আইডেন্টিফাই করার জন্য সঙ্গে এনেছি।

আচ্ছা। আপনি কোথা থেকে কিভাবে সংবাদ পেলেন?

মিলিটারী হেডকোয়ার্টার্স থেকে আমার উপর নির্দেশ এসেছে আপনাকে খুঁজে বার করার।

ওঃ। খারাপ আবহাওয়ার জন্যে হরিকোটার সঙ্গে কোন যোগাযোগই করতে পারিনি। এমন কি নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত হারিয়ে ফেললাম। পৃথিবীর কক্ষপথে পাক খেতে খেতে দেখলাম সমস্ত পৃথিবী জলে ভাসছে। কোথাও ডাঙা নেই, উঁচু তলা ঘর বাড়ি, মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। বুকের ভেতর আমাদের হাহাকার করে উঠল পরিণামের কথা চিন্তা করে 'এস ও এস' পাঠিয়েছি সর্বত্র। কিন্তু কোন জবাব মেলেনি।

ক্যাপ্টেন চন্দ্রদীপের কথায় বাধা দিয়ে বলল: হুঁ, পৃথিবীর এরকম বিপর্যয় হয়নি কখনো। পৃথিবী থেকে রোহিণী আপনাকে নিয়ে যাত্রা করার অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হল প্রবল বর্ষণ। অবিরল ধারায় ঝরতে লাগল জল। সে বর্ষণ থামল না আর। মহাপ্রলয়ের মধ্যে গোটা ভারতবর্ষ তলিয়ে গেল। তারপর থেকে জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি জলে জলে। ভেলাতে, ডিঙিতে নৌকোতে করে অনেক প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু বাঁচানো কি সহজ ব্যাপার! সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল অসহায় মানুষগুলোর উপর। অসুখ-বিসুখ তেড়ে এল তার পিছু পিছু। খেতে না পেয়ে দেহ শুকিয়ে গেল। এমনি করে তাদের বাঁচার স্বপ্ন নিষ্ফল হল। বড় করুণ মর্মান্তিক সে সব মৃত্যু দৃশ্য। তবু, যাকে পারলাম

নীলসাগরেতে তুলে নিলাম। বর্ষার জন্যে সপ্তর্ষিও আটকে পড়েছিল। অবশেষে, একটা ছোট বোট নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়েছিল সে। ভাগ্য ভাল ঠিক সময়ে তাকে দেখতে পেয়েছিলাম। না হলে, কি হত, বলা খুব শক্ত ছিল।

চন্দ্রদীপ ক্যাপ্টেনের দুই হাত চেপে ধরে গদগদ স্বরে বলল: ঈশ্বর অনন্ত করুণাময়, জয় হোক তাঁর।

ক্যাপ্টেন ভীষণ চটে গেল। বলল: আপনি না বিজ্ঞানী? ছিঃ! ঈশ্বর আবার কি ? বিজ্ঞান কখনও বলে না ঈশ্বর আছে। ভাবা নিউক্লিয়াস ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত পরমাণু পত্রিকায় আপনার লেখা নিবন্ধ 'মহাবিশ্বে মধুকৈটভ' সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। পরমাত্মা ভগবানকে পরমাণু বলে ব্যাখ্যা করার এই কৃতিত্ব আর কেউ দেখাতে পারেনি। এরপর আপনার মুখে ঈশ্বর পরম করুণাময় কথাটা যদি শুনি তাহলে খুবই হাস্যকর মনে হবে আপনার গবেষণা।

চন্দ্রদীপ মাথা নিচু করল। শান্ত নিরুত্তাপ গলায় বলল: বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীকে এক মেরুতে থাকতে হবে এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম আছে কি মিঃ বসু? বিজ্ঞানী একজন মানুষ। তার প্রাণ আছে, মন আছে, ভাল লাগা মন্দ লাগা, আছে। তার ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক যদি না থাকে দোষ কি ? বিজ্ঞানে প্রমাণটাই আসল। কার্যকারণ সূত্রে গাঁথা। কিন্তু মানুষের মনোজগৎ তো এরকম শৃঙ্খলিত য়।

ক্যাপ্টেন নিজের মনে বলল: আমার কাছে এই মহাপ্রলয় একটা প্রাকৃতিক র্যোগ। একটা বিরাট বিপর্যয়। কোন অলৌকিক কাণ্ড নয়। আমাদের রক্ষা পাওয়া শ্বরের কোন দয়ার ব্যাপার নয়। আবার, আয়ু ছিল বলে বেঁচেছি তাও নয়। বেঁচে াকার মত অনুকূল আশ্রয়ে ছিলাম বলেই এযাত্রায় রক্ষা পেয়েছি। এই যে আরো ানুষ এবং আপনাদের সঙ্গে দেখা হল এও নিতান্ত কাকতালীয়। পৃথিবীর কোথাও াদি দাঁড়ানোর জায়গা থাকে তবে একদিন তার দেখা মিলবেই। ঈশ্বর জুটিয়ে িয়েছে, এ কথা মানতে আমি রাজি নই।

আপনার কথাশুনে মৎস্যপুরাণের একটা গল্প মনে পড়ছে।

খুব ভাল কথা। তাহলে আপনি শুরু করুন।

কিন্তু...

কোন কিন্তু নয়। আপনি সদয় হলে, অধম তা থেকে এক ফোঁটা রস যদি ভোগ । তা-হলে আপনার জ্ঞানসাগর কি রিক্ত হয়ে যাবে?

ক্যাপ্টেনের কথা শুনে মৃদু হাসে চন্দ্রদীপ। বলল: এভাবে দাঁড়িয়ে কি গল্প

জমে? জমিয়ে না বসলে গল্পের মেজাজ আসে না।

বেশ তো ঐ পাথরের ঢিবিটাতেই বসা যাক।

অগত্যা চন্দ্রদীপ গল্প শুরু করল।

মনু থেকে মানব বংশের উদ্ভব। এই মনু হলেন রাজা। কিন্তু ঋষির মত জপতপ করে কাটে তাঁর সময়। চারিণী নদীর তীরে তাঁর মনোরম আশ্রম। প্রতিদিন খুব প্রত্যূষেই স্নান সেরে সূর্য প্রণাম করেন। একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মনু দুই কর জলপূর্ণ করে সূর্যকে নিবেদন করছেন। দুই চোখ তাঁর বন্ধ। একটা বিভোর তন্ময়তার আবেশে তাঁর সর্বাঙ্গে দ্যুতি ছড়াচ্ছে। অকস্মাৎ করদেশ থেকে এক বিপন্ন আর্ত কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এল। বাঁচাও! বাঁচাও আমারে ঋষিবর! আমি এক ক্ষুদ্র প্রাণ। মৃত্যু আমায় তাড়া করে চলেছে। দৈবক্রমে আপনার করস্থ জলে আমি আশ্রয় পেয়েছি। হে বিরাট, হে মহান, আমাকে ত্যাগ কর না। আমি শরণাগত তোমার।

মনুর একাগ্রতা ভঙ্গ হল। সমাহিত হওয়ার ঘোর কাটেনি তখনও। ধীরে ধীরে উন্মুক্ত আঁখিদ্বয় নিবদ্ধ হল তাঁর করস্থ জলে। একটি ক্ষুদ্র শিশু মৎস্য বিপন্ন বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে।

ক্ষীণকায় তণু তার ভয়ে জড়সড়। একটা অব্যক্ত মিনতির আবেদনে তার শরীর নুয়ে পড়েছে। স্থির অপলক মণিতে ব্যাকুল অসহায়তা। মনুর অন্তরে করুণা উদ্রেক হল। মমতায় ভরে গেল তাঁর হৃদয়। সস্নেহে শুধালেন: বৎস, কে তুমি? কোথা থেকে কিভাবে এলে? আমার কাছে এলে কেন? তোমার উৎকণ্ঠা এবং দুর্ভাবনার কারণ কি ? তোমার বিপদই-বা কি ?

ঋষির প্রশ্নে শিশু মৎস্যের অন্তর ভয়শূন্য হল। জড়তা মুক্ত হল। অসংকোচে বলল: ভগবন, মহাজলোধির বুকে যে সৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত করেছিলেন, আমি তাদেরই একজন। এখনও ক্ষুদ্র অবস্থা আমার কাটেনি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীরা বড় হতে পারছে না। শিশু অবস্থাতেই বৃহৎ মৎস্যরা গ্রাস করছে তাদের। কিন্তু পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার সকলের আছে। তবু, বৃহতেরা তাদের দাবি মানছে না। এদের হাত থেকে রক্ষার কোন ব্যবস্থাই বিধাতা করেননি। পৃথিবীতে আমাদের মত অসহায় কে আছে? এই দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে কাটাতে হয় বলেই আমরা উদ্বিগ্ন থাকি। কখন কি হয় — তার জন্য সন্ত্রস্ত থাকি। এখন আপনি রক্ষা না করলে আমার বাঁচা হয় না।

মনুর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, বৎস! তোমার কথা শুনে আমি প্রীত হয়েছি। কিন্তু এ বিশ্বে সবই নিয়মের অধীন। বিশ্ববিধানের নিয়মেই তুমি

জন্মেছ। বিশ্ববিধাতার পুত্র তুমি। তবু দেবতার ক্ষমতা নেই তোমার শরীরে। তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পার না বলে নিরন্তর দুর্ভাবনায় থাক। খুবই সত্য। কিন্তু যে বৃহৎ বিধাতা তাকে বড় দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সে কাজের জন্য মহান ক্ষুদ্রকেও তার সমান দরকার। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীর সাহায্যেরও দরকার ছিল। একে বলে সেবা। দশের কল্যাণ এবং মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা নাম সেবা। বিশ্ববিধাতার কার্যকে শতদলের মত বিকশিত করার জন্যে ছোট-বড় সব প্রাণী নিজেকে নানাভাবে উৎসর্গ করছে। তেমনি তুমিও অন্যের আহার্যার্থে সৃষ্টি হয়েছ। বিশ্বসৃষ্টির রক্ষায় তোমার ভূমিকা ঐটুকুই।

মনুর কথায় অসহায় বোধ করল শিশু মৎস্য। কী উত্তর দেবে সে? অনেকক্ষণ ধরে বলার মত কোন কথা খুঁজে পেল না। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল: মহাত্মন্! আমি মৃত্যুর যন্ত্রণা চিন্তা করে ভীত হয়ে পড়েছি। এখন আপনি আমার ত্রাণ করুন। বুদ্ধিবলে মানুষ এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলছে। স্রষ্টায় মালাকার সে। শতদলের মত পৃথিবীকে প্রস্ফুটিত করার দায়িত্ব বিধাতা তাকেই দিয়েছেন। আপনি সেই মহান কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে আমাকে অনুগৃহীত করুন। শরণাগতকে রক্ষা করা মানুষের ধর্ম।

মনুর অধরে হাসি ফুটল। অবিচলিত স্বরে বলল: বৎস! বেঁচে থাকার দাবি শাশ্বত। তবু, একজনকে গ্রাস করে আর একজন বেঁচে আছে। এটাই বিশ্বনিয়ম। একজনের দাবি রক্ষা করতে গেলে আর একজনের অধিকার খর্ব হয়। তার বাঁচার দাবি নস্যাৎ হয়ে যায়। সকলের সমান বাঁচার দাবি স্বীকার করে নিলে কেউই বাঁচবে না। তুমিও না। একটা ক্ষুদ্র জলকীট তার নিজের জীবন উৎসর্গ করে তোমার খাদ্য যোগাচ্ছে। এমনি করে একে অপরের পরিপূরক হয়ে বিশ্বধারা বয়ে চলেছে। এর ব্যাতিক্রম ঘটলে তালভঙ্গ হবে। নটরাজের পায়ের তলায় বিশ্ব দুলে উঠবে। তুমি কি তা চাও?

শিশু মৎস্য কী বলবে এর উত্তরে। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে মুনিবরের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর সখেদে বলল: তাহলে দুর্বলকে পালন করবে কে? তাকে রক্ষা করার কেউ নেই এ জগতে। বিধাতাও না! নিরুপায় অসহায় জীবকুলকে গালভরা আত্মোৎসর্গের গল্প শুনিয়ে সবলেরা নিজেদের বাঁচার দাবি এবং ভোগ সুখের গণ্ডিকে ক্রমাগত বাড়িয়ে যাচ্ছে। এটা অনিয়ম নয়? বিশ্বনিয়ম কি এক একজনের জন্য এক একরকম হয়? হয় না। তবু চলেছে এই প্রতারণা এই ছলনা!

মনুর দুই চোখে কেমন একটা বিহ্বল নিবিড়তা নামল। তাকে অন্যমনস্ক এবং চিন্তিত দেখাল। শিশু মৎস্য তখন আরো উৎসাহিত হয়ে বলল: ঋষিরা বলেন: আত্মানং সততঃ রক্ষেৎ। লোকে বলে, আপনি বাঁচলে বাবার নাম।

তারপরেই শিশু মৎস্য মনুর জবাবের প্রত্যাশা না করে মুনির কমণ্ডলুস্থ জলেতে লাফিয়ে পড়ল।

মনুর মুখে প্রসন্ন হাসির ছটা। প্রশান্তিতে ভরে গেল তার চিত্ত। শিশু মৎস্য দিল তাঁকে এক দিব্যজ্ঞান। ভাব এল মনুর প্রাণে। এল পরমানন্দের অনুরাগ। কমণ্ডলুস্থ জলের উপর চোখ রেখে মধুর স্বরে স্বগতোক্তি করলেন: বৎস! এ পৃথিবীতে কেউ কারো রক্ষাকর্তা নয়, প্রত্যেকেই নিজেকে নিজে রক্ষা করে। বাঁচার কৌশল যার অধিগত তাকে ধ্বংস করার শক্তি কারো নেই। তোমার কার্যে আমি পরম প্রীত হলাম। তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই। আমার কমণ্ডলুতে তোমার জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ হোক এই আশীর্বাদ করি।

শিশুমৎস্য বলল: মুনিবর বড় হয়ে তোমার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করব।

মনুর কমণ্ডলুতে চন্দ্রকলার মত বড় হতে লাগল সে। তাকে নিয়ে মুনির নানা চিন্তা। মাঝে মাঝে দুর্ভাবনাও যে হয় না তা-নয়। কমণ্ডলুর ভেতর যে ভাবে সে বড় হতে লাগল তাতে কিছুদিনের ভেতর সেখানে তার স্থান-সংকুলান করা কঠিন হল। অতঃ কিম্! ভাবনা চিন্তা করে মনু বিমর্ষ হল। মুনিকে চিন্তাকুল দেখে মৎস্য বলল: পুরুষোত্তম! শরণাগতর চিন্তায় আপনি বিব্রত এবং বিভ্রান্ত। কর্তব্য স্থির করতে দ্বিধান্বিত। আমার শৈশব উত্তীর্ণ। এখন আপনি আমায় নিশ্চিন্ত মনে কোন জলাশয়ে স্থানান্তরিত করুন। সেখানে আমি নিরাপদেই থাকব।

মৎস্যের কথা শুনে মনু আশ্বস্ত হল। তার ইচ্ছাক্রমে একটি জলাশয়ে রাখল তাকে। শিশু মৎস্য সেখানে বড় হতে লাগল। মৎস্যের আশ্রয়দাতা এবং রক্ষক বলে মনু তার নিত্য দেখাশুনা করেন। চোখে চোখে রাখেন সর্বদা। একদিন বালকত্বও ঘুচল। তখন পুনর্বার তাকে একটি বড় দীঘিতে স্থানান্তরিত করলেন। সেখানে তার কৈশোরত্ব কাটল। আত্মরক্ষায় উপযুক্ত হয়েছে বিবেচনা করে নদীতে যাওয়ার জন্য মুনির অনুমতি প্রার্থনা করল। মনুও তাকে নদীতে রেখে দিয়ে এলেন। নিজের জায়গায় স্বচ্ছন্দে এবং নির্ভাবনায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। মনু তাকে স্বাধীন ভাবে এবং স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে দেখে খুশি হলেন। একদিন স্নানরত মুনিকে মৎস্য জানাল: এবার সে মহাসাগরে যাবে। কিন্তু মুনির কাছে সে কৃতজ্ঞ। তাই কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে বলল: মুনিবর! আপনার স্নেহ যত্ন পরিচর্যা ভুলবার নয়।

আপনার ঋণ পরিশোধের সাধ্য আমার নেই। তাই, যে কোন উপায়ে আপনার সেবা করতে পারলে আমি ধন্য হব। আমার সে প্রত্যাশা পূরণের বেশি দেরি নেই।

মনু কৌতূহলিত হয়ে অধৈর্য স্বরে জিগ্যেস করল: বৎস তোমার কথায় উদ্বিগ্ন হচ্ছি।

মৎস্য বলল: মহাত্মন্! আমি জলচর প্রাণী। পৃথিবীর ভূ-গর্ভের খবর সর্বাগ্রে পাই. শীঘ্রই এক বিপর্যয় আসছে। দ্যুলোকে, ভূলোকে চলেছে তার গোপন আয়োজন। শীঘ্রই মহাপ্রলয়ের সূচনা হবে। ধরিত্রী জলমগ্ন হবে। ভূখণ্ডের কোন চিহ্ন থাকবে না। সব ডুবে যাবে জলে।

মনুর দুই চোখে বিস্ময়। অবাক স্বরে জিগ্যেস করল তা হলে কেমন করে সৃষ্টি রক্ষা পাবে?

সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য ব্রহ্মার রূপ ধারণ করল। বলল: মুনিবর আমিই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। তোমাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলুম। সত্যিই মহাপ্রাণ তুমি। বিশ্বসৃষ্টির প্রতি তোমার মমতা অপরিসীম। এ ব্রহ্মাণ্ড রক্ষার ভার আমি তোমাকেই দিলাম। তুমি এর দায় বহন করে অনুগৃহীত কর আমায়।

অস্ফুটস্বরে মনু জিগ্যেস করল: সামান্য মানুষ আমি! বিশাল পৃথিবীর জীবকুলকে বাঁচানোর শক্তি কোথায় পাব? কেমন করে প্লাবন থেকে ত্রাণ করব তাদের?

মস্ত এক কাঠের নৌকো করে সর্বপ্রকার জীব রাখ তাতে। প্রত্যেক জাতের একজন করে স্ত্রী ও পুরুষ থাকবে শুধু বংশধারা বহন করার জন্যে। এদের সন্তান-সন্ততিতে ভরে উঠবে নতুন ধরিত্রী। কালক্ষয় না করে এখন থেকে কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হও। যথাসময়ে আমাকে শৃঙ্গযুক্ত মীনরূপে সমুদ্রে দর্শন পাবে।

সত্যিই একদিন প্লাবন এল। দেখতে দেখতে ডুবে গেল সব। ডাঙার কোন চিহ্ন নেই কোথাও। প্রলয় জলোধির বুকে সর্বপ্রকার জীবে পরিপূর্ণ মনুর বিশাল তরণী ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে চলল। প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে তরণীটি ভীষণ আন্দোলিত হতে লাগল। বেসামাল তরী কোথায় চলেছে, কোনদিকে যাচ্ছে কিছুই বোঝা গেল না।

দুর্ভাবনার অন্ত নেই মনুর। অনেকগুলো দিন ও রাত্রি কাটল। তারপর একদিন প্রাতে দেখল খড়্গযুক্ত এক বিশাল মৎস তরীর গা ঘেঁসে চলেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল মনুর। মৎস্য তার শৃঙ্গ দিয়ে তরীটি টেনে নিয়ে চলল। অবশেষে তরীটি এক পাহাড়ের শৃঙ্গে এসে ঠেকল। সেখানে নোঙর করল নৌকোটি। সর্বপ্রকার জীব নিয়ে মনু সেখানে নতুন সংসার পাতল।

গল্পের মধ্যে ধরণী এবং সপ্তর্ষি সেখানে এসে দাঁড়াল। চন্দ্রদীপের গল্প শেষ হলে ধরণী বলল: পুরাণের গল্পের সঙ্গে আমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের ঘটনা রেখায় রেখায় মিলল। মনুর এবং আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের কোনো তফাত নেই। সব মহাপ্রলয়ের রূপ এবং চরিত্র বোধ হয় এক। আমরা গুটি কয়েক প্রাণী এই দ্বীপের বাসিন্দা।

ক্যাপ্টেন অম্বরীষ বসু বলল: মিসেস চৌধুরীর কথাগুলো ভারি সুন্দর।

ধরণীর মুখে টেপা হাসি। চোখে কৌতুকের ছটা। বলল: তাই বুঝি। কিন্তু মশাই, আপনার কাছে আমাদের অনেক দাবি।

সর্বনাশ, মহিলাদের দাবির কথা শুনলে বড় নার্ভাস্ হয়ে পড়ি।

ধরণী দুই চোখ টান টান করে বলল: আপনি না মিলিটারী ম্যান?

আলবৎ!

যুদ্ধে তো আপনার ভয় পাওয়ার কথা নয়।

যদিও আমি নেভির লোক, তবু নারী আর তরীতে কোন তফাত নেই। দুজনেই মাঝপথে ডোবায়।

হো-হো করে অট্টহাস্য করে উঠল সকলে।

ধরণীর অধরে টেপা হাসি। বলল: মনুর সংসার পত্তনের দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। আপনার প্রবল আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় মনোবল, শক্ত শরীর, সৈনিকের কর্তব্যপরায়ণতা, শৃংখলাবোধ এবং দায়িত্বজ্ঞান সকল প্রতিবন্ধকতা জয় করার স্পর্ধা রাখে। আপনার উদ্যমে এবং উদ্যোগে এই দ্বীপ নবরূপে সাজতে পারে।

মিসেস চৌধুরী, এই মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে একজন নারীর মুখে এই কথাগুলো শুনতে ভীষণ ভাল লাগছে। কিন্তু এই প্রশস্তির কি খুব দরকার ছিল?

একে প্রশস্তি ভাবছেন কেন? আমাদের সামনে বাঁচার সমস্যা। অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব। মানুষের শত শত বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় গড়ে তোলা সভ্যতা নিশ্চিহ্ন আজ। উত্তরপুরুষের কাছে সবই গাল গল্প, প্রবাদবাক্যের মতন। তাই, সেই পৃথিবীর কিছু স্মৃতি অক্ষয় করে রেখে যেতে হবে আগামী দিনের বংশধরদের জন্য।

ক্যাপ্টেন মিঃ বসু অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল: আমাদের পুরোন পৃথিবীটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল?

ভাঙা এবং ধরা গলায় বলল চন্দ্রদীপ: হ্যাঁ ক্যাপ্টেন। আমাদের চিরচেনা পৃথিবীটা আজ আর নেই। সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে জলে তলিয়ে গেছে। দূর ভবিষ্যতে সে প্রত্নতাত্ত্বিকের কৌতূহল পূরণ করবে।

বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। বুকভর্তি কষ্টটা বেরিয়ে গেল শ্বাসের

সঙ্গে। মনে বল এল। বলল: গতস্য শোচনাঃ নাস্তি। যা গিয়েছে তার জন্য বিলাপ করে লাভ নেই। এস আমরা সকলে মিলে এই দ্বীপটাকেই নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে পুরোন পৃথিবীর মত করে তুলব। আপনার মত একজন কর্মঠ, দৃঢ়চেতা মিলিটারীকে পাশে পেয়ে আমার হারানো মনোবল ফিরে এসেছে।

ক্যাপ্টেনের চোখে মুখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। অবাক স্বরে বলল: সে কি কথা।

ধরণীর হাতে ছিল লাঠির মত লম্বা একটা দূরবীনের চোঙ। ক্যাপ্টেনের দিকে সেটা বাড়িয়ে বলল : আপনি ধরুন এর দণ্ড, আমি বাঁধি এর পতাকা। তারপর দুজনে মিলে তুলে ধরি মানব সভ্যতার বিজয় কেতন।

ধরণীর গায়ে পড়া ভাব এবং বাড়াবাড়ি চন্দ্রদীপের ভাল লাগল না। মনে মনে সে ভীষণ চটল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। চোখের তারায় তার নীরব ভর্ৎসনা প্রকাশ পেল। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে আবেগগাঢ় স্বরে বলল: ভয় পাচ্ছ কেন ক্যাপ্টেন? মিলিটারী তো বিপদ, বাধা, ভয় জানে না। জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া তার কাজ, লক্ষ্য তার জয়। জয়ের জন্য সব দুঃখ কষ্ট তাকে সইতে হয়। তুমি সে জয় চাও না? অদৃষ্টের ক্রীড়নক হয়ে আমরা থাকব কেন? ভাগ্য আমরা নিজের হাতে তৈরি করব। কিন্তু সে কাজ আগের মত শক্ত নয়। আদিম মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে নিজের কাজে লাগাতে অনেক সময় নিয়েছিল। আমাদের শিক্ষা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, অনুশীলন অনেক পরিণত এবং উন্নত। আধুনিক অবস্থায় আসতে আমাদের সিকিভাগও সময় লাগবে না। মনুর উপাখ্যানই আমাদের প্রেরণা। আমাদের নির্ভয় পাথেয়।

ক্যাপ্টেন মনের খুশি চেপে ধরে রাখতে পারল না। আবেগে জড়িয়ে ধরল চন্দ্রদীপকে।

থর থর করে কেঁপে উঠল চন্দ্রদীপের শরীর। মনে হল তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। চোখের উপর পৃথিবীটা ঘুরছে, ধরণী দুলছে। আলো রঙ মুহুর্মুহু বদলে যাচ্ছে। কণ্ঠ দিয়ে তার একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল।

কানের কাছে গোঙানির শব্দ। ধরণীর ঘুম ভেঙে গেল। ধড়ফড় করে উঠে বসল বিছানায়। অনুসন্ধিৎসু চোখে এধার ওধার তাকাতে লাগল।

ভোরের আলো ঢুকেছে ঘরে।

ইজিচেয়ারে অঘোরে ঘুমুচ্ছে চন্দ্রদীপ। সামনে তার স্যার হলডনের* থিয়োরীর পাতা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। আর, তার মাথাটা বেঁকে ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে।

* পৃথিবীতে কিভাবে প্রাণের সৃষ্টি হল এ সম্বন্ধে অধ্যাপক জে. বি. এস. হলডনের তত্ত্বটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ফলে, শ্বাসকষ্ট জনিত একটা গোঙানির শব্দ বার হচ্ছিল। ধরণী বিছানা থেকে মাটিতে নেমে এসে তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকল। কিন্তু চন্দ্রদীপের ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলল : ক্যাপ্টেন, এই দ্বীপে আমরা সবুজ ফসল ফলাব, মানুষের বসতি গড়ব। বড় বড় কল-কারখানা বানাব। মানুষ তার কল্পনা দিয়ে, মেধা দিয়ে পৃথিবীকে সুন্দরতর করে সাজিয়ে তুলেছে বলে ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বর হয়ে বসেছেন ব্রহ্মা। সৌন্দর্যের এই পীঠভূমিতেই ব্রহ্মার পদ্মাসনরূপে কল্পিত হয়েছেন সৃষ্টির সুন্দরতম রূপ, বিকাশের প্রতীক চিহ্ন।

ধরণী চন্দ্রদীপের স্বপ্নের ঘোর কাটানোর জন্যে তার শরীর ধরে ঝাঁকুনি দিল। বলল: শুনছ! বলি শুনছ—

চন্দ্রদীপের দুই চোখে কেমন একটা আচ্ছন্নভাব। স্বপ্নের আবেশ মাখানো চাহনিতে কিসের বিহ্বলতা তখনও জড়ানো। ঘুম ঘুম গলায় বিড় বিড় করে বলল; মানুষের হাতে পৃথিবীর শ্রী সৌন্দর্য ঐশ্বর্যই লক্ষ্মীর প্রতীক।

ধরণী জোরে চিমটি কাটল একটা। উঃ করে উঠল চন্দ্রদীপ। ঘুম তার ছুটে গেল। বড় বড় চোখ করে তাকাল ধরণীর দিকে। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ রগড়ে তাকাল ধরণীর দিকে। এবার চন্দ্রদীপের অবাক হওয়ার পালা। বিস্ময়ের পর বিস্ময় তাঁর দুই চোখের মণিতে। কোথায় গেল সেই অজানা দ্বীপ? দিগন্তবিস্তৃত মহাসমুদ্রের উচ্ছল জলরাশি? কোথায় মহাকাশ পরিভ্রমণের রকেট?

বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠস্বর চন্দ্রদীপের। বলল : আমরা তা-হলে রকেটে চেপে মহাকাশে যাইনি? মহাপ্রলয়ের অগাধ সলিলে ভাসিনি! নীলসাগরে ঘর সংসার পাতিনি। সব স্বপ্ন! মিথ্যে!

ধরণী চন্দ্রদীপের কথা বুঝতে পারল না। মুখ টিপে হাসল। আঁখিতে তার কৌতুকের ছটা। মজা করার জন্য বলল: মধুকৈটভের ভূত তোমার মগজে। ওটাকে এবার বিদায় কর।

চন্দ্রদীপের ঠোঁটে হাসি। কৌতুক করে বলল: মহাকাশ অ্যাডভেঞ্চারের মজাটা তুমি আমার সঙ্গে থেকেও পেলে না ধরণী। একেই বলে কপাল। আমি একাই মহাবিশ্ব দেখে ফিরলাম।

ধরণীর ভুরু কোঁচকাল। বিস্ময়ে উজ্জ্বল হল দুই চোখের তারা। সকৌতুকে বলল: ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখটাকার স্বপ্ন দেখার সাধ আমার নেই।

স্বপ্নের মধ্যে মহাকাশ ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ কী দারুণ, তুমি যদি জানতে তা-হলে একথা বলতে না।

বেশ, চা খেতে খেতে তোমার রোমাঞ্চকর মহাকাশ অভিযানের স্বপ্নের গল্প শুনব।

# সৃষ্টি স্থিতি লয়ের লীলা

চন্দ্রদীপের স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেল ধরণী ও সপ্তর্ষি। পুত্র ঋষি কথাগুলো হাঁ করে গিলছিল। ধরণীর দুচোখে কৌতুক, মুখে স্মিত হাসির ঝলক। চন্দ্রদীপের মুখেও একটা দৃপ্ত হাসি হাসি ভাব।

গল্প শেষ হলে ধরণী চুক্‌চুক্ করে মুখে একটা শব্দ করল। আক্ষেপ করে বলল, ইস, দারুণ মিস্? ভাবতেই খারাপ লাগছে। অন্তত স্বপ্নেতে তো মহাকাশটা একবার পাক খেয়ে আসা যেত। বিনাপয়সায় এমন ভ্রমণটা না হওয়ার জন্য সত্যি খারাপ লাগছে।

সপ্তর্ষি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। ধরণীর মত সেও আক্ষেপ করে বলল: জলের বুকে জাহাজে করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্নটা আমি যদি দেখতে পেতাম কী মজা হত!

চন্দ্রদীপ কৃত্রিম গাম্ভীর্য প্রকাশ করে বলল: ঘুমিয়ে বিনা পয়সার ভ্রমণের কষ্ট ও বেদনা ভীষণ। মাইকেলের মত আত্মবিলাপ করে বলতে ইচ্ছে হবে "নিশার স্বপন সুখে সুখী যে, কি সুখ তার জাগে সে কাঁদিতে।"

ধরণী একগাল হাসল। কণ্ঠে তার কৌতুক। বলল: স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিল কানে, ওরে বাছা স্বপ্নকোষে রতনের রাজি। ভিখারীর দশা তোর ঘুচে গেল আজি। যা ফিরি জ্ঞানবান তুই, যারে ফিরি ঘরে, পুরাণের রত্নভাণ্ডার পূর্ণ তোর বিজ্ঞানে।

চন্দ্রদীপ ধরণীর নির্মল কৌতুকে মর্মাহত হল। বলল: ঠাট্টা নয়!

ধরণী দুই চোখ টান টান করে বলল: কে বলল ঠাট্টা করছি? স্বপ্নে মানুষ তার অনেক জিজ্ঞাসা এবং রহস্যের সন্ধান পায়। স্বপ্ন মানেই অলীক নয়। মনের গভীরে লুকোনো যে সব ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তাগুলো জাগ্রত অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে আসতে কুণ্ঠিত হয় ঘুমের মধ্যে হাত ধরাধরি করে তারা নিরিবিলি জায়গায় এসে দাঁড়ায়। ঘুমিয়ে মানুষ নিজেকে অনেকখানি দেখতে পায়। তাই স্বপ্ন মানুষকে নতুন সত্য উদঘাটনের পথ দেখিয়েছে।

চন্দ্রদীপের গলায় খুশির সুর। বলল— তুমি ঠিক বলেছ।

ধরণী সব সময় ঠিকই বলে। কল্প বিজ্ঞানের উদ্ভট কাহিনী বিজ্ঞানীদের বহু গবেষণার পাথেয়। রকেটের যুগে প্রবেশ করার বহু আগে উড়ন্ত চাকী, ভিন্নগ্রহের মানুষ, মঙ্গলগ্রহের প্রাণীর অস্তিত্ব এসব ভাবনা-চিন্তা কল্প বিজ্ঞানের গল্প, বৈজ্ঞানিকদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

উৎফুল্ল হয়ে চন্দ্রদীপ বলল: চারশ কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে যে বিবর্তন ঘটেছে পুরাণকারের ভাবনার সঙ্গে তার মিলটা কোথায় এবং কিরূপ সেই কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি। অবচেতন মনের আয়নায় আমার জিজ্ঞাসার ছবি ফুটে উঠেছে। স্বপ্নে সত্যিই আমার অনেক জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজে পেয়েছি।

সপ্তর্ষি অকস্মাৎ প্রশ্ন করল : আচ্ছা বাপী, মনু এবং মহাপ্রলয় নিয়ে যে গল্প বললে, তার তাৎপর্য কি ? পর্বতশৃঙ্গে আশ্রয় নিয়ে মনু কি করল? আমরা যে সভ্যতার মধ্যে বাস করছি একি সেই সভ্যতার? যদি না হয় তা হলে সে সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়েছে কি ? যদি হয় তাহলে নতুন সভ্যতার পত্তন হল কি করে?

ধরণী বলল: বাপ্‌কা বেটা! পুরাণের গল্প সূত্র ধরে এই প্রশ্নের জবাব খোঁজা বৃথা।

প্রতিবাদের উত্তরে চন্দ্রদীপ কি বলবে ভেবে পেল না। কয়েকটা মুহূর্ত তাকে চিন্তিত দেখাল। মনুর উপাখ্যানের বাস্তব পরিণতি কি হয়েছিল জানে না সে। একে নিয়ে সুন্দর একটা গল্প বানানো যেতে পারে, কিন্তু সে গল্পকার নয়। তবু সত্য মিথ্যা মিশিয়ে গল্পের ছকে বলাই ভাল মনে করল। ভয় তার ধরণীকে। অসহায় ভাবে তার দিকে একবার তাকাল। তারপর সপ্তর্ষির কৌতূহলী দুই চোখের উপর চোখ রেখে একটা ভূমিকা করল। বলল: পর্বত শৃঙ্গে মনুর প্রথম চরণপাতের দিন থেকে এগিয়ে চলেছে মনুর সন্তানেরা। মনুর অমৃতের পুত্রেরা ভারতের বুকে, জগতের বুকে যে অভিযান শুরু করেছিল মহাপ্রলয়ে তার শেষ কি না বলতে পারব না। তবে, বিভিন্ন স্থানে তাদের অভিযানের গল্প কাহিনী অক্ষয় হয়ে আছে। বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে তাদের বংশধরেরা যে নানা ভাগ্য বিপর্যয়, যুদ্ধ-বিদ্রোহ, প্রাকৃতিক দুর্বিপাক কাটিয়ে চলেছে তার বহু গল্প আছে। কোন যুগে, কোন মন্বন্তরে, মনু আগে এ বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। চতুর্দশ মনুর নাম আছে শাস্ত্রে। প্রত্যেক মনুর শাসনকাল ৭১টি মহাযুগের-- অর্থাৎ, সত্য, ত্রেতা দ্বাপর, কলির। তার মানে এক এক মনুর সময়ে ৭১টি করে সত্য, ত্রেতা দ্বাপর কলির অবসান হয়েছে। তারপর মহাকালের রথচক্রে আসে মহাপ্রলয়। হয় মন্বন্তর। সূচনা হয় নতুন যুগের। নতুন কালের। এইভাবেই মনুর শাসন অব্যাহত আছে যুগযুগ ধরে। এখন কোন্ মনুর সময়, তা বলা খুবই মুশকিল।

চন্দ্রদীপ এক মুহূর্তের জন্য থামল। এক চুমুক জলে গলাটা ভিজিয়ে নিল। গ্লাস আড়াল করে সে একবার ধরণীর মুখখানা ভাল করে পরখ করে নিল। তারপর ঢোক গিলে বলল: পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদলের উপর ব্রহ্মাকে যেদিন দেখা গেল সেদিন

মানুষের আবির্ভাবের দিন। সৃষ্টির প্রথম প্রত্যূষ থেকে তুষার প্রবাহ, কীট সরীসৃপ, মৎস্য বরাহ প্রভৃতি নানাবিধ যুগ পার হয়ে প্রায় চার কোটি বছর পর প্রথম মানবাকারে জীব দেখা মিলল। আর তার কয়েক কোটি বছর পর পূর্ণ মানবের দেখা মিলল। মানববংশের প্রথম পুরুষকে পুরাণকার ব্রহ্মার সন্তান বললেন। নাম তার মনু। মনু শব্দের অর্থ হল মনুষ্য বা মানুষ। এই মানুষ ব্রহ্মার সৃষ্টি। মানুষের হাতে এই পৃথিবীর ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে। মুহুর্মুহু সাজবদল হয়েছে পৃথিবীর। কেন না, পৃথিবীর অন্য প্রাণীর মত মানুষ পৃথিবীকে শুধু ভোগ করিনি, সে তাকে মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনা করেছে। স্বপ্ন দিয়ে রচনা করেছে। ব্রহ্মার পদ্মাসন মানুষের রচনা এবং কল্পনা। মানুষ পৃথিবীকে সুন্দরতর করেছে, এ তারই প্রতীক।

ধরণী ব্যাপারটা বুঝল। চন্দ্রদীপকে নীরব দেখে তাকে উৎসাহিত করার জন্য সহজভাবে বলল: শাস্ত্রকার সৃষ্টির বাস্তব অবস্থার তাৎপর্য নির্ণয় করতে গিয়ে নয়টি স্তরের সন্ধান পেয়েছেন। প্রথম পর্যায়কে বলেছে মহাত্ব। অর্থাৎ, শক্তি ও পরমাণুর মিলনে সৃষ্টির সূচনা। দ্বিতীয় সৃষ্টি ভূত সর্গ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম; এই পঞ্চভূতে সৃষ্টির প্রারম্ভ। প্রকৃতির খেলায় ক্ষিতি অর্থে ধরণী, অপ-জল, তেজ-অগ্নি, মরুৎ-বায়ু, ব্যোম-আকাশ বা কশ্যপ হয়ে দেবতার লীলা শুরু করলেন। সেই অবস্থা নিয়ে অনন্ত নাগের উপর যোগনিদ্রায় মগ্ন নারায়ণ ও ব্রহ্মার গল্পের জন্ম হল।

বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত হল চন্দ্রদীপের। চমকানো বিস্ময়ে ডাকল, ধরণী!

ধরণীর অধরে কৌতুক হাসির ছটা। চন্দ্রদীপকে মৃদুস্বরে ভর্ৎসনা করে বলল: অবাক হওয়ার কিছু নেই। তোমার বোঝা উচিত আমিও একজন বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী।

সপ্তর্ষির কাছে মহাবিস্ময় এখন ধরণী। উৎফুল্ল আনন্দে তার দুই চোখ চক্ চক করতে লাগল। পুত্রের দিকে একবার তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে ধরণী বলল: ঋষির এখন মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে, দেখেছ। মাও যে পুরাণের কিছু খোঁজখবর রাখে বাপের মত, এই প্রত্যয় ছেলেরও হয়েছে। এটাই আমার সুখ। এই তৃপ্তিতেই মন আমার ভরে গেছে।

সপ্তর্ষি অপরাধীর মত মাথা নিচু করল। ধরণী ছেলের সঙ্গে রসিকতা এবং মজা করার জন্যে বলল: তোর বাবার সঙ্গে আমার পার্থক্য একটা স্ট্যাম্পের। অধ্যাপকের সিলমোহরটাই নেই। বুঝলি?

সপ্তর্ষি মায়ের রসিকতায় খুশি না হয়ে বিরক্ত হল। অধৈর্য হয়ে বলল: তুমি বড় বাজে কথা বল। এখন যে কথা হচ্ছে তাই বল।

ধরণীর গভীর শ্বাস পড়ল। বলল: তৃতীয় সৃষ্টির নাম বৈকারিক যুগ। পঞ্চভূতে মিলনে হল নীহারিকা। নীহারিকা সমষ্টি থেকে সৌরজগৎ, গ্রহ, উপগ্রহ সৌরজগতের ভুতসর্গ ও বৈকারিক যুগের পর হল যে বাস্তব জগতের উদ্ভব তা নাম "মুখ্যসর্গ"। এখান থেকেই শুরু হল চতুর্থ সৃষ্টি। এই স্তরে পৃথিবী বাসে উপযুক্ত হল। সমুদ্র, পর্বত আর সমতল ভূমি গড়ে উঠল সমুদ্রের বুকে। থাকা ঠাঁই হল।

চন্দ্রদীপ যুগপৎ বিস্ময় এবং চাঞ্চল্য প্রকাশ করে বলল: অপূর্ব! তুমি এত জেনেও কত না জানার ভান কর। আশ্চর্য মেয়ে বটে।

ধরণী চন্দ্রদীপের কথার উত্তর না দিয়ে আপন মনে বলতে লাগল: পঞ্চম সৃষ্টি হল তির্যক স্রোত। জলে কীট জন্মাল। মধুকৈটভের আবির্ভাবে জলের বুকে জাগল প্রাণের সাড়া। এঁকে বেঁকে জলে মনের সুখে ক্রীড়া করতে থাকল তারা। হাড়, মাংস হয়নি তাদের। এর পর ষষ্ঠ সৃষ্টির কাল: দেবসর্গ। উর্ধ্ব স্রোতার সৃষ্টি হল। অর্থাৎ স্বর্গপানে আকাশের দিকে তার গতি হল বলে তাকে উর্ধ্ব স্রোতা বলা হল। এল পাখির দল। জল ত্যাগের পথ দেখাল তারা। এবার জীব থেকে জীবের সৃষ্টি নয় ডিম থেকে সন্তান সৃষ্টির এক নতুন যুগ তৈরি হল। সপ্তম সৃষ্টি: অর্বাকস্রোতা নামটি বড় অদ্ভুত। শব্দের অর্থ ও তাৎপর্যের মধ্যেই আছে যুগের বৈশিষ্ট্য। অর্বাক মানে, বাক্য নেই, কিন্তু স্রোত আছে, অর্থাৎ কার্য আছে তার। সন্তান হয়, স্তন্য পান করে হাত-পা দিয়ে মাটিতে চলে বেড়ায়, কিন্তু কথা বলে না। এরা কারা?

সপ্তর্ষির দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকাল ধরণী। ভুরু নাচিয়ে ধরণী জিগ্যেস করল সপ্তর্ষিকে— কারা? বাপ বেটা মিলে উত্তর দাও।

সপ্তর্ষির মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুৎতরঙ্গের মত উত্তরটা তৎক্ষণাৎ খেলে গেল সংশয় এবং দ্বিধায় তার কণ্ঠস্বর জড়ানো। তবু বলল: চতুস্পদ প্রাণী। কূর্ম, বরাহ বানর প্রভৃতি।

হ্যাঁ। সোনা আমার। বুঝলে অধ্যাপক পরিবারের মধ্যেই পৌরাণিক মণ্ডল তৈরি হয়েছে। আর ভাবনা নেই। তোমার গবেষণা সফল হবেই।

সপ্তর্ষি অধৈর্য হয়ে বলল: সব জিনিসটা তুমি বড় হাল্কা করে দাও. এর পরে কী হয়েছে তাই বল।

এর পরের যুগে জীব ধীরে ধীরে অন্যের অনুগ্রহ ছাড়াই চলাফেরা শুরু করতে শিখল। এ হল সৃষ্টির ক্রমবিবর্তনের অষ্টম স্তর বা অনুগ্রহের যুগ। কিছু না ধরে সে দুপায়ে খাড়া হয়ে চলতে শিখল। শিম্পাঞ্জি থেকে সে অভ্যাস ছড়াল বনমানুষে

তাই দেখি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা হঠাৎ কোন আক্রমণ নয়। দীর্ঘকাল ধরে কৃষ্ণ এর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

সে যাই হোক, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য কৃষ্ণ দায়ী। স্ত্রীপর্বে, ধর্মপ্রাণ গান্ধারী সরাসরি তাঁকে অভিযুক্ত করেছে। মহাভারতের আখ্যানভাগ অনুসরণ করলে দেখতে পাব দুর্যোধনের জেদে কিংবা গোঁয়ারতুমিতে নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই এই যুদ্ধ হয়েছিল। দুই গোষ্ঠীর বিবাদ যখন তুঙ্গে সংকট নিরসন করতে কৃষ্ণই তখন এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সে ছিল কৃষ্ণের রাজনৈতিক চমক। তার ভেতর সত্য ছিল না। কেন বলছি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সংকট কাটিয়ে ওঠার বিপুল আশা নিয়ে দুর্যোধন কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করতে এল। কারণ এই অবশ্যম্ভাবী মহাযুদ্ধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন একমাত্র কৃষ্ণ। কিন্তু কৃষ্ণ যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলার জন্যই দুর্যোধনকে শত্রুজ্ঞানে অপমান করলেন। তাকে শত্রুর চোখে দেখলেন। এখানে দুই গোষ্ঠীর সেই পুরনো কোন্দল বড় হয়ে উঠল।

কৃষ্ণ আলপীয় গোষ্ঠীর লোক। নর্ডিক গোষ্ঠীর দুর্যোধনেব ভারতীয় রাজাদের বিপুল সমর্থন, নর্ডিকদের প্রতিপত্তি ও সারা ভারত জুড়ে; আর সেখানে তারা (আলপীয় গোষ্ঠীরা) আছে কোণঠাসা হয়ে। সুতরাং সন্ধি করে কোণঠাসা অবস্থার কোন প্রতিকার হবে না। চাই এক সর্বব্যাপী যুদ্ধ। এই যুদ্ধই ভারত রাজ্যে একদিন যাদবদের তথা আলপীয় গোষ্ঠীর প্রতিপত্তি, প্রভাব, সম্মান, গৌরব খ্যাতি বাড়িয়ে তুলবে। অতএব যুদ্ধ চাই। যে কোন মূল্যে সেই যুদ্ধে জেতার সঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণের মনে। তাই দূতের মতো তিনি নিরপেক্ষ নন। মীমাংসা কিংবা আপসের জন্য যে দূতের ভূমিকায় যে সহিষ্ণুতা দরকার কৃষ্ণ তা দেখাননি। বরং যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলার জন্য এবং যুদ্ধের সব দোষ দুর্যোধনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে এক চতুর ছলনা করে কার্যসিদ্ধি করলেন। এই যুদ্ধের জন্য আলপীয় গোষ্ঠীরা যে দায়ী নয় সেটা প্রমাণ করার জন্যে তাদের নেতা হয়ে তিনি নিজে অস্ত্রধারণ করলেন না। নিরপেক্ষ থাকার এই কূট কৌশল কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের আসনে বসাল। শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব অর্জনের এই কৌশল কৃষ্ণের পুরনো। রাজ্যের কর্তৃত্ব গ্রহণ না করে রাজা না হয়েও যে সর্বশক্তিমান হয়ে অঙ্গুলি হেলনে রাজ্য চালানো যায় মথুরায় কৃষ্ণ তার নজির স্থাপন করে সকলের নজর কেড়ে নিয়েছেন। মহাভারতের মহাযুদ্ধের নায়ক কৃষ্ণ তাঁর সেই পুরনো কৌশলের পথ ধরেই এগিয়েছেন। কুরুক্ষেত্রকে ধর্মযুদ্ধের শিরোপা পরিয়ে দিয়ে নিজের ও পাণ্ডবদের সব দোষত্রুটি চাপা দিয়েছেন।

কার্যত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল রাজনৈতিক যুদ্ধ। স্বার্থ, শঠতা কপটতা সুবিধাবাদের নীতি রাজনীতিতে নিন্দনীয় নয়। রাজনীতিতে মিথ্যে কথা বলা অধর্ম নয়। রাজা যুদ্ধ করে রাজশক্তি বৃদ্ধির জন্য, অন্যের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি স্থাপনের জন্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির রাজ্য, সম্পদ, সম্মান ফিরে পাবার জন্যে যে যুদ্ধ করেছিল তার ভেতর কোন মমতা, করুণা, সততা, সত্য ও ধর্ম ছিল না। প্রাচীন ভারতের রাজধর্মের আদর্শ; এই যুদ্ধে নস্যাৎ করেছে কৃষ্ণ। কিন্তু কৌরবদের কেউ যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করেনি,

শঠতা, ছলনা, মিথ্যের কোনো আশ্রয় তারা নেয়নি। সপ্তরথী মিলে অভিমন্যু বধের গল্পটা পাণ্ডবদের মিথ্যাচার শুরু করার একটা নির্লজ্জ প্রচার। জেতা যুদ্ধে অভিমন্যু বেঁচে থাকলে কৌরবদের কোনো ক্ষতি ছিল না। অভিমন্যুর মৃত্যু হয়েছিল যুধিষ্ঠির এবং ভীমের ভুল রণকৌশলে। ভুলই বা বলি কেন, সুপরিকল্পিতভাবে অভিমন্যুকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিল যুধিষ্ঠির। কারণ ঐ অসম যুদ্ধে সে জীবিত ফিরে আসতে পারে না সে কথা অজানা ছিল না তার। তবু জেনেশুনেই তাকে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে ছিল নিজের অনেক ব্যর্থতা, অক্ষমতা, দোষ, অপরাধকে চাপা দেবার জন্য। বালক অভিমন্যুর মৃত্যু নিয়ে তারা রাজনীতি করেছে। যেমন ভীষ্মকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করেছে, কিংবা নিরস্ত্র কর্ণকে, দ্রোণ, দুর্যোধন, দুঃশাসনকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার কোনটা যুদ্ধনীতি সম্মত নয়। অভিমন্যুর মৃত্যু দিয়ে এই অপকর্ম কলঙ্ক ঢাকা দিয়েছে। কৌরবদের ধর্মযুদ্ধের গৌরবকে কলঙ্কিত করেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কোথাও ধর্মযুদ্ধ হয়নি। এই অধর্ম যুদ্ধের নেপথ্যে আছেন শ্রীকৃষ্ণ।

পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে এসেছিল একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। তারা ভরত বংশের কেউ নয়। ভগবানের দেয়া কুন্তীর পুত্র। হস্তিনাপুরের কেউ তাদের খোঁজ পর্যন্ত জানে না। পাণ্ডুর মৃতদেহ সম্বল করে যারা পরিবারকে লোকলজ্জায় ফেলে রাজপরিবারকে তাদের মেনে নিতে বাধ্য করল তাদের কাছে কোনো সত্য ন্যায় ও ধর্মের আদর্শ প্রত্যাশা করা যায়? যে ষড়যন্ত্রকারী এবং স্বার্থান্বেষী দলের সুকৌশল চক্রান্তে পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে জায়গা করে নিল তাদের কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এবং ধার্তরাষ্ট্রেরা সাময়িকভাবে মেনে নিয়েছিলো। তার কিছু কাল যেতেই রক্তের বিশুদ্ধতা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে।

পাণ্ডুপুত্রেরা ভীষণ হিসেবী। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তারা গুনে গুনে পা ফেলেছে। হিসেবী, অঙ্ক কষা যুধিষ্ঠিরের একটা হিসেব শেষ হয়েছে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞে। তার পরের অঙ্কে একটু ভুল হয়ে গেছিল, পাশা খেলায় বিপন্ন অস্তিত্বকে শুধরে নেয়ার জন্যে দ্বিতীয়বার পাশা খেলে বনবাসে চলে গেল। যুধিষ্ঠিরের অঙ্কে আর কোনো ভুল হয়নি। জীবনের ক্ষেত্রে যাঁরা অঙ্ক কষে চলেন তাঁর কাছে সত্য, ন্যায় ও ধর্মের আদর্শ কতখানি খাঁটি এবং আন্তরিক তাতে যথেষ্ট সন্দেহ থাকে। বলতে পারি তার সরলতা, সততা, সহিষ্ণুতা নিছক একটা ভান। মনভোলানো ধর্মবচন শুনে ভীষ্ম, দ্রোণ অনেকেই তাদের বিশ্বাস করে ঠকেছিল।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডবেরা ন্যায় ও ধর্মের পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারল কি ? কৃষ্ণের মুখে শোনা যা সে উত্তর — 'কৌরবেরা ছিলেন মহাযোদ্ধা। তোমরা ধর্মযুদ্ধে কিছুতেই তাঁদের হারাতে পারতে না। আমি তাই তোমাদের মঙ্গলের জন্য ছলে কৌশলে ও মায়াবলে তাঁদের সংহার করেছি।..... দুর্যোধনকে ধর্মযুদ্ধে পরাস্ত করা কৃতান্তেরও অসাধ্য ছিল।' কৃষ্ণের এই স্বীকারোক্তি শুনে মনে হয় মহাভারতের পাঠকদের পরিহাস করছেন। যথা ধর্ম তথা জয় কথা মিথ্যে হয়ে যায়।

সুতরাং পাণ্ডবেরা সত্য ও ন্যায় ধর্মের আদর্শ অনুসরণ করেছে একথা বলা কখনো সঙ্গত হবে না। তবে মহাভারতের পৃষ্ঠায় তাদের সে ভাবেই আঁকা হয়েছে। কারণ মহাভারত তো পাণ্ডবদেরই বিজয়কাব্য। সেখানে দুর্যোধনদের অসৎ, অধর্মকারী, পাপাচারী করে না দেখালে তো পাণ্ডবদের মহিমা, গৌবর দুর্যোধনদের খ্যাতি, প্রতিপত্তি, শ্রেষ্ঠত্বের তলায় চাপা পড়ে যায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ হয়নি। পাণ্ডবেরাই তা হতে দেয়নি। যুদ্ধ ধর্মের নীতি মেনে একমাত্র কৌরবেরাই যুদ্ধ করেছে। তথাপি তাদের কপালে কলঙ্ক তিলক লেপন করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন ন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনকে হারানো যেতো না। এই অধর্মযুদ্ধের নায়ক কৃষ্ণ ও তার অনুগামী যুধিষ্ঠির। একদিন তারা জোর করেই হস্তিনাপুরের ওপর দখল নিতে এসেছিল। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে অধর্মের পথে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলো। এ জন্যেই কৌরবদের অন্যায় অধর্মের প্রতীক মনে ভাবতে কষ্ট হয়। দুর্যোধন যদি অধর্মের প্রতীক হয় তাহলে বীরগতি প্রাপ্ত হওয়ার পর সে স্বর্গে গেল কেন? আর ধর্মাত্মা বলে যারা অনন্তকাল পূজা পেয়ে আসছে তাদের সকলকে নরক দর্শন করতে হলো কেন? এই দুই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ালে সত্যটা চিনে নিতে কষ্ট হবে না।

# যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলা একটি চক্রান্ত

মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের পাশা খেলা একটি চক্রান্ত। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, নিগ্রহ সাজানো ঘটনা। এই পাশা খেলার জন্যে দুর্যোধন শকুনি কেউ দোষী নয়। এসব অপরাধ যুধিষ্ঠিরের একার। যুধিষ্ঠির রাজ্যলোভী, দ্যূতাসক্ত, কুচক্রী। মুখে ধর্মের বুলি, অন্তরে রাজ্যলোভের কু-অভিসন্ধি। ধর্মের নামাবলী গায়ে চাপিয়ে দুষ্টুবুদ্ধি এবং কু-অভিসন্ধির আড়ালে আপন অভিপ্রায় ঢেকে রেখেছিল। তাই তার ছদ্মবেশটা আমরা চিনতে পারিনি। আমাদের চোখে সে সৎ, মহৎ, ধার্মিক, আদর্শবান। কিন্তু পাঁচহাজার বছর পর আমাদের মনে যুধিষ্ঠিরের সততা, কপটতা, মহত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন জাগল। মনে হল, এর মধ্যে কোথায় যেন একটা বড় মিথ্যে লুকনো আছে। চলুন, আমরা সেই মিথ্যের উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। তার আগে, একটু গৌরচন্দ্রিকা করে নেব।

মহাভারত যুদ্ধকাব্য। কোন একটা বিরাট যুদ্ধ হঠাৎ হয় না। দীর্ঘকাল ধরে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে আপনা আপনি গড়ে ওঠে। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ তেমনি তিল তিল করে গড়ে উঠেছে দীর্ঘদিন্ ধরে। কেমন করে একটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সূচনা হল; মিশ্রস্বার্থের প্রতিক্রিয়ায় কিভাবে তা জটিল ও ঘোরালো হয়ে গেল, কত ধরনের মিথ্যাচার ছলনা, প্রতারণা চক্রান্ত রাজ্যের ভিতরে বাইরে অন্তঃপুরে দানা বেঁধে উঠল, তারপর সেই বিরোধকে কেন্দ্র করে কত দিক থেকে কত রাজারাজড়া নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে জোটবদ্ধ হল, দল গড়ল, দল ভাঙানোর চেষ্টা করল, তার এক বাস্তব আলেখ্য মহাভারতের আদিপর্ব থেকেই সূচনা হল। তারপর সভাপর্বে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অন্তর্কলহ প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংঘাতের রূপ নিল।

আদিপর্বে যা ছিল লোকচক্ষুর বাইরে রাজনীতির গোপন সংঘাত, ঠাণ্ডা পারিবারিক লড়াই তা বিরোধ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, প্রেম ও ক্ষমতালিপ্সার উত্তাপে পরিবার আশ্রিত রাজনৈতিক ঘটনার গর্ভদেশে তুষের আগুনের মত যা ধিকি ধিকি জ্বলছিল, তা ছিল প্রকারান্তরে শান্তনু-পুত্র গাঙ্গেয় এবং সত্যবতীনন্দন কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের মধ্যে আর্য-অনার্যের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার রেষারেষি। মাটির ভেতর উদ্ভিদ যেমন নিঃশব্দে শিকড় চালিয়ে দেয় তেমনি ঋষি দ্বৈপায়ন আপন ঔরসজাত শূদ্রাণীর গর্ভজ পুত্র বিদুরকে মধ্যমণি করে সেই গোপন সংঘাতের চারাগাছটি পরিবারের অভ্যন্তরে নিঃশব্দে রোপণ করল। লালন

করল। কিন্তু সেই লড়াইয়ের বীজ বপনের কথা কেউ জানল না। বাইরে অত্যন্ত নিঃশব্দে প্রকাশও পেল না। কেবল কূট কৌশলে ভীষ্ম ও দ্বৈপায়ন একে অপরকে হারিয়ে হস্তিনাপুরের সিংহাসনের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন এবং দখল রাখার এক গোপন সংঘাতে মেতে থাকল ভীষ্ম ও দ্বৈপায়ন। মহাভারতের পাঠকও তা জানতে পারল না।

শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে পাণ্ডুপুত্রদের প্রত্যাবর্তনের পর সেই চাপা বিরোধ (৩য় অনুচ্ছেদে) খুব সাবধানে এবং ধীরে লোকচক্ষুর বাইরে টেনে আনায় যৌথ ভূমিকা নিল বিদুর ও কুন্তী। খুব কৌশলে এবং গোপনে পঞ্চপাণ্ডবের সহায়তায় সংঘাতকে পাকিয়ে তুলল পারিবারের অভ্যন্তরে।

রাজনীতিতে বাইরের সংঘাত সবার চোখে পড়ে। তাই পরিবারের অভ্যন্তরে খোলা জায়গায়, সবার দৃষ্টির সামনে পাণ্ডব কৌরবদের ছেলেমানুষী বিবাদ ঈর্ষায় তাদের মধুর সৌহার্দপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠল। সৌভ্রাত্র ও বন্ধুত্বে চিড় ধরল। পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ তীব্র হল। উভয়ের মধ্যে সংঘাত বাড়ল। অথচ, বাইরে থেকে সেটা ছেলেপিলের খুব সাধারণ মনকষাকষি ভেবেই কেউ আমল দিল না। সন্দেহের চোখেও দেখল না। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কিংবা গাঙ্গেয় খুব একটা তলিয়ে ভাবল না। তাদের ঔদাসীন্যের রন্ধ্রপথ ধরে কৌরব পাণ্ডবের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক একটু একটু করে অবনতি হতে লাগল। তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু হল। বলতে কি, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর অনুরূপ সন্দেহহীন ঔদাসীন্যের রন্ধ্রপথ ধরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শনি প্রবেশ করল হস্তিনাপুরের রাজগৃহে।

চমকে দেবার জন্য, কোন আজব গল্প শোনাতে বসিনি। জানার কোন শেষ নেই। কোন জানাই শেষ নয়। শেষ জানাটা মানুষের এক জীবনে হয় না। জানাটা নদীর স্রোতের মত কেবল ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে চলে সাগরের দিকে। মহাসাগরে গিয়ে পড়ার ঝোঁক তার। আসুন আমরা মহাভারতের মহাসাগরে অবগাহন করি। যাত্রাপথের নতুন নতুন বিস্ময়, চোখ কেড়ে নেওয়া দৃশ্যে ও ঘটনায় ভুলে নয়, চুম্বক আকর্ষণের বাইরে থেকে নিরপেক্ষ যুক্তিশীল মন নিয়ে মহাকাব্যের পাঠ নেব। পা রাখার আগে রাস্তার পরিচয়টা একটু জেনে নেই।

মহাভারতে অনেক হাত পড়েছে। কাহিনীও পালটেছে। ব্যাসদেবের নামের আড়ালে যে যার নিজের মত কাহিনী গড়েপিটে সংযোজন করে নিয়েছে। ফলে, 'ভারতযুদ্ধ' কাব্য হয়েছে মহাভারত। মহাভারতের কলেবর কালে কালে কেবলই বেড়ে গেছে। পণ্ডিতদের হিসাবে আদিতে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা আট থেকে দশ হাজার ছিল। মহাভারতের অনুক্রমণিকায় আছে চব্বিশ হাজার। পরে তা বেড়ে ছ'লক্ষ শ্লোকে দাঁড়াল। আদিপর্বের অনুক্রমণিকায় এ হিসাব থাকলেও প্রকৃত হিসাবে আছে ৮৪,৮৩৬ সংখ্যক শ্লোক। হাত বদলের ফলে যে, এমন ঘটেছে তাতে সন্দেহ থাকে না।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকাহিনী 'ভারতযুদ্ধ' কথা ঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বিরচিত মহাকাব্য। দ্বৈপায়ন প্রথমে ঐ গাথা স্বীয়পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। শুকদেবের কাছ থেকে বৈশম্পায়ন তা শিক্ষা করেন। বৈশম্পায়নের কাছ থেকে তা কণ্ঠস্থ করেন সুতপুত্র সৌতি। উগ্রশ্রবা (মতান্তরে সৌতি) সেই কাহিনীই নৈমিষারণ্যের ঋষিদের শোনান।

উগ্রশ্রবার মুখনিঃসৃত মহাভারত কাহিনী আমরা বর্তমানে গ্রন্থাকারে পাঠ করছি। এইরকম একটা দীর্ঘ পর্যায়ের মধ্যে মহাভারতের কাহিনী পল্লবিত যেমন হয়েছে, তেমনি গ্রহণ বর্জন হয়েছে। মূল কাহিনীর অনেক শাখা কাহিনী, উপকাহিনী যুক্ত হয়েছে। গল্পের আকর্ষণে পাঠক-পাঠিকা মহাভারতেব মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ইতিহাসের বাস্তবতা থেকে কখনও কিংবদন্তিতে, কখনও রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করছে নিজেই টের পায় না। কাহিনীর অনিবার্য আকর্ষণে এবং মোহে, ধর্মের সুড়সুড়িতে তারা এমনই মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে যে মহাভারতের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিস্মৃত হয় ঐতিহাসিকতা। কিন্তু ভোলে না ঐ সব আজগুবি, কিংবদন্তি, রূপকথার গল্প। ওর সুগন্ধে মনটা এমনই ভরপুর থাকে যে যুক্তি বিচার বিশ্লেষণ বোধও হারিয়ে যায়।

এখনই আপনারা সাবধান হয়ে গেলেন। কাজেই, খোলা মন, পরিচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা আর বুদ্ধি নিয়ে মহাভারতের অঙ্গনে প্রবেশ করার আর কোন বাধা রইল না।

মহাভারতের সভাপর্বে পাশাখেলার পেছনে লুকনো রহস্যটা কি দেখা যাক। গোঁড়ামিহীন যুক্তিশীল মন নিয়ে খোলা চোখে আমরা পাশা খেলাটি দেখব। এই সৎ ইচ্ছেটাই হয়ত সযত্নে ঢেকে রাখা সত্যগুলিকে প্রকাশ করবে। অনেক দুর্বোধ্য, যুক্তিহীন মিথ্যে গল্পের বুননের মধ্যে মুড়ে রাখা সেই সময়ের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের এক নতুন রূপ হয়ত তাতে প্রকাশ পাবে। রূপকথার মায়াজাল ছিন্ন করে হয়ত এক নতুন ইতিহাস বেরিয়ে আসবে।

পাশা খেলা একটা চক্রান্ত। সে চক্রান্তটি কেন এবং কি জন্যে এটা জানলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের উদ্দেশ্য প্রকট হবে।

পাশা খেলায় দ্রৌপদীর অপমান, লাঞ্ছনা, নিগ্রহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে আমাদের শত শত বৎসরের সেন্টিমেন্ট। সুতরাং সেই ভাবাবেগ সম্পর্কে বিরূপ কিছু বলার প্রতিক্রিয়া সাংঘাতিক। কেন জানেন? দ্রৌপদীকে কেউ যদি বড় ধরনের অসম্মান করে থাকে সে করেছে পাণ্ডব প্রধান ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। কথাটা শুনলে একটু অবাক হতে হয়, কিন্তু ভীষণ সত্য।

পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ দর্শনের পর ঈর্ষান্বিত দুর্যোধন পাণ্ডবদের অনুকরণে অনুরূপ একটি শিল্প শোভায় সমৃদ্ধ চারু প্রাসাদ 'শান্তি-গৃহ' নির্মাণ করল। অবশ্যই পাণ্ডবদের টেক্কা দিল। ময় নির্মিত মণিময় ইন্দ্রপ্রস্থ অপেক্ষা মনোরম। তবু পাঠকের স্মৃতিতে এর কোন চিহ্ন নেই। যাই হোক, সকলকে চমৎকৃত করতে এবং পাণ্ডবদের অহংকারকে আঘাত করতেই

প্রতিবেশী রাজন্যবর্গ, বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে পাণ্ডবেরাও নিমন্ত্রিত হল।

কিন্তু মহাভারতের চক্রান্তের নাটের গুরু বিদুর যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করতে এসে কুমন্ত্রণা দিয়ে গেল আগেই। কথাপ্রসঙ্গে জানাল, পাশা খেলায় দক্ষ ব্যক্তিদের কে কে নিমন্ত্রিত হয়েছে। পণ রেখে পাশা খেলার একটা মিথ্যে সম্ভাবনার কথাও বলল। কারণ দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠিরের কাছে এর চেয়ে আকর্ষণীয় বার্তা আর কিছু ছিল না। বিদুর স্পষ্ট করে কিছু না বললেও আকারে ইংগিতে বলল। যুধিষ্ঠিরকে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে দুর্যোধনের নবনির্মিত শান্তিগৃহে উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দিল। দুর্যোধনের নিমন্ত্রণের বার্তা নিয়ে এসে বিদুর কয়েকজন দক্ষ পাশা খেলোয়াড়ের নাম করল কেন? এর তাৎপর্য নিঃসন্দেহে ভেবে দেখার। আসলে বিদুর চেয়েছিল যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের সঙ্গে পণ রেখে পাশা খেলুক। কারণ পাশা খেলোয়াড়দের কেউ যুধিষ্ঠিরের সমকক্ষ নয়। তাই তাদের নাম করে যুধিষ্ঠিরকে পরোক্ষে উৎসাহিত করা হয়েছিল। এবং কৌরবদের রাজ্য সিংহাসন পণ রেখে সহজে জিতে নেওয়ার উদ্দেশ্যে দুর্যোধনের মণিময় শান্তিগৃহে তাকে উপস্থিত হতে বলেছিল।

পাণ্ডব পক্ষের কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে সৎ ও ধার্মিক করে দেখানোর উদ্দেশ্যেই নিজের মত করে ঘটনা সাজালেন। প্রকৃত ঘটনা এবং সত্য একটা মিথ্যে কাহিনীর প্রলেপে ঢাকা পড়ল। আর আমরা চোখে ঠুলি, কানে তুলো দিয়ে ঋষির মিথ্যে ভাষণকে যুগ যুগান্তর ধরে বিশ্বাস করে এলাম। ঋষি কখনও মিথ্যে বলে না এই সংস্কার ও বিশ্বাস নিয়ে আমরা উদ্দেশ্য অন্বেষণ থেকে বিরত থাকলাম। একবারও মনে উদয় হল না মহাকবি নিজে আর নিরপেক্ষ নন, তিনিও কৌরব-পাণ্ডবের ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছেন। পাণ্ডবদের একজন গোঁড়া সমর্থক ও প্রচারক। গোপনে পাণ্ডবদের বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে থাকেন। সুতরাং এহেন ঋষি মহাকবির কথাকে বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করে আমি ও আপনি ঠকছি। শত শত বছর ধরে সেই ভ্রান্তির ভার অবনতশিরে বহন করে আসছি।

জানেন, সওয়াল করতে গিয়ে মনে হল, দ্বৈপায়ন হাজার হোক ঋষি তো। একেবারে নীরেট মিথ্যে বলে আমাদের বেকুব করবেন? অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'র মত ঢোক গিলে কৌরবদের হয়ে সত্য কথাটা বলেছেন। কিন্তু পালা পর্বের উত্তেজনার মধ্যে তাঁর প্রতি মনোযোগ থাকে না। পাণ্ডবেরা কেউ ধোয়া তুলসীপাতা নয় একথাটি বলা হল খুব গুছিয়ে এবং কৌশলে। এমনভাবে বলা হল যাতে পাঠক ও শ্রোতার মনে তার আগেই দুর্যোধন সম্পর্কে একটি বিরূপতা সৃষ্টি হয়ে যায়। পাশা খেলার অনুষ্ঠানে খুব ধুমধাম করে সেই বিরূপতা সৃষ্টি হল।

শান্তিগৃহে অবসর বিনোদনের মেজাজ নিয়ে প্রথম পাশা খেলার সূচনা। তাতেই যুধিষ্ঠিরের নেশা ধরে গেল। তারপরেই, পণ রখে দ্যূতক্রীড়ার কথা উঠল। মহাকবি

যেভাবেই বলুন না কেন প্রকৃত সত্যটা কিন্তু তাতে প্রকাশ পেল। শকুনি পাশা খেলতে রাজি হল না। পণ রেখে পাশা খেলার কুফল সম্পর্কে সে যুধিষ্ঠিরকে সজাগ ও সাবধান করে। এর কারণ দুটি। প্রথমত, যুধিষ্ঠিরের মত পাকা খেলোয়াড় কৌরবপক্ষে কেউ ছিল না। শকুনি নিজেও নয়। দ্বিতীয়ত দুর্যোধনের প্রতিনিধি হয়ে পণ রেখে খেলায় তার নিজের আপত্তি ও বিড়ম্বনাটা যুধিষ্ঠিরকে নিরুৎসাহ করে এড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু যুধিষ্ঠির নাছোড়বান্দা। যদিও মহাকবি দেখিয়েছেন আগ্রহটা দুর্যোনের বেশি। কিন্তু পাশা খেলার গোটা ঘটনা পর্যালোচনা করলে যুধিষ্ঠিরের আগ্রহ ও অভিসন্ধি গোপন থাকে না।

সকলেই জানেন, মহাভারতে মহাকবির দু'চক্ষের বিষ দুর্যোধন। কিন্তু আমরা সকলে দেখেছি সে এবং তার ভাইরা পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলেমিশে বন্ধুর মত ভাইয়ের মত থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু ভীমের হাতের মার খেয়ে আর তার দ্বারা ভীষণভাবে লাঞ্ছিত হয়ে তাদের পাণ্ডবভীতি ধরে গেল। শুধু তাই নয়, আচার্য দ্রোণ কৃপ, যুধিষ্ঠিরের তোষামোদিতে এমন অনুরক্ত আর মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে তাঁরাও কৌরবদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হল। কিন্তু কৌরবরা চেয়েছিল ভাল হয়ে থাকতে তবু মানুষের অবিচার, নিষ্ঠুর পক্ষপাতিত্ব, বিদ্বেষ, বিরূপতা তাদের শিশু মানসিকতায় বিপর্যয় ঘটাল। এর জন্যে কৌরবেরা একটুও দায়ী নয়। তবু সব ব্যাপারেই দোষী, অপরাধী তারাই। পাশা পর্বেও সেই ধারার ব্যতিক্রম হয়নি।

শকুনির সতর্ক করা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির দ্যূতাসক্ত ব্যক্তির মতই দ্যূতক্রীড়ায় রাজি হন। বিদুরের প্ররোচনা ও পরামর্শই তার মনের অতলে দ্যূতক্রীড়ার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। বিনা রক্তপাতে রাজ্য, ঐশ্বর্য, সম্পদ পাওয়ার লোভে ভেতরে ভেতরে সে অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাই তো পরবর্তীকালে যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠে এই দ্যূতক্রীড়ার ঘটনা নিয়ে বারংবার অনুশোচনা শুনেছি। অনুতাপে নিজেকে ছিন্নভিন্ন করেছে। পাণ্ডবদের বনবাসের জন্য, রাজ্য হারানোর জন্য নিজের লোভকেই দায়ী করেছে যুধিষ্ঠির। অনুগত ভ্রাতাদের এবং পাঞ্চালীর দুঃখ দুর্ভোগের জন্য নিজের ভুলকে সে ক্ষমা করতে পারেনি। এইসব ঘটনাই প্রমাণ করে পণ রেখে পাশা খেলা দুর্যোধনের ইচ্ছেয় হয়নি। যুধিষ্ঠিরও মনে প্রাণে চেয়েছিল বলে পাশা খেলা হয়েছিল। কিন্তু দুর্যোধনের সাফল্য মহাকবি চায়নি বলে অপবাদের ভাগী করেছে তাকে।

খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়ে দুর্যোধন তার জয়-পরাজয়কে মাতুলের হাতে সমর্পণ করেছিল। তার খেলুড়ে মনোভাবটা মহাকবির সহ্য হয়নি বলেই দুরভিসন্ধিপরায়ণ বলেছেন তাকে। কিন্তু পাশা খেলা হয়েছিল সেয়ানে সেয়ানে। তবু দু'জনের খেলার কৌশলগত পার্থক্য ছিল। যুধিষ্ঠির খেলছিল নিজের দায়িত্বে। তার অহংকার দক্ষতার গর্বের পরীক্ষা দিতে এবং মনের ভেতর একটা লুকনো লোভ আর স্বপ্ন নিয়ে। আর শকুনি খেলছিল দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে। প্রতিমুহূর্তে তাই সে সতর্ক, একাগ্র হয়ে খেলেছে।

দায়িত্ব সচেতনতা বিচক্ষণতা এবং একাগ্রতা শকুনির সাফল্যের চাবিকাঠি। এই অভাবিত সাফল্য এবং বিজয় পাণ্ডবপক্ষকে শুধু হতবাক করল না, কৌরবদের গৌরবের গায়ে মিথ্যে অপবাদ দুর্নাম এবং কলংক লেপন করতে যুধিষ্ঠির কূটনীতি অবলম্বন করল। একে একে ভাইদের এবং স্ত্রীকেও পণ রাখল। এর কোনো আবশ্যকতা ছিল না। তবু এরকম একটা অভিনব পণ রাখার নজির সৃষ্টি করে সে কৌরবদের লোকচক্ষে হেয় করল। তা হলে ভাবুন, কত যুগ যুগান্ত ধরে আমরা শকুনির সততা দক্ষতা, বিচক্ষণতা একাগ্রতার অবমূল্যায়ন করেছি। এই অপবাদ থেকে মহাভারতকে মুক্ত করার দায়িত্ব আজ প্রত্যেক শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাকেই নিতে হবে।

আচ্ছা, আপনারাই বলুন একবার কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু লোক মিথ্যে কথা বলল, নিজের গৌরব প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সত্যকে বিকৃত করল বলে চিরকাল তাকে মেনে চলতে হবে এটা কোন কাজের কথা নয়। দুর্যোধন সম্পর্কে ঝুরি ঝুরি মিথ্যে বলেও আদি কবি দুর্যোধনের স্বর্গবাসের পথে যেমন কাঁটা দিতে পারলেন না, তেমনি যুধিষ্ঠিরের সব দোষকে আদর্শ বলে চালিয়ে তার ত্রুটি স্খলনের দায়ে ধর্মের লেবেল এঁটে দিয়েও স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করতে পারলেন না। পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরও নরকদর্শন করল, আর দুর্যোধন দিব্যি স্বর্গের সুখ আনন্দ ভোগ করতে লাগল। দুর্যোধনের সততা ধর্মপরায়ণতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ কি আছে?

আপনারাও বুঝতে পারলেন, পাশা খেলায় পরাজয় হয়েছিল দম্ভের আর লোভের। জয় হয়েছিল বিশ্বাসের, নিষ্ঠার, একাগ্রতার।

বুঝতে পারছি, বহুকালের বিশ্বাসটা ভাঙতে ইচ্ছে করছে না। আরো কিছু অকাট্য যুক্তি তাহলে আপনাদের স্মরণ করে দিই। যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়াসক্ত ব্যক্তির মত যত হারে তত তার জেদ চড়ে যায়। হারতে হারতে ঐশ্বর্য, সম্পদ, গোধন, রাজ্য সব হারাল। তবু যুধিষ্ঠিরের দম্ভ গেল না। নেশা কাটল না। চৈতন্যোদয় হল না। হেরেও সে স্বপ্ন দেখছিল, আশা করছিল একবার জয়ী হলেই দুর্যোধনের রাজ্য সিংহাসনের অধিকারী হবে সে। এই লোভে পণ রাখল পঞ্চভ্রাতার দাসত্ব। আবার পরাজয়। রমণীর নেশার মত আশার নেশাও কাটে না। এবার সে পণ রাখল পরিণীতা স্ত্রী পাঞ্চালীকে। একদিন সে ছিল পাণ্ডবদের বিজয়লক্ষ্মী। পাণ্ডবের সব সৌভাগ্যের মূল। সুতরাং তাকে পণ রেখে যুধিষ্ঠির ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখল। একবারও, ভাবল না, এতে পাঞ্চালীর অপমান হয়। পাঞ্চালীর অপমানের চেয়ে রাজ্য সিংহাসনের লোভ অনেক বড়। তাই শুরুতেই বলেছিলাম, দ্রৌপদীকে প্রকৃতই যদি অপমান করে থাকে কেউ, সে যুধিষ্ঠির করেছিল। অথচ কী আশ্চর্য, যুধিষ্ঠিরের এত বড় বিবেকহীন নিষ্ঠুর আচরণকে নির্দোষ বলা হল। এই মিথ্যেচার থেকে পরিচ্ছন্ন এবং সুস্থ সংস্কৃতিসম্পন্ন চিন্তায় প্রত্যাবর্তনের জন্য মহাভারতের পুনর্বিচার হওয়া আবশ্যক।

মহাকবি কোন স্বার্থে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মত বিকৃতরুচির আলেখ্য রচনা করলেন? এই প্রশ্নের সমাধান না হলে পাশা খেলার নেপথ্যের রহস্য অনেকখানি ঢাকা থাকবে। আসুন, আমরা এই রহস্যের ভারী পর্দাটা উত্তোলন করি। কল্পনা করি, পণে পরাজিতা পাঞ্চালীর পরাজয়ের দৃশ্য।

দ্যূতক্রীড়াসক্ত যুধিষ্ঠির সকলকে হতবাক করে দিয়ে পাঞ্চালীকে পণ রাখল। যদিও যুধিষ্ঠিরের এই নির্লজ্জ আচরণ ঢাকতে মহাকবি শকুনি কর্ণ দুঃশাসনের প্ররোচনা দায়ী করলেন। কিন্তু তাতে যুধিষ্ঠিরের অপরাধের বোঝা হাল্কা হল না, ধর্মপুত্রের ধর্মপরায়ণত্ব প্রকাশ পেল না। বরং তাতে করে যুধিষ্ঠিরের নির্লজ্জ বিবেকহীনতা এবং ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা প্রকট হল। মহাকাব্যের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে আমরা সহজেই অন্য এক ছবি দেখতে পাব। এখন সেই দৃশ্যটি দেখা যাক।

দুর্যোধনের নামে মহাকবি অনেক কুৎসা রচনা করেছেন। কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা ঘটনাও থেকে গেছে যা দুর্যোধনের চরিত্রকে উজ্জ্বল করেছে। দ্যূতসভায় গৃহবধূর সম্মান নষ্ট হোক দুর্যোধন মনেপ্রাণে চায়নি। শত সহস্র কৌতূহলী দর্শকদের লোলুপ দৃষ্টির সামনে পাঞ্চালীকে সসম্মানে হাজির করার জন্য পাণ্ডবদের পরম হিতৈষী পিতৃব্য বিদুরকেই সে অনুরোধ করল। কিন্তু বিদুর বুঝলে, দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের ফাঁদে পা দিচ্ছে না। দুর্যোধনের আদেশ মানলে কৌরবদের হেয় করা যাবে না। তাই পাঞ্চালীকে রাজসভায় আনতে রাজি হল না। তখন প্রধানমন্ত্রী কণিকের মত একজন মর্যাদাশালী রাজকর্মচারীকে পাঠানো হল। কিন্তু পাঞ্চালী তার আবেদন-নিবেদন প্রত্যাখ্যান করল। অগত্যা, গৃহবধূকে সসম্মানে দ্যূতসভায় হাজির করার জন্য পরিবারের একজন হিসেবেই অনুজ ভ্রাতা দুঃশাসনকে পাঠাল। দুর্যোধনের এই ভুলের জন্যে অনেক মূল্য দিতে হল।

বলা বাহুল্য, দুঃশাসন আর ভীমের স্বভাব, আচরণ, বাক্য, প্রকৃতির কোন পার্থক্য ছিল না। তবু দুঃশাসন মহাকবির সব সহানুভূতি বঞ্চিত। দুঃশাসনের ওপর দ্রৌপদীর হেনস্তার সব কলংক চাপান হল। কারণ, এটা ছিল একটা পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত। নইলে, পঞ্চভাই-এর স্ত্রীকে যুধিষ্ঠির একার ইচ্ছেয় কেমন করে পণ রাখল? এথেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, যুধিষ্ঠির জয়ের সঙ্গে পরাজয়ের কথাটাও চিন্তা করেছিল। এবং ভীম ছাড়া অন্য ভাইদের সম্মতি নিয়েছিল। কারণ ভাইদের মধ্যে একমাত্র ভীমই যুধিষ্ঠিরের কাজকে জ্বালাময়ী ভাষায় ভর্ৎসনা এবং নিন্দা করেছিল। সে যাই হোক, অন্যদের সমর্থন ছাড়া নিজের সিদ্ধান্তে কখনও পঞ্চভ্রাতার পত্নী পাঞ্চালীকে পণ রাখেনি। এবং অন্যদের ওপর তার সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দেয়নি। একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। যুধিষ্ঠিরের দেবকী নামে আরো এক স্ত্রী ছিল। ইচ্ছে করলে তাকেই পণ রাখতে পারত। কিন্তু তা করল না বলেই এত সন্দেহ।

যুধিষ্ঠির পাঞ্চালীকে দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল। কুলবধূর মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে কৌরবরা যদি খেলায় অংশগ্রহণ না করে তা হলে খেলার জয়-পরাজয়

থাকবে অমীমাংসিত। এবং পাণ্ডবেরা পরাজয় থেকে একটা বিরাট জয় আদায় করে নেবে। ভরাডুবি থেকে বাঁচতে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করল। দ্বিতীয়ত, যুধিষ্ঠির জিতলে সব ফিরে পাবে। হারলে, জয়ের উন্মাদনায় কৌরবরা পাঞ্চালীকে দাসীরূপে লাঞ্ছনা করবে এবং তাতে এক নতুন নাটক হলেও হতে পারে। এটা নিছক অনুমান নয়, যুধিষ্ঠির ভাল করে জানে বিজেতা বিজিতের সম্পর্ক শ্রদ্ধা, ভালবাসার নয়, ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণা শত্রুতার। শত্রুকে নিপীড়ন করা, লাঞ্ছনা করা বিজয়ীর ধর্ম। পাঞ্চালী তখন আর গৃহবধূ কিংবা নারী বলে সম্মানিত হবে না। শত্রুপক্ষের বন্দিনী রমণীর মত ব্যবহার পাবেন। তার সঙ্গে শত্রুর মত আচরণ করা কৌরবদের কোন অধর্ম নয়। এখন দেখা যাক, দুঃশাসন সত্যিই কোন অশালীন আচরণ করেছিল কি না?

দুঃশাসন সত্যি যদি অশালীন কিছু করত তা হলে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের পক্ষে নীরব দর্শক হয়ে থাকা কি সম্ভব হত? ধর্মজ্ঞ পিতামহ ভীষ্ম, কিংবা ধর্মপ্রাণ পিতৃব্য বিদুর কেউই দুঃশাসনের কাজকে অধর্ম বলতে পারল না কেন? এমন কি ধর্ম নিয়ে পাঞ্চালীর আকুল জিজ্ঞাসার কোন উত্তর তাঁরা দিলেন না। সকলেই নীরব। কেন? সে কি ভয়ে? কার ভয়? ভীষ্ম বলেছে, দুঃশাসন যা করছে তা কতটা ন্যায় আর কতটা অন্যায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেই জিগ্যেস কর। একথা বলল কেন? কারণ পাঞ্চালী তখন কুলবধূ নয়, শত্রুপক্ষের রমণী।

সভায় হাজির হওয়ার আগেই দুঃশাসন পাঞ্চালী কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিল। সুতরাং মনের রাগ মেটাতে সে যদি বাড়াবাড়ি কিছু করে থাকে তাহলে তাকে দোষী বলা কতখানি যাবে তাও বিচার করতে হবে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে অনেক কথাই এসে পড়ে। অমন যে আদর্শবান, বীর্যবান রামচন্দ্র তিনিও স্বামী শোকাতুরা অসহায়া তাড়কাকে লাঞ্ছিত করতে হত্যা করতে, কুণ্ঠিত হননি। নারী হত্যা করতে তার বিবেক কিংবা পৌরুষ কোনটাই লজ্জা অনুভব করেনি। শত্রু, নারী হলেও বধযোগ্য। তাকে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত করা কোন অশাস্ত্রীয় কাজ নয়। একই কারণে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাক কেটে কোন অন্যায় কিংবা অধর্ম করেনি। সেজন্যে কোন অনুতাপ, অনুশোচনাও নেই তার। বরং মুনিঋষিরা বাহবা দিয়েছে তাদের। নারী নিগ্রহের অপরাধ ঢাকতে তাদের হয়ে অনেক সাফাই গেয়েছে। কিন্তু দুঃশাসনের বেলায় এসব কিছু করা হল না। রামচন্দ্রের তাড়কা বধ, লক্ষ্মণের শূর্পনখার লাঞ্ছনা যদি অপরাধ না হয়, নারী নিগ্রহ এবং অপমানের নজির না হয়, তাহলে দুঃশাসনের দ্রৌপদী লাঞ্ছনা নিন্দের হবে কেন? সকলের অপরাধ সমান, তবু মহাকবির নিরপেক্ষ বিচার থেকে বঞ্চিত হল দুঃশাসন। মহাভারত যদি কৌরবদের বিজয় কাব্য হত তা হলে হয়তো উল্টোটা হত।

এরকম উদাহরণ আরো আছে কৃষ্ণের শত্রুবর জরাসন্ধকে ভীম ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করে, যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করে, নির্দয়ভাবে নিপীড়ন করে হত্যা করা প্রধান কিংবা দুর্যোধনকে প্রতারণা করার জন্যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তার মা বারনাবতে এক নির্দোষ, নিরপরাধ অনার্যরমণী এবং তার পঞ্চপুত্রকে আহারের প্রলোভন দেখিয়ে জতুগৃহে বন্দী করে জীবন্ত

দগ্ধ করার মত অমানবিক কার্য যদি কোন অন্যায় না হয়, তাহলে দুঃশাসনের আচরণ নিন্দিত হবে কেন? অন্তত নিরপরাধিনী অনার্যরমণী-সহ পঞ্চপুত্র হত্যার মত নিষ্ঠুর হৃদয়বিদারক ঘটনা তো দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা নয়। কৌরবরা পাণ্ডবদের কাছ থেকেই খল আচরণ শিখল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবেরা যুদ্ধক্লান্ত ভীষ্মকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করে যে অন্যায় অধর্ম যুদ্ধের সূচনা করল, উত্তরোত্তর তার মাত্রা বেড়ে গেল, শেষ হল দুর্যোধনের অমানবিক হত্যাকাণ্ড দিয়ে। অধর্ম দিয়ে একদিন যার শুরু হয়েছিল তার শেষ হল অধর্মের যুদ্ধে। তবু ঋষিদের প্রচার কৌশলে কৌরবেরা অপরাধী।

এই প্রচারের পেছনে কোন সত্য লুকিয়ে আছে সেটা সরেজমিনে দেখার জন্যে আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসূয় যজ্ঞে হাজির হতে হবে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ খুব সুস্থভাবে আর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি। শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘদান সকলে নির্বিচারে মেনে নেয়নি। তাই একটা গোলমালে লণ্ডভণ্ড না হলেও অর্ঘ্য গ্রহণের পর্বটা যেভাবে সমাপ্ত হল তাতে শ্রীকৃষ্ণের গৌরব বাড়েনি। আর এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দুর্যোধনকে দিয়ে পরখ করা হল। কৌরবরা ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের দ্বারা নানাভাবে হেনস্তা ও অপদস্থ হল। সম্মানিত রাজ অতিথিকে আমন্ত্রণ করে এনে অপমান করার এক নয়া নজির পাণ্ডবেরা সৃষ্টি করল। তার কারণ, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসূয় যজ্ঞে বিপর্যয়ের ফলে যে রাজনৈতিক পালাবদলের সম্ভাবনা ছিল তার গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করতে দুর্যোধনকে অপমান করা হল। যুধিষ্ঠির জানে, দুর্যোধন তার অপমানের বদলা নেবে।

সেজন্যে দুর্যোধন কতখানি দায়ী সে হিসাবটুকু সেরে নেওয়া যাক। শ্রীকৃষ্ণ-বিরোধী রাজন্যবর্গ দুর্যোধনের নেতৃত্বে সংগঠিত হচ্ছিল। চতুর বিদুর দুর্যোধনের বিরুদ্ধে তার দলের অনুগত বান্ধবদের মনকে বিষিয়ে দেবার জন্যে এবং তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা নষ্ট করার এক চতুর চক্রান্তে লিপ্ত থাকল। দুর্যোধনের সঙ্গে তার অতি বিশ্বস্ত অনুচর ও পরামর্শদাতা শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসন প্রমুখের নামে দ্যূতখেলা সূচনা হওয়ার আগে থেকেই এক মিথ্যে কুৎসা রটনা করা শুরু হয়ে গেল। দুযোধনকে লোকচক্ষে হেয় করা এবং তাকে নির্বান্ধব করা ছিল বিদুরের লক্ষ্য। সেজন্যে ধর্মের নামাবলীতে গা ঢেকে দুর্যোধনের বিরুদ্ধে জোর অপপ্রচার করেছে। কিন্তু বিদুরের তাতে আপাত প্রাপ্তি কিছু হলেও পরম লাভ হয়নি। মহাকবির সম্মানও তাতে বাড়েনি। প্রকৃত সত্যটা চাপা পড়ে রইল পাঁচ হাজার বছর ধরে।

পাশা খেলার আসরে প্রকৃতপক্ষে কি ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তার একটা সম্ভাব্য আলেখ্য আমরা বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারি। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে কখনই মনে হবে না, এক ঘর অগণিত দর্শকের সামনে একজন মহিলার সম্মানহানি হওয়ার মত কোন কাজ অতি বড় পাষণ্ডও করতে সাহস পায় না। সেখানে একজন রমণীকে দুঃশাসন সম্মানিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সুমুখে বিবস্ত্রা করতে মরিয়া হয়ে লড়াই করছে আর সকলে তা নীরবে অনুমোদন করছে বা উপভোগ করছে এমন ঘটনা কখনও হয় না। এ

হল মহাকবির কষ্টকল্পনা। বলা যেতে পারে বিকৃত কামনা চরিতার্থ করতেই এবং পাঠক ও শ্রোতার সহানুভূতি কেড়ে নিতে এইরকম একটা আজগুবি বর্বরতা আমদানি করেছেন। পরবর্তীকালের কোন কবি ভাগবতের অনুকরণে গোপীনীদের বস্ত্রহরণের দৃশ্যটি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও বস্ত্র যোগানোর কাহিনীতে রূপান্তরিত করে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক মহিমা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সুন্দর সংযোজনে শ্রীকৃষ্ণের গৌরব বাড়ল কিন্তু কৌরবেরা কলঙ্কিত হল। যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলা এবং হারা এই দুটি ঘটনা না হলে কৌরবদের লোকচক্ষে হেয় করা যেত না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে আরো বিলম্ব হত।

দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা যে একটা মিথ্যে গল্প এবার সেই কথায় আসি। ঘটনা যাই ঘটুক অসম্মানজনক কিছু হয়নি তা ভীষ্মের কথায় আগেই জানা হয়ে গেছে। সত্যি যদি কিছু হত, তাহলে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার মতই এখানে একটা খণ্ডযুদ্ধ বেধে যেত। কিন্তু বাধল না বলেই প্রশ্ন। পাঞ্চালীর আচরণে নারীর লজ্জা, নম্রতা, কোমলতা কোথায়? সংকোচ, কুণ্ঠারও কোন বালাই নেই। দ্যূতসভায় প্রবেশের সময় থেকেই তার রণং দেহি মূর্তি। নিজের অসহায় অবস্থা বোঝাতে সুদক্ষা অভিনেত্রীর মত কখনও ঝর ঝর করে কাঁদল। কখনও মন গলানোর জন্যে দুঃশাসনের উগ্রস্বভাবের সঙ্গে উদ্ভূত অবস্থাকে যুক্ত করে, কৌরব-পাণ্ডবের অমানবিক শত্রু-সম্পর্ক নিয়ে বিশ্বাসযোগ্য এক গল্প তৈরি করল। গল্প বলার কারণ, পাঞ্চালীকে দ্যূতসভায় আনার সময় দুঃশাসনও পাঞ্চালীর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল তার কোন সাক্ষী ছিল না। অতএব দুঃশাসনের মত বদমেজাজী মানুষের নামে বর্বরতার অপবাদ দিয়ে সহজেই সভাস্থ ব্যক্তিবর্গের মনকে দুঃশাসনের প্রতি বিরূপ করে তোলার একটা সুন্দর সুযোগ সৃষ্টি হল। কিন্তু সেই নিদারুণ লজ্জাকর লাঞ্ছনার ঘটনা সর্বজনসমক্ষে বিবৃত করতে নারীর স্বভাবগত লজ্জা, সংকোচ পাঞ্চালীর ছিল কি? আপনারাও ভাবুন।

নিজেকে নির্দোষ নিরপরাধ প্রমাণ করতে গিয়ে দুঃশাসন হয়ত কিছুটা অসহিষ্ণু এবং উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। দু'জনের বিবাদের পরিণামে এক নাটক সৃষ্টি হওয়াও খুব বিচিত্র নয়। ঘটনার আকস্মিকতায় উদ্ভূত ঘটনাকে পাঞ্চালী চতুরা রমণীর মত নিজের অনুকূলে আনার জন্যে সকলের পৌরুষ, বিবেক এবং বিবেচনাবোধকে অভিযুক্ত করে, তাঁদের নীরবতা ভঙ্গ করার জন্য তাঁদের পৌরুষকে এবং ধর্মবুদ্ধিকে কটাক্ষ করল। এবং সভামধ্যে এক লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিল। এক সংকটময় অবস্থার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নির্ভীক এবং তেজস্বিনী সে। তার চোখ মুখ লজ্জা সরমের পরিবর্তে গনগনে প্রতিহিংসায় জ্বলজ্বল করছিল। শুধু দুর্যোধনকে অপদস্থ করা তার সুনাম নষ্ট করা কৌরববংশকে হেয় করা, সকল সহানুভূতি থেকে তাকে বঞ্চিত করা এবং দুঃশাসন, দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি যে শঠ প্রতারক এই ধারণাটা সকলের অন্তরে ভাল করে গেঁথে দেবার জন্যে যা যা করার দরকার পাঞ্চালী তার সব করল। পৃথিবীর কোন নারী বোধ হয় এত নির্লজ্জভাবে গুরুজন সম্মুখে, অগণিত পরিচিত অপরিচিত পুরুষের সামনে অসংকোচে, অকম্পিত গলায় বলল, 'আমি

রজঃস্বলা।' তার এই তাৎপর্যহীন উক্তিতে সভাস্থ ব্যক্তিরা হতবাক হয়ে গেল। কেন? তাদের চোখে দেখা ঘটনার সঙ্গে দ্রৌপদীর অভিযোগ, অস্বাভাবিক আচরণ হয়ত মেলাতে পারছিল না। তাই বোধ হয়, দ্রৌপদী সৃষ্ট নাটকে একক অভিনয়ের মজা ও কৌতুক অনুভব করছিল। পঞ্চপাণ্ডব-সহ বিদুরেরও লজ্জায় মাথা হেঁট হল। গোটা পরিস্থিতিটা সামাল দিল ধৃতরাষ্ট্র। দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবদের রাজ্য ঐশ্বর্য সব ফিরিয়ে দিয়ে শেষরক্ষা করল। দ্রৌপদীর সম্মান বাঁচল। অভিনেত্রীর দক্ষ অভিনয় সফল হল। ধৃতরাষ্ট্রের এই বদান্যতা এবং মহানুভবতা মহাকবির সহ্য হল না। পাঠক এবং শ্রোতাদের তিনি বললেন, সতীসাধ্বী দ্রৌপদীর অভিশাপের ভয়ে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিল। অদ্ভুত যুক্তি বটে!

কিন্তু মহাকবি তার কৈফিয়ত এবং গল্পটাকে পরক্ষণেই অর্থহীন করে তুললেন। শান্তিগৃহে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ-বিরোধিতার বিরাটত্ব আঁচ করতে পারল। রাজ্যে ফিরে গিয়ে তার কোন লাভ হবে না। বরং রাজ্যের বাইরে থেকে এই সংকট, অসম্মান থেকে বেঁচে ওঠা এবং সমাধান খোঁজার পথ করে নিতে পারবে। সেজন্য আত্মগোপন করা জরুরি ছিল। শুধু এই জন্যেই যুধিষ্ঠির শকুনির সঙ্গে দ্বিতীয়বার পাশা খেলতে বসল। এবারে শর্ত আরো বিচিত্র। যে পক্ষ হারবে তাকে রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হতে হবে। যুধিষ্ঠিরের পুনর্বার খেলতে বসার ভেতর দিয়ে আর একটা বড় সত্য প্রকাশ পেল। প্রশ্ন জাগল, শকুনি সত্যিই যদি কপট পাশা খেলে যুধিষ্ঠিরকে হারিয়ে থাকে, তবে জেনেশুনে যুধিষ্ঠির তার সঙ্গে পুনর্বার কপট পাশা খেলায় বসল কেন? সে তো জুড়ি পরিবর্তন করতে পারত। কৌরবপক্ষের অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম প্রস্তাব করতে পারত। কিন্তু করল না। তার মানে শকুনি শঠতা কপটতা কিছুই করেনি, তার সাথে। এ হল মহাকবির মিথ্যে প্রচার, নিন্দে এবং কুৎসা রটনা। অথবা, পাণ্ডবেরা নিরাপত্তার জন্যে, আত্মগোপনের জন্য অবশ্যম্ভাবী পরাজয় চেয়েছিল। পাণ্ডবদের সেই ইচ্ছা ও মতলবের সব দায়দায়িত্ব শকুনির শঠতা, দুর্যোধনের ঈর্ষাপরায়ণতা ও পাণ্ডব বিদ্বেষী মনোভাবের ওপর চাপিয়ে দিয়ে লোকচক্ষে তাকে হেয় করা, দেশশুদ্ধ মানুষকে তার প্রতি বিরূপ করা এবং তার বিপুল জনপ্রিয়তা এবং প্রজানুরঞ্জন মনোভাবের ওপর আঘাত হানার এক চক্রান্ত হিসাবে পাশা খেলা পর্বকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বীজরূপে দেখানো হল। পাশা খেলা না হলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হত না; মোটা কালির দাগ লাগত না কৌরবদের চরিত্রে। পাণ্ডবদের অধর্ম দুষ্কর্মের কোন কৈফিয়ত থাকত না। পাশা খেলা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটা নেপথ্য চক্রান্ত।

# নবভারতের নবপুরাণ

উগ্র ধর্মান্ধতার পাগলামিতে দেশের মানুষ নিরাপত্তাবোধেব অভাবজনিত দুশ্চিন্তায় এবং উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। এরকম একটা স্পর্শকাতার সমস্যার কথা লিখতে বসে কেবলই মনে হচ্ছে, কয়েক শতাব্দীর গর্ভে এর শিকড় প্রোথিত। এর সমালোচনা কিংবা ভালো-মন্দ বিচার করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তবু একজন সাহিত্যিকই পারে মরমী মন দিয়ে তার স্বরূপ আবিষ্কার করতে। এই নিষ্ঠুর প্রেমহীন পৃথিবীতে কারো বুকে যদি একটু কারো প্রতি একটু প্রেম, মমতা, দরদ থাকে তো তা আছে সাহিত্যিকদের হৃদয়ে যা এক মহৎবোধে পাঠকের চিত্তকে ভরপুর করে দেয়। তাই তো সাহিত্যিকের কাছ থেকে মানুষ প্রত্যাশা করে বেশি।

ধর্ম ও জাতীয়তার মতো দীর্ঘমেয়াদী পুরনো বিরোধ মেটাতে সাহিত্যিকেরা হিন্দু-মুসলমানের সম্ভাবের বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। দেশবিভাগের পরেই উপন্যাসে, নাটকে, কবিতায় সমস্যার মূলে পৌঁছে লেখকেরা হিন্দু-মুসলমানের ভেতরের আত্মাকে খুঁজেছিলেন, উভয়ের সম্প্রীতিসাধনের এক মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির স্বার্থপরতার বেদিতে বলি হয়ে গেছে সে উদ্যোগ। ফলে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে একটা আড়াল তৈরি হলো। স্বাধীনতার পরের প্রজন্মের কাছে হিন্দু ও মুসলমান একে অন্যের কাছে অপরিচিত থেকে গেল। স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশতাব্দীতে পৌঁছে দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমান আরো-মুসলমান হবার সাধনায় মেতেছে এবং হিন্দু আরো হিন্দু হয়ে উঠতে চাইছে। মানুষ যাতে মানুষের পরিচয় মুছে সম্প্রদায় হয়ে ওঠে তারই মহড়া চলছে যেন। ধর্মই হয়েছে জাতীয়তার ভিত্তি। ধর্ম আলাদা বলেই হিন্দু ও মুসলমান আলাদা জাতি। ভারতের জাতীয়তাবোধ মুলত এই দুই ধর্মের ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

ধর্মীয় বিবাদ বিরোধ যা কিছু তা এই দুই ধর্মের মানুষের ভেতর। বিভেদ-বিদ্বেষের বিষবৃক্ষটি ভারতের মাটিতে বপন করেছে বৃটিশ। ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিঘ্নকারী শক্তি হিসেবে হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রভাব যেভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাতে ইংরেজরা শঙ্কিত হয়ে ভাবতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছিল :

মুসলিম, নন-মুসলিম, খৃস্টান। এর সঙ্গে গোদের উপর বিষফোড়ার মতো যুক্ত হয়েছিল মাইনরিটির প্রশ্ন। ইংরেজ বিপন্ন অস্তিত্ব রক্ষা করতে মুসলমানদের অস্ত্র করে হিন্দুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করল। তাকে শিখণ্ডীর মতো দাঁড় করিয়ে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করল। আবার নন-মুসলিমদের স্বাদেশি আন্দোলন ব্যর্থ করে দেবার উদ্দেশ্যেই অ-মুসলমানদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করতে জাতপাতের ভিত্তিতে অনগ্রসর সংখ্যালঘু শ্রেণীকে মাইনরিটি নামে চিহ্নিত করে হিন্দুতে হিন্দুতে এবং নন-মুসলিমদের মধ্যে এক বিবাদ বাধিয়ে দিল। এই নতুন ভেদনীতির ফলে, কে কোন্ বর্ণের মানুষ, কোন ভাষার লোক, কোন সম্প্রদায়ের, তার জাত কী এসব চেনাল। ভারতীয়ত্ববোধের ভেতর এক অস্থিরতার সৃষ্টি হলো। বিবাদ-বিভেদের অন্তর্বিরোধে জাতীয়বোধটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য মহাভারতেরই যেন পুনরাবৃত্তি হলো। তুলনামূলক সেই ছকটি তো আর দু-চার কথায় এই নিবন্ধে বলা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গক্রমে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরব।

বিষবৃক্ষের যে বীজটি ইংরেজ এদেশের মাটিতে বপন করে, স্বাধীন দেশের সরকার এবং জনদরদী রাজনৈতিক দলগুলি তাকে উৎপাটিত না করে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তার মূলে জলসেচন করে আসছে। নবভারতে ভোটযুদ্ধে জেতার মন্ত্র — বিভেদনীতি অনুসরণ করে; কে কত ফয়দা তুলতে পারে তার অবাধ প্রতিযোগিতার জন্য এই অগ্নিগর্ভ অবস্থার উদ্ভব। ভণ্ড দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতারা এবং রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের স্বার্থের নাম করে দেশ ও দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ফলে, ইংরেজের লাগানো বিষবৃক্ষটি এখন মহীরুহ হয়েছে। পাছে রাজনৈতিক দলগুলির ভণ্ডামি এবং আত্মছলনা ধরা পড়ে তাই মূল সমস্যাকে এড়িয়ে বাইরের মিলটাকে প্রচার করে। এর দ্বারা কেউ অনুপ্রাণিত হয়নি।

বলাবাহুল্য, ভারতবর্ষে ধর্ম যেহেতু জাতিত্বের পরিচয়পত্র, সেহেতু ধর্মের উপর ভারতের জাতীয়তাবোধ হিন্দু-মুসলমান দুই পৃথক সংস্কৃতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ইতিহাসের নির্মোহ বিচারে ভারতবর্ষ হলো হিন্দুর দেশ। হিন্দু সভ্যতা বহু প্রাচীন। ভারতবর্ষের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য হিন্দুর। ইতিহাসও হিন্দুর। হিন্দুধর্ম অনন্ত শাখা-প্রশাখা নিয়ে বটগাছের মতো শাখামূলের ওপর আলাদা আলাদাভাবে ভর করে আছে। অনন্ত বৈচিত্র্য নিয়ে হিন্দুধর্ম কালে কালে নবরূপ লাভ করছে। ভারতের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে বৌদ্ধ, জৈন, তন্ত্র, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি। সবার জননী হিন্দুধর্ম। মত ও পথের ভিন্নতা যাই থাক, জননী এক হওয়ার জন্য সর্বভারতীয় ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে, সংস্কৃতির মধ্যে জাতিগত সংহতি ও ঐক্য অবশ্যই আছে। জাতীয় দুর্দিনে এবং সংকটে তা টের পাওয়া যায়। স্বাধীনতার যুদ্ধে এই ঐক্যের কাছে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকেও মাথা হেঁট করতে হয়েছিল। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ বটবৃক্ষের মূল কাণ্ডটি যে-মাটি থেকে রস শোষণ করে, শাখামূলগুলো সেই মাটির রস নেয়। ভারতের জাতিসত্তা ও জাতীয়তা

বলতে হিন্দু জাতীয়তাই বোঝায়। আটশ বছর ধরে মুসলমান সম্প্রদায় এদেশে বসবাস করেও জাতীয় ভাবধারার মূল স্রোতের সঙ্গে বোধহয় পুরোপুরি মিশে যেতে পারেনি। তারা স্ব-স্ব ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার নিয়ে আর একটা আলাদা জাতিসত্তা তৈরি করে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করছে। অথচ, একদিন আর্য-অনার্যের ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য পৃথক ছিল কিন্তু সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এগিয়েছিল সমন্বয়ের পথে। এভাবে ঋগ্বেদের তেত্রিশ দেবতা তেত্রিশ কোটিতে পরিণত হলেন। এই সমন্বয়, সংমিশ্রণ শুধু ধর্মমতে হলো না, ব্যবহারিক জীবনে ভাবের আদান-প্রদানের দিকেও প্রসারিত হয়ে গেল। আর্যেতর মানুষের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধন, আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং বন্ধুত্বের আকর্ষণে আর্যরা অনার্যদের ঘরের লোক হয়ে উঠল। তাতে রেষারেষির তাপ কমল। রামায়ণের পাতায় পাতায় কত কাহিনী তার। রাক্ষস এবং অসুরদের জঙ্গিরূপ যেমন আর্য-অনার্য মিলনের অন্তরায় হয়েছিল তেমনি মৌলবাদের ধর্মান্ধতা এবং জঙ্গি মনোভাব ভারতের সমন্বয়মূলক সংস্কৃতির পথে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করছে সুপ্রাচীন কাল থেকে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস সন্ধান করতে হবে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বেদ, উপনিষদ্ এবং রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণগুলির ভেতর। এগুলি শুধু সাহিত্য নয়, ধর্মগ্রন্থও বটে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে চিরন্তন আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করে গেছেন এগুলি সেই সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডারস্বরূপ। হাজার হাজার বছরের সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষাগুলি জমাটবদ্ধ হয়ে আছে। মানবপ্রকৃতির মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সত্যম্ শিবম্ তাকেই রামায়ণ মহাভারত ধর্মের আদর্শ সংজ্ঞারূপে গ্রহণ করেছে। বহুত্বের মধ্যে পরম ঐক্যের অনুসন্ধান এবং দেবত্বের উদ্বোধনসূত্রে এগিয়েছে পরস্পরের ভাবগ্রহণ, সমন্বয় ও শান্তি। ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত হলো সেই প্রতিশ্রুতিময় জীবনভাষ্য। একালের ধর্মীয় সংঘাতের ছবিটি তার মধ্যে দুর্লক্ষ্য নয়। ছোট পরিসরে তার রেখাচিত্র আঁকাও দুরূহ নয়।

ভারতবর্ষ শুধু হিন্দুর দেশ নয়। মিলিত হিন্দু-মুসলমানের দেশ। প্রসঙ্গত বলে রাখি, হিন্দু ও মুসলমান যেহেতু দুটি বড় ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় বিবাদ বিরোধও যা কিছু তা এই দুই ধর্মের মানুষের ভেতর — কেবল দেশ কাল পাত্র আলাদা, তাই এদের ঝগড়ার ভেতরে রয়েছে ভারতবর্ষের ট্রাডিশন। রামায়ণ মহাভারতের অভ্যন্তরে সংঘাতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য খোঁজা নিরর্থক নয়।

ভারতের জাতিসত্তা ও জাতীয়তা বলতে হিন্দু জাতীয়তাই বোঝায়। হিন্দু জাতীয়তার মতো সমান্তরাল ধারায় মুসলমান জাতীয়তাও আটশ বছর ধরে ভারতে আছে। হিন্দু জাতীয়তার চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নয়। ভারতীয় সংবিধানেও তাদের ছোট করে দেখা হয়নি। তথাপি রেষারেষির মনোভাব তাদের যথার্থ ভারতীয় হওয়ার পথে অন্তরায় হলো।

মহাভারতের পৃষ্ঠায় অনুরূপ ঘটনার সাক্ষ্য দুর্লক্ষ্য নয়। পাণ্ডবেরা এসেছিল

হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চল থেকে। হস্তিনাপুরের সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ক, পারিবারিক বন্ধন এবং কৃষ্টির যোগ ছিল না। ফলে তারা কৌরব পরিবারের লোক হয়ে উঠল না। রেষারেষি ছিল হস্তিনাপুরের অভ্যন্তরে। এক ভিন্ন জাতিসত্তা এবং পারিবারিক ঐতিহ্য নিয়ে তারা হস্তিনাপুরে বাস করছিল। অনুরূপভাবে মুসলমানরা ভারতবর্ষে সুদূরকাল থেকে বাস করছে, তবু ভারতবর্ষের সঙ্গে এবং হিন্দু জাতীয়তার সঙ্গে তাদের আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। পাণ্ডবদের মতোই পৃথক জাতিসত্তা নিয়ে তারা আলাদা হয়েই থেকেছিল। পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরের কুরুবংশের সিংহাসন ও রাজ্যের দাবিদার হয়েও তারা কখনও কুরুবংশের সন্তান বলে নিজেদের ভাবেনি। তারা শুধুই পাণ্ডব। এর কারণ কৌরবদের সঙ্গে তাদের ভাবগত অভিযোজন ঠিক হয়নি। দুই পরিবারের সমন্বয়ের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিদুর, কুন্তী ও শকুনি। যেমন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের এবং সদ্ভাবের পরিপন্থী হয়েছিল বৃটিশ এবং দুই ধর্মের মৌলবাদী মনোভাব এবং চিত্তের সংকীর্ণতা। ফলে, পুরাকালে এবং একালে বিরোধ, বিভেদ, বিদ্বেষ চিত্তমুক্তির পথ ধরে সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর হয়নি। একই দেশের মানুষ হয়েও কৌরব-পাণ্ডবদের মতো হিন্দু-মুসলমান একে অপরের ভাই, বন্ধু এবং আত্মীয় না হয়ে প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে। মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কটই হিন্দু-মুসলমানের সংক্ষোভের হেতু। কৌরব-পাণ্ডবদের রেষারেষি, বিদ্বেষ এবং ঘৃণার মতো হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ ও বিরূপতা সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত। সমান্তরাল রেখার মতো কেউ কাউকে স্পর্শ করতে পারেনি। পাণ্ডবদের সিংহাসনের দাবি এবং অধিকারবোধ অখণ্ড কৌরব সাম্রাজ্য খণ্ডিত হওয়ার যেমন অন্যতম কারণ, হিন্দু মুসলমানের রেষারেষিতে ভারতবর্ষও তেমন দুটুকরো হয়ে গেল। মুসলিম জাতিসত্তা রক্ষা করতে মুসলিমরা পাণ্ডবদের মতো ভারত উপমহাদেশের অভ্যন্তরে নিজেদের ধর্ম ও জাতিসত্তা রক্ষার জন্য এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টি করল। যেমন পাণ্ডবরা করেছিল ইন্দ্রপ্রস্থ।

কৌরব সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে পাণ্ডবরা যেমন স্বতন্ত্র সত্তা এবং জাতীয়তাবোধ নিয়ে বড় হচ্ছিল, তেমনি মুসলমানরাও ধর্মভিত্তিক একটা পৃথক জাতীয়তাবোধ ভারতের মাটিতে লালন করছিল। কৌরবদের সঙ্গে পাণ্ডবদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের যেমন যোগসূত্র নেই, ভারতবর্ষের সঙ্গে মুসলিম জাতীয়তারও তেমন কোন সম্পর্ক তৈরি হয়নি। ভারতের সঙ্গে বাহ্যিক ঐতিহ্যের সম্পর্কটি এতই পলকা যে একটু টান পড়লে বিং সুতোর মালার মতো ছিঁড়ে গিয়ে সুদুর আরবদেশের সঙ্গে তাদের ধর্ম-সংস্কৃতির নিক আত্মীয় সম্পর্ক বেরিয়ে পড়ে। পাণ্ডবদের ক্ষেত্রে তাদের জাতিত্বের পরিচয়পত্র সুদূ হিমালয়ের গাড়োয়াল প্রদেশের ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে অভিন্নসূত্রে বাঁধা। উভয়ের ক্ষে লোকদেখানো বাইরের সম্পর্কসূত্র পাণ্ডব-কৌরবদের মতো হিন্দু-মুসলমানেরও সম্পর্ক সুস্থ ও সুন্দর হতে দেয়নি। একথা বলা বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে, ভারতের অধিকাং মুসলমান মনের দিক থেকে যেমন পাকিস্তানের নিকটতম প্রতিবেশী তেমনি মহাভার

কৌরবদের চেয়ে পাণ্ডবদের বেশি-কাছের মানুষ হলো হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের মানুষ এবং হস্তিনাপুরের প্রতিবেশী প্রতিপক্ষ রাজ্য পাঞ্চাল এবং যাদবরাজ্য।

ভারতরাষ্ট্রে. বসবাসকারী সকল অধিবাসীই ভারতীয়। এটাই তাদের একমাত্র জাতিসত্তা। কার কী ধর্ম রাষ্ট্রের সেটা জ্ঞাতব্য বিষয় নয়। সংবিধানের চোখে সবাই সমান। তথাপি, ভারতের সংবিধানে সেই নির্মম পরিহাসকে তোয়াজ করা হচ্ছে ভোটের লোভে। বিভেদের বিষবৃক্ষটি উপড়ে না ফেলে আইনের বেড়া দিয়ে নিরাপদে বাড়তে দিচ্ছে। এখন তো বিষবৃক্ষ মহীরুহ হয়ে গেছে। 'কেউ গোঁসা না করে' এই নীতির দরুন মুসলমান, হিন্দু, শিখ সকলেই ভারতের ঘাড়ে বোঝার মত চেপে বসেছে। জাতীয় সংহতির ভাঙন ধরেছে বলেই দেশের গায়ে একে একে ফাটল দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং ভাষাভাষীর মানুষ পাশাপাশি মিলেমিশে থাকতে গেলে যে সহিষ্ণুতা, সংহতিবোধ ও আত্মীয়তাবোধ প্রয়োজন, ভারতীয় সংবিধান তার দাবি মেটাতে পারছে না। অথচ একদিন বৃহৎ ভারতবর্ষে আমরা সব সম্প্রদায়ের মানুষ তো মিলেমিশে একসঙ্গে ছিলাম। কিন্তু যেই স্বাধীন হলাম অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে, অমনি হৈ হৈ করে স্ব-স্ব স্বার্থ সম্পর্কে এমন অতিমাত্রায় সকলে সজাগ হয়ে উঠল যে আমার ধর্ম, আমার ভাষা, আমার সংস্কৃতি, আমার ঐতিহ্য, আমার ভূখণ্ড — রব তুলে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল।

নবীন ভারতের নরম মাটিতে নিঃশব্দে মহাভারতের আর এক কুরুক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। ভারতের শাসকবর্গ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো। তাকে সুপরামর্শ দিয়েও প্রতিকার কিছু করা যাচ্ছে না। ভোট হারানোর ভয়ে অন্যায়কে তোষণ করছে। দুঃখের কথা তাঁরা জনগণের মন বোঝেন না। তাঁরা দুর্যোধনের মতো শুধু ক্ষমতা আর কর্তৃত্ব চান। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হচ্ছে আর একটা লঙ্কাযুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ না হয়ে থামবে না।

ভারতে এখন যা হচ্ছে তাও পাঁচহাজার বছর আগের রামায়ণ এবং মহাভারতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বলা ভালো। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনার সূত্রে রামায়ণ মহাভারতের প্রধান প্রধান দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও সংঘাতের ঘটনাগুলিকে দৃষ্টান্তরূপে তুলে ধরা যায়।

লঙ্কাযুদ্ধের জন্য রাম দায়ী। রাম বকধার্মিক সেজে রাবণের রাজ্যে নাক গলালো। আর্যদের ঐ বদ-অভ্যাসটির জন্য অনার্য-অধ্যুষিত ভারতে যত অশান্তি আর গণ্ডগোল। রাবণের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি।,রামের অভিসন্ধি ভালো লাগেনি। তবু , ক্ষোভ, বিদ্রোহ প্রকাশে সে ছিল সংযত। কিন্তু ভগিনী সূর্পনখার নাক কেটে লক্ষ্মণ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিল। লক্ষ্মণের নারী নির্যাতনের অপরাধ কেউ নিন্দে করল না। , ক্ষুব্ধ রাবণ ভগ্নীর অপমানের পাল্টা প্রতিশোধ নিতে সীতা হরণ করল। চারিদিকে ঃ ছিঃ পড়ে গেল। রামায়ণ পাঠকেরা বিচার না করে অন্ধের মতো রাবণকে দোষী । রাবণের পাশে দাঁড়িয়ে সুবিচার প্রার্থনার মানুষ নেই। ভাই বিভীষণও রাজ্যের লোভে শত্রুপক্ষের নেতা রামের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশ, জাতি এবং ভাইয়ের সঙ্গে

বিশ্বাসঘাতকতা করল। রামের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সেও বলল, অধর্মচারী ভাইয়ের মুখদর্শ করা এবং সংস্রবে থাকাও পাপ।

রামায়ণ শুধু কাব্যগ্রন্থ কিংবা ধর্মগ্রন্থ নয় — ভারতবর্ষের জাতীয়তার ইতিহাস। এক চোখ খুলে রাখলে একালের ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি তার মধ্যে প্রত্যক্ষ কর কঠিন কিছু নয়। ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে হিন্দুরা যখন ঔপনিবেশিকতা থেকে মুে হওয়ার জন্য যেমন অন্দোলনের যে জমি প্রস্তুত করছিল তাতে বিশেষ কোন এ সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সেই সংগ্রামের শরিক হল না। বিভীষণ যেমন রামে পক্ষে যোগ দিল, তারা তেমনি ইংরেজ শিবিরে ভিড়ল। তাদের অনুকম্পা নিয়ে এদেশে শাসক হতে চাইল।

মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও এক হারানো অধিকার ফিরে পাওয়ার স্বার্থে হয়েছিল। অধিকার কখনো পুরনো কিংবা চিরতরে বাতিল হয় না। এককালে কোন এ অবস্থায় অধিকার হারাতে হলো বলে সে অধিকার আর দাবি করা যাবে না, এমন ধরাবাঁ নিয়ম নেই। হারানো অধিকার পুনরায় দাবি করা অথবা তার জন্যে সংগ্রাম করা কো অপরাধ নয়। আফ্রিকার ওপর জন্মগত অধিকার ফিরে চাওয়ার জন্যে কালো মানুষে মরণপণ সংগ্রামকে কেউ অন্যায় বলে না। মহাভারতে চোদ্দ বছর পরে পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থ দাবি করল সেও ছিল তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ফিরে পাওয়ার আর্জি। কি কায়েমি স্বার্থ তাদের দাবি মানল না বলে যুদ্ধ হলো।

অযোধ্যার রামমন্দির নিয়ে বিরোধ অনেকটা কৌরব-পাণ্ডবের প্রাক্‌কুরুক্ষেত্রে মীমাংসাহীন পর্বে থমকে থাকার মতো এক অবস্থার ভেতর কেবল প্রহর গুনছে। যে কে মুহূর্তে তা নিয়ে বড় কিছু ঘটতে পারে দু-ধর্মের মানুষের ভেতর। বোম্বাইয়ের বিস্ফো তারই ইংগিত। বিরাটের গো-ধন হরণের সময় ছদ্মবেশে পাণ্ডবরা ঝটিকা আক্রমণ ক কৌরবদের শুধু তছনছ করল না, ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের ভয়াবহতা সম্পর্কে এক আগ হুঁশিয়ারিও দিল। কিন্তু কৌরবরা উদাসীন থাকল। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মাইনরি পাণ্ডবদের শক্তিকে উপেক্ষা করল। ভারতে আজ যা হচ্ছে তা রামায়ণ-মহাভারতে পুনরাবৃত্তি কেবল। ভারতব্যাপী বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাগুলি বৃহৎ কিছু হওয় পূর্বাভাস। রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধের আগে হনুমান লঙ্কায় যে অগ্নিকাণ্ড করল সঙ্গে অযোধ্যার ঘটনা এবং বোম্বাই, কোলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ-এর বোমা বিস্ফোরণে ঘটনাগুলোকে সহজে মিলিয়ে নেওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত যেহেতু জাতীয় ইতিহা সেহেতু এ থেকে যদি আমরা শিক্ষাগ্রহণ না করি তা-হলে আর একটা লঙ্কাযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ভারতের মাটিতে ঘটে যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রধান কারণ ত্যাগ ও সহমর্মিতার অভাব। আত্মীয়ে আত্মীয়ে স্পর্শকাতর সম্পর্ক থাকে তাকে পরম মমতার হৃদয় খুঁড়ে যদি কেউ দেখতে না শে তারা দুর্যোধন, দুঃশাসন হয়ে যায়। যাই হোক, দুর্যোধন বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবদের সূচ্যগ্র ভূ

াড়ল না বলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়লো। অধিকার, কর্তৃত্ব, সামান্য ত্যাগ ।রলে যে যুদ্ধ আটকানো যেত কৌরবপক্ষের অনমনীয়তায় তা অনিবার্য হলো।

স্বাধীন ভারতে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সম্প্রদায়েব ধর্মের লোক বিনা ংঘর্ষে কেউ কাউকে সূচ্যগ্র ভূমি দিতে নারাজ। অযোধ্যা নিয়ে বিরোধ, পাঞ্জাব নিয়ে ।খদের জেহাদ, অপরদিকে, দার্জিলিং-এ গোর্খারা, ঝাড়খণ্ডে ঝাড়খণ্ডীরা, আসামকে ালফারা, এবং কাশ্মীরীরা জাতিগত ভূমির দাবিতে সূচ্যগ্র ভূমি অন্য জাতকে দেবে না। দশের সম্পদকে অন্য রাজ্যে যেতে দেবে না। ফলে দেশের মানুষ ধর্ম জাতি এবং গোষ্ঠী ায়ে হানাহানি, খুনোখুনি, বিশৃঙ্খলা করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা করছে নতুন কায়দায়।

ভারতবর্ষের নিজস্ব জীবনধারার ছন্দে বিকাশমান জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ানেকদিন ধরে অনেক মাজাঘষা করে রামায়ণ মহাভারত রচিত হয়েছে বলেই ভারতের ।তিগত বৈশিষ্ট্য, স্বভাব, চরিত্র, ধর্ম এবং সমস্যামূলক ঘটনা বিরোধ, বিভেদ, দ্বন্দ্ব একটা ার্বজনীনতা পেয়েছে। যথার্থ জাতীয় মহাকাব্য হয়ে উঠেছে। হাজার হাজার বছর পরেও ার মূল্য একটুও কমেনি। বরং স্বাধীন ভারতে যা ঘটছে এখন তা তো রামায়ণ হাভারতের পুনরাবৃত্তি মাত্র। বলা যেতে পারে অলক্ষ্যে প্রাচীন মহাকাব্যের ছকে এক নব হাভারত রচনা হচ্ছে মহাকালের মহাফেজখানায়।

কৌরব পাণ্ডবদের মতো আধুনিক মহাভারত রচনার শুরুতেই হিন্দু এবং মুসলমান – ধর্মের ভিত্তিতে দুই ভিন্নজাতি। এই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত দ্বিখণ্ডিত হলো। হাভারতে হয়েছিল দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভার পরে। আর আধুনিক ভারতে তা ঘটল টিশ বিদায়ের সন্ধিক্ষণে। মহাভারতের আখ্যায়িকায় দেখি পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরের উপর াদের উত্তরাধিকার দাবি করল। কৌরবরা দাবি নাকচ করে দিয়ে বলল : হস্তিনাপুরে াণ্ডবদের কোন জায়গা হবে না। পাণ্ডবেরা বলল : তারাও কৌরবদের সঙ্গে থাক্‌বে না – তাদের ভাগের ভাগ মিটিয়ে দেওয়া হোক। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বললেন : হ ুরে াণ্ডবদের ঠাঁই না হওয়া ভালো। ওরা আলাদা হতে চায় হোক। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ।ক পরিবার এবং বংশের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডব এবং কৌরব আলাদা হয়ে গেল। বদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিতে কুরু সাম্রাজ্যের একটা অংশ কেটে আলাদা করে ণ্ডবদের দেওয়া হলো। হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মেটাতে ইংরেজও তাদের বিদায়ের এদেশটাকে কেটে দুটুকরো করে উভয়কে সন্তুষ্ট করল। পাণ্ডবেরা এক বংশের পরিবারের সন্তান হয়েও পৃথক ভূখণ্ড চাইল। ভারতবর্ষে তেমনি আটশ বছর ধরে করেও মুসলিমরা মনে-প্রাণে ভারতীয় হলো না। অনুরূপভাবে হিন্দুরাও তার গেড়ে তোলার ভূমিকা নিল না। মহাভারতেও ঠিক এরকমটা হয়েছিল।

শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে কুন্তী পাণ্ডুপুত্র নামধারী দেবপুত্রদের সঙ্গে হস্তিনাপুর ফিরলে কৌরবভ্রাতাদের সঙ্গে তাদের বেশ একটা সখ্য এবং সদ্ভাব গড়ে উঠল। তাদের অন্তরঙ্গতা কুন্তী বিদুরের পছন্দ হলো না। অলক্ষ্য থেকে তাদের সদ্ভাবের জায়গায় বিবাদ,

বিদ্বেষ, বৈরিতা সৃষ্টি করতে ভীমকে ব্যবহার করল। ভীমের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ কৌরবভ্রাতারা বাধ্য হয়ে পাণ্ডবদের সংস্রব ত্যাগ করল। দুর্যোধন ও দুঃশাসনের মনে সেই প্রথম পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষভাব জাগল। উভয়ের সম্পর্ক তিক্ত হলো। অবিশ্বাস এবং বৈরীভাব সৃষ্টি হলো। আশ্চর্যের কথা পিতামহ, দ্রোণ, কৃপাচার্য, ধৃতরাষ্ট্রের কেউ একজন কিশোর মনে বিদুরের রোপিত বিভেদ ঘৃণার বিষবৃক্ষটি উৎপাটিত না করে সযত্নে তার চারপাশে একটা বেড়া দিয়ে বিভেদের গাছটিকে বাড়তে দিল। অনুরূপ ঘটনা বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষেও। হিন্দু-মুসলমানের একসঙ্গে মিলে-মিশে থাকাটা ইংরেজের পছন্দ হলো না। কুন্তী ও বিদুরের মতো চাইল বিভেদ বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে একই কায়দায় হিন্দু-মুসলমানদের মধুর প্রতিবেশী সম্পর্ককে তিক্ত করে দিতে। একাজে তাদের সহায়ক হলো হিন্দু-মুসলমানের আলাদা ধর্ম, সংস্কার, আচার, প্রথা এবং বিশ্বাসের মূল্যবোধগুলি। তাদের ইন্ধনে ভাষা নয়, মাটি নয়— ধর্মের ভিত্তিতে তারা দুই জাতি হয়ে গেল। এজন্য হিন্দুর প্রবল ধর্মাভিমান এবং যুক্তিহীন আচারসর্বস্ব প্রথা কুসংস্কারই অধিক দায়ী। সুচতুর ইংরেজ সেই উর্বর মৃত্তিকার উপর বিভেদের শক্ত ইমারত গড়ে তুলেছিল সন্তর্পণে। কবে কী করে যে তারা পরস্পরের শত্রু হয়ে গেল, জানতেও পারল না। হিন্দুমনে অনুরূপ বিভেদ-বিদ্বেষ ঘৃণার বিষ ছড়িয়েছে ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের আচার, প্রথা, কুসংস্কার এবং জাতিচ্যুত করার রক্তচক্ষু। কৌরব ও পাণ্ডবদের মতো হিন্দু-মুসলমানও এক দেশের মানুষ হয়ে পরস্পরের আত্মীয়, বন্ধু এবং ভাই হতে পারল না। তাদের সদ্ভাবের ও সম্প্রীতির জায়গায় সন্দেহ, অবিশ্বাস, শত্রুতা, এবং ঘৃণা উভয় ধর্মাবলম্বী সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে দিল না। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। ইংরেজরা দেশ ছাড়তে যখন প্রস্তুত মুসলমান সম্প্রদায় তাদের জন্য পৃথক ভূখণ্ড দাবি করল। একদিন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাণ্ডবেরাও অনুরূপ দাবি করেছিল। পাঁচ হাজার বছর আগের মহাভারত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করল ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়। পাণ্ডবদের মতো তারাও বলল হিন্দুদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা অসম্ভব। বৃটিশদের মত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বলল, "ওরা যখন আলাদা হতে চায় হোক।" একদেশের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তারা ভারত থেকে আলাদা হয়ে পাকিস্তান নামে এক নতুন রাষ্ট্রের পত্তন করল। ভারতের মাটিতে আর এক ইন্দ্রপ্রস্থ হলো। কিন্তু তাতে কৌরব-পাণ্ডবদের বিবাদ বন্ধ হলো না। পাকিস্তান ও ভারতরাষ্ট্রে কোন পরিবর্তন হলো না।

এটাই ঘটনার শেষ নয়, শুরু। মহাভারতে এই ভাগাভাগি কৌরব সাম্রাজ্যের মুকুটহী সম্রাট ভীষ্মের নীরব অনুমোদনেই হলো। ভীষ্ম একটু কঠোর হলে সেই মুহূ দ্বিজাতিতত্ত্বের গলা টিপে হত্যা করতে পারতেন। সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে হস্তিনাপুরে কুরুবংশের সন্তানদের অন্য কোন জাতিসত্তা কিংবা বংশপরিচয় থাকতে না। তারা এক পরিবার এবং এক বংশধারার অন্তর্ভুক্ত। কৌন্তেয়রাও কৌরব। সেই কথ স্পষ্টবক্তা সত্যভাষী পিতামহ কঠোর ভাষায় বলতে কেন দ্বিধা করেছিলেন? তিনি জানে

তাঁর ভুলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঠেকানো গেল না। জীবন দিয়ে তাঁকে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো। যেমন করতে হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীকে।

নব মহাভারতে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। স্বাধীন ভারতবর্ষকে বৃটিশ যখন ভেঙে দুটুকরো করল তখন পিতামহের মতো ভারতের বাপুজিও এই বিভাগকে নিরুপায় হয়ে অনুমোদন করেছিলেন। তাঁর মৌন সম্মতি ছাড়া ভারতবিভাগ হতো না। অথচ, একমাত্র পিতামহ ভীষ্মের মতো জাতির জনকই সকলের মুখের উপর স্পষ্ট করে বলতে পারতেন আমাদের এই ভারত রাষ্ট্রের সকল অধিবাসী একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। তাদের একমাত্র পরিচয় ভারতীয়। কোন অজ্ঞাত কারণে নেহরুর মুখের উপর সে কথা বলতে দ্বিধা করলেন। কার কী ধর্ম রাষ্ট্রের কাছে সেটা জ্ঞাতব্য বিষয় নয়। যারা মনে ভাবছে ভিন্নধর্মীয় বলে তারা ভিন্ন জাতিভুক্ত, দেশ ভাগাভাগির মুহূর্তে তাদের এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। বোধ হয় নিজের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে কঠোর ভাষায় কঠোর কথাটা বলতে দ্বিধা করেছেন। বাপুজি যদি ঐ কথাগুলো একবার বলতেন তা হলে নব ভারতে আর একটা কুরুক্ষেত্রের ভূমি প্রস্তুত হতো না। প্রমাণ হয়ে গেল ইতিহাসের শুধুই পুনরাবৃত্তি হয়!

নব ভারতের আর এক সমস্যা মাইনরিটি। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপ এবং বিদুর সকলে পাণ্ডবদের মাইনরিটি বলে তোয়াজ করে চলতেন। পাণ্ডবেরা কৌরবদের বিরোধীপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও মাইনরিটি বলে তাদের সব দাবি ও আব্দার মেটাতেন তাঁরা। দেশ-বিভাগের পরে ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপের মতো বাপুজি, নেহেরু প্যাটেল সকলেই ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে মাইনরিটি নামক রক্ষাকবচ-পরা একটি বিশেষ শ্রেণীকে ভোটের স্বার্থে তোয়াজ করে চলেছেন। শুধু একটি মাত্র ধর্মসম্প্রদায়েরই ওজর-আপত্তি, অকাতরে মানা হচ্ছে এখনও। কিন্তু অন্য মাইনরিটিরি ধর্ম সম্প্রদায়ের দিকে ফিরেও তা[illegible]নো হচ্ছে না। রাজনৈতিক ফয়দা তুলবার জন্য যা করা হচ্ছে তার মধ্যে আন্তরি[illegible]ার চেয়ে কুম্ভীরাশ্রু বেশি। কপট মাইনরিটিপ্রেম হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর লড়াই বাধিয়ে, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের এক কূট কৌশল। মণ্ডল কমিশন তাদের সেই তুরুপের তাস। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে জাতি, বর্ণ, ধর্মের নামে এ বৈষম্যসৃষ্টি কেন? সুদূর অতীতে মহাভারতেও এমনটা করা হয়েছিল পাণ্ডবদের দিয়ে।

পাণ্ডবদের প্রতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ যেরকম পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করতেন, কৌরবদের প্রতি সেরকমটা করতেন না। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতরাষ্ট্রে এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্যে এক আইন এবং ভারতের অন্য ধর্মের মানুষ যারা তাদের জন্যে আর এক আইন। পিতামহের নিরপেক্ষতা এবং ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে তফাত নেই। এ ভাবে গোটা মহাভারতের দৃষ্টান্ত দিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যযুগ আর আধুনিক যুগের ইতিহাসের সাদৃশ্যমূলক মূল্যায়ন করা খুব দুরূহ কাজ নয়।

ধর্ম, মাইনরিটি অনগ্রসর শ্রেণীর স্পর্শকাতর প্রশ্নগুলো গুরুত্ব দেওয়ার নাম করে সস্তা রাজনীতির যে ইতিহাস পাঁচ হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল মহাভারতের পাতায় নবভারতের রাজনৈতিক দলগুলো সেই ট্রাডিশনই সমানে বহন করে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক দলগুলিই মহাভারতের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্রগুলোর মতো দেশের সংহতির সংহার করছে। ফলে দেশসুদ্ধ মানুষ ছোট ছোট গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। মন ছোট হয়ে গেলে দেশ ছোট হয়ে যায়। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, অসম, ঝাড়খণ্ড, গোর্খাল্যাণ্ডের দাবি তার দৃষ্টান্ত। এক দেশ, এক রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য চাই সরকারের বিশ্বাসযোগ্য ভূমিকা এবং নিরপেক্ষ ন্যায়নীতি। মহাভারত কৃষ্ণের মতো অমন যে পুরুষোত্তম ব্যক্তি তিনিও পারেননি বিশ্বাসযোগ্য ভূমিকা পালন করতে। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ শ্মশান হয়ে গেল। দেশব্যাপী, নৈরাজ্য, হতাশা, বিশৃঙ্খলা, শূন্যতা, অরাজকতা, হানাহানি এবং রক্তারক্তিতে কৃষ্ণের স্বপ্নরাজ্য যদুবংশও ধ্বংস হয়ে গেল। মহাভারতের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশনেতাকে শক্ত হাতে নব ভারতের শান্তি সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, সৌভ্রাত্র গড়ার কাজে হাল ধরতে হবে। একাজে তাদের ব্যর্থ হওয়া মানে আর এক বৃহৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া। পচা গলা কবন্ধ শবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ধর্মপ্রাণা, মানবতার বিশ্বাসিনী গান্ধারী যেমন ধর্মধ্বজী কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিল তেমনি নবভারতের ধর্মীয় উন্মাদনার ক্রুসেড যুদ্ধে (?) নিহত উভয় ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের জননীরা আগামী দিন অভিশাপ দেবে মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর রাজনৈতিক দল এবং তাদের বশংবদ মৌলবাদী ধর্মসংঘগুলিকে।

ভুললে হবে না পরমতসহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, বিশ্বস্ততা হলো ভারতের জাতীয়তার মূল স্বরূপ। তার প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে। সর্বনাশের আগে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় মঙ্গলাচরণ করিঃ 'গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ।'

# রাজনৈতিক সন্ন্যাসী : শ্রীচৈতন্য

হিন্দু ধর্মের কল্যাণে ও মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মহান আদর্শ ও সংকল্প নিয়েই গৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। কোন দ্বিধা বা সংশয় না করেই বলা যায় চৈতন্যদেব ছিলেন রাজনৈতিক সন্ন্যাসী। একমাত্র সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব রাজনৈতিক সন্দেহের বাইরে থেকে মানুষের কাছাকাছি আসা। মানুষকে আহ্বান করার শক্তির জোরেই নিমাই ভারতকে নাড়া দিয়েছিলেন অন্তরে ও বাইরে। মুসলমান রাজশক্তি প্রতিরোধ করতে গিয়ে তিনি নিজেই হয়ে উঠলেন একজন সুচতুর রাজনৈতিক নেতা। নামকীর্তন হল তাঁর গণ জাগরণের মন্ত্র। পাষণ্ড মুসলমান রাজশক্তি প্রতিরোধের অস্ত্র। কর্মক্ষেত্র নীলাচল হল সর্বধর্মের মানুষের মিলন তীর্থ। সাম্যপ্রেম মৈত্রীর পূজারী রাজনৈতিক সন্ন্যাসী তার মূল্য দিলেন নিজে শহিদ হয়ে।

কথাগুলি চমকে দেবার জন্যে নয় কিংবা চমক লাগানোর জন্যেও নয়। চৈতন্যদেবের বিশাল কর্মজীবন সম্পর্কে এ হল আমার সিদ্ধান্ত। যুক্তির সরণি ধরে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আয়াসসাধ্য কিছু নয়। কিন্তু পাঁচশত বৎসর ধরে চৈতন্যদেব সম্পর্কে যে প্রচলিত সংস্কার ও দার্শনিক চিন্তা, অধ্যাত্মবিশ্বাস সকলকে অভিভূত করে আছে তা আমার এই ধরনের স্পষ্ট সিদ্ধান্তে অনেককে ক্ষুব্ধ করতে পারে। পাঁচশত বৎসর অতিক্রান্ত হল, তবু চৈতন্যের সন্ন্যাসজীবনের পশ্চাতে যে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাৎপট আছে তার ঐতিহাসিক পৃষ্ঠাটি প্রতিপাদ্য বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করে বিচার করা একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এতে চৈতন্যদেবের গৌরব কিছু কমার আশংকা নেই। বরং সত্যের ঔজ্জ্বল্য বাড়বে।

চৈতন্যদেবের পূর্ণস্বরূপ অন্বেষণ করতে গিয়ে সেই প্রথাবদ্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারের অতি পুরাতন ও জীর্ণ পাঁচিলটি যদি ভেঙে পড়ে, অপসংস্কৃতির অন্ধকার থেকে চৈতন্যমুক্তির কোন সুযোগ সৃষ্টি হয়, তা হলে অতি সুন্দর সুন্দর কাব্য কথার দার্শনিকতার তলায় চাপা পড়া কথার চেয়ে কঠিন সত্য অনেক বেশি পবিত্র নয় কি ? পাঁচশ বছর ধরে ধর্মহীনতার যুগে আমরা নিশ্চয়ই পরিশীলিত যুক্তি বুদ্ধি, মার্জিত রুচি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে শ্রেয় ও অশ্রদ্ধেয়কে বাছাই করে নেব। প্রয়োজন হলে তার জন্যে আমাদের আবহমান কালের

সংস্কারকে আঘাত হানতে হবে। কেননা, মানুষের ধর্মই তাই যা সর্বমানবের মঙ্গল করে। চৈতন্যদেব নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন জনগণের মঙ্গল বিধানের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সর্বজনীন দৃষ্টি ছিল না। এইজন্য হিন্দুধর্মের ওপর আঘাত এসেছে বারংবার।

পারিপার্শ্বিক অবস্থাই মানুষকে পথের সন্ধান দেয়, অনেক সময় তাকে গড়েও তোলে। গৌরসুন্দরের সমসাময়িক অবস্থাই তাঁর আগমনের পটভূমি। জাতিবর্ণে বিভক্ত সমাজে নানা প্রকার বঞ্চনা, ঘৃণা, অবহেলার বেদনা, নিপীড়ন, তন্ত্রের বিকৃতি, অনাচার, ব্যভিচার, সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছিল। বঙ্গে মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্মের বিস্তার অভিযানে হিন্দু মন্দির ধ্বংস, গোমাংস খাইয়ে দিয়ে, মুখে কুলকুলি করে জল দিয়ে হিন্দুদের ধর্মনাশ, জাতিনাশ এবং ধর্মান্তর করা হত কারণ হিন্দু অধ্যুষিত দেশে একটি বিদেশি রাজশক্তিকে টিকে থাকতে হলে নিজ ধর্মমতে বিশ্বাসী লোক বৃদ্ধির প্রয়োজন। এরকম একটা পরিবেশে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব।

এখন প্রশ্ন, কিসের ভিত্তিতে উদ্ধত অহংকারী দাম্ভিক পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ গৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন? জাতিভেদের কঠোরতা, পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্ষোভ, বঞ্চনা, নিপীড়িত, দরিদ্র, অসহায় মানবকুলকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল দুটি কারণে। রাজশক্তির ছত্রছায়ায় এলে সুযোগ-সুবিধা লাভের সম্ভাবনা যেমন প্রবল তেমনি ইসলামের গণতন্ত্রী আদর্শ ও সাম্য মনোভাব তাদের সামাজিক আত্মগ্লানি এবং অসহায়তা থেকে উদ্ধারলাভের অবলম্বন হয়েছিল। তাই গৌরসুন্দর হিন্দু ধর্মের উপর আঘাত প্রতিরোধের সংকল্প নিলেন। জাতি ও বর্ণ ভেদে দিশেহারা হয়ে হিন্দুরা পরস্পরকে ঘৃণা করে, অবহেলা দেখিয়ে সামাজিক ঐক্য-সংহতি ও শক্তি ক্ষয় করছে। সুতরাং এই ক্ষয় রোধ করতে হলে মানুষে মানুষে সহযোগিতার ক্ষেত্র বাড়িয়ে তুলতে হবে। পারস্পরিক নির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে। মানুষ শক্তির উৎস। ভেদাভেদ সৃষ্টি করে কি রাজশক্তি, কি সমাজ বেশিদিন টেকে না। তাই আগে মানুষকে প্রেমের বাঁধনে বাঁধতে হবে। মানুষের মধ্যে ছোটবড় বলে কিছু নেই — এই বোধ, বিশ্বাস আপামর জনসাধারণের চিত্তে জাগানো দরকার। অতএব সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, সমাজে যত অত্যাচার, নিপীড়ন অবহেলা, ব্যভিচার, অনাচার, ধর্মনাশ চলেছিল তার প্রতিকার প্রচেষ্টাতেই নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণ। কারণ একজন গৃহীর কথা কেউ শোনে না। কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি মানুষের অচলাভক্তি এবং বিশ্বাস। সন্ন্যাসী পারেন মিষ্টি কথায় মিষ্টি ব্যবহারের দ্বারা চিত্ত জয় করতে। তাই তো তিনি পরবর্তীকালে জনগণের চোখে হয়ে উঠলেন 'সচল জগন্নাথ'।

প্রবন্ধের ছোট ক্যানভাসে রাজনৈতিক সন্ন্যাসী চৈতন্যের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করা অসম্ভব বিবেচনা করে সূত্রাকারে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করছি। (আগ্রহী পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে মৎ-লিখিত 'সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' উপন্যাসটি অবশ্যই পড়া দরকার)।

শিশুকাল থেকে বিশ্বম্ভর ছিল দলনেতা। জাতপাতের বিচার ছিল না তার। গণতন্ত্রী মনোভাব না হলে কেউ সমদর্শী হতে পারে না। তাই প্রধান হয়েও অপরকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের ক্ষমা লাভের পর উদ্ধার হল জগাই-মাধাই। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় যবন হরিদাস উপস্থিত ছিল। সহজ মনেই পারিষদদের ভেতর দায়িত্ব বণ্টন করে দিলেন। বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব বিভিন্ন ভক্ত প্রধানের উপর ন্যস্ত করেছেন।

নেতৃত্ব দিতে গেলে একটা ভাবমূর্তি অবশ্যই তৈরির প্রয়োজন। তাই কি খেলায়, কি সাঁতারে, কি দুরন্তপনায়, কি পড়াতে তাঁর সমকক্ষ ছিল না কেউ। সর্বত্র নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সকলকে আকৃষ্ট করার শক্তি ছিল তাঁর মধ্যে। মানুষের শ্রদ্ধা-প্রীতি, ভালবাসার আসনে নিজের অভিষেক সম্পন্ন করে তিনি সমাজসেবায় ব্রতী হলেন। ধর্ম জগতে নেতৃত্ব দিতে গেলে যে সামাজিক পরিবর্তন আগে ঘটানো দরকার এ জ্ঞান তাঁর পূর্ণমাত্রায় ছিল।

সামাজিক পরিবর্তন মানেই বিপ্লবাত্মক সামাজিক আন্দোলন। সাধারণ মানুষই তার শরিক। বিশ্বম্ভর সর্বাগ্রে তাদের মনোভূমি গড়ে তোলার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। প্রচারকের উপর মানুষের বিশ্বাস জন্মানোর জন্যেই নিজেকে আগে ধর্মীয় নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সে কাজটাও অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্বম্ভর মর্ম দিয়ে অনুভব করলেন সমাজে সত্যকার সমতা আনতে পারে বৈষ্ণব ধর্ম। বৈষ্ণবধর্মে জাতপাতের বালাই নেই। মুসলমানকেও তা কোল দিতে পারে। সকল মানুষ সমান, মানুষের ছোট বড় নেই, ধর্ম মানুষের মিলনের পথে বাধা নয় — এই বিশ্বাসবোধই সত্যকার সমতা সৃষ্টি করতে পারে। সমতা এলে জাতির মনে দৃঢ়তা বিশ্বাস দেখা দেবে। ঐক্য ও সংহতি সমাজকে দৃঢ়বদ্ধ ও মজবুত করবে। বিশ্বম্ভরের এই অনুভূতি, উপলব্ধি নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজের দৃষ্টি কেড়ে নিল। বৈষ্ণব চূড়ামণি অদ্বৈতাচার্যের গৃহে হল তাঁর অভিষেক। বয়জ্যেষ্ঠ অদ্বৈতাচার্য বিশ্বম্ভরকে প্রধান করে তাঁকে গুরু বলে মেনে নিলে শ্রীবাস তাঁর চরণ বন্দনা করল। যবন হরিদাস বিশ্বম্ভরের আলিঙ্গন পেল। বড় ছোট, জাত বেজাত, উঁচু-নিচু বোধ ভেঙে গেল। এক নতুন প্রত্যয় গড়ে উঠল।

মানুষের মনে শক্তি সঞ্চয় করতে, ভ্রান্তি দূর করে সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য নাম সংকীর্তনকে গণজাগরণের মন্ত্র করে তুললেন। সমাজকে সোজাসুজি আক্রমণ করে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির বিড়ম্বনায় না গিয়ে প্রেম ভক্তি বিলিয়ে শুধু নামগানের সহজ উপায়ে যত অধিক সংখ্যক মানুষকে বৈষ্ণব করে তোলা যাবে, যত বেশি লোককে মাতোয়ারা করে তোলা সম্ভব হবে, তত অধিক পরিবর্তন আসবে সমাজে। জাতটা কিছু নয়, মনটাই আসল। সেই মন প্রেমের পরশে গলে যায়। হুসেন শাহের দক্ষিণ হস্ত দবীর খাস, সাকর মল্লিকের পরিচয় তো মুছে গেল। চিরন্তন হয়ে রইল রূপ-সনাতনের নাম। ভারতবর্ষের মানুষ জানতে পারল, হিন্দু-মুসলমান বলে কিছু নেই সকলেই বৈষ্ণব, মানুষ হিসেবে সমান। পাষণ্ড জগাই-মাধাই বিশ্বম্ভরের ক্ষমা ও করুণা পেয়ে মানুষ হয়ে উঠল। বলা

বাহুল্য, বিশ্বম্ভরের নিজের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে এদের প্রত্যেকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক বিপ্লবের মাইলস্টোন।

এরপর বিশ্বম্ভরের রাজকীয় অভিষেক। হিন্দু ধর্মের উপর মুসলমান রাজশক্তির আক্রমণ প্রতিহত করার প্রয়োজনবোধ তাঁকে একজন দায়িত্বশীল কূটকৌশলী রাজনৈতিক নেতা করে তুলল। হিন্দুধর্মের উপর মুসলমান রাজশক্তির আক্রমণ রুখতে এবার তিনি এক বিরাট প্রস্তুতি নিলেন। মন্দির ধ্বংসকারী প্রশাসকদের সঙ্গে এক বৃহৎ ও কঠিন সংগ্রাম করার জন্য সাধারণ মানুষের অন্তরে আস্থা ও শক্তি তাঁর বিশেষ দরকার ছিল। এই কাজে সাফল্য লাভ করতে হলে দুষ্কৃতকারী পাষণ্ডদের সর্বাগ্রে বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বভাবই হচ্ছে সরাসরি স্বার্থান্বেষী, সুবিধাভোগী, দুষ্কৃতকারী, হামলাকারী ব্যক্তিদের দিয়ে কৌশলে হামলা বাধিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। নবদ্বীপের প্রশাসক চাঁদ কাজীর আশ্রিত ও মদতপুষ্ট দুই হিন্দু পাষণ্ড জগাই মাধাইকে তিনি সর্বাগ্রে প্রেম, মমতা ক্ষমা ও করুণা দেখিয়ে তাদের শুভবুদ্ধির উদ্রেক করলেন। তাদের হৃদয় জয় করে কাজীকে দুর্বল করে দিলেন। পাষণ্ডরাও দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হল। সেটাই হল কাজীর রোষের কারণ। নবদ্বীপে নাম সংকীর্তন নিষিদ্ধ হল।

এবার ধর্মের হাত ধরে বিশ্বম্ভর রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করলেন। ধর্মের উপর রাজশক্তির আক্রমণ নিমাইকে ক্ষিপ্ত করল। জনশক্তির মহিমা দেখাতে, সাধারণ মানুষের রাজাদেশ অমান্য করার সাহস, স্পর্ধা ও শক্তি দেখাতে নিশিথ রাত্রিতে এক বিরাট জনতা নিয়ে তিনি মশাল মিছিল বার করলেন। মিছিল পরিচালনায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতার নেতৃত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তিনি। একালের রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে মিছিল পরিচালনা করে, তার চেয়ে অনেক দক্ষতার সঙ্গে মিছিল সাজালেন তিনি। স্থির হল মিছিলের প্রথমে থাকবেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নেতা সর্বজনমান্য অদ্বৈতাচার্য এবং তার সঙ্গে একজন গায়ক; মধ্যে থাকবেন যবন হরিদাস এবং কীর্তনের দল তৃতীয় ভাগ রক্ষার দায়িত্ব পেলেন শ্রীবাস পণ্ডিত এবং একদল সহ-গায়ক এবং মিছিলের শেষে নিত্যানন্দকে নিয়ে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য। এর কারণও খুব পরিষ্কার। মিছিলের সম্মুখভাগ যদি কোন কারণে আক্রান্ত হয়, পেছনের লোকেরা কিছু না বুঝেই ভয়ে চতুর্দিক থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে পারে এবং একবার পশ্চাতের লোক পলায়ন আরম্ভ করলে মিছিলের সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই মিছিল যাতে না ভাঙে, শৃংখলাবদ্ধ থাকে সেজন্য প্রতিটি ভাগের সম্মুখে রাখা হল শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবদের এবং গোটা মিছিলের লাগাম ধরে সংযত রাখার জন্য মহানায়ক নিমাই রইলেন সকলের পশ্চাতে। এই জনরথের সারথি যে তিনি। নির্দেশ ছিল চৈতন্যদেবের হুংকার শোনা মাত্র প্রত্যেকে জ্বালাবে হাতের দীপ। তারপর উচ্চ হরিধ্বনিতে আর মিছিলের উন্মাদনায় জনতার ভয় কেটে যাবে, তারা নির্ভয় হবে। চৈতন্যের পরিকল্পনামত জনতা নাম সংকীর্তন করতে করতে নির্ভয়ে এগিয়ে চলল কাজীর প্রাসাদের দিকে। অবরোধ ভেঙে জনতা একেবারে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল।

কাজী ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সন্ধি করল। জনতার জয় হল। সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, সুদৃঢ় নেতৃত্ব যে রাজশক্তিকে তুচ্ছ করতে পারে এবং নিরস্ত্র সংগ্রামেও যে জয়ী হওয়া যায় এই বোধ ও বিশ্বাস সাধারণ মানুষের অন্তরে প্রবল শক্তি সঞ্চার করল।

কাজী দলনের পর সুলতানের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হওয়ার আশংকা প্রবল হল। এজন্য মনে মনে তিনি প্রস্তুত হলেন। এবারের সংগ্রাম মহাসংগ্রাম। এই সংগ্রাম যাতে কোনরকম রাজনৈতিক রূপ না পায়, হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষে পরিণত না হয় সেজন্য তিনি সর্বাগ্রে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করলেন। সবাইকে আকর্ষণ করার জন্যই সন্ন্যাসগ্রহণ। কৃষ্ণদাসের ভাষায় সন্ন্যাস চৈতন্যদেবের 'মহাজাল' কেবল নুতন 'রঙ্গ' নয় 'চাতুরী অপার'-ও বটে। একমাত্র সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব রাজনৈতিক সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে মানব মুক্তির প্রচার অভিযান চালানো। তাই নীলাচলকেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্র রূপে নির্বাচন করলেন।

হিন্দুর মন্দির এবং ধর্মের উপর বিধর্মী মুসলমান রাজশক্তির আক্রমণ ও আঘাত যাতে না হয় তার প্রতিরোধের সংকল্প নিয়ে তিনি নীলাচলে পা রাখলেন। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু রাষ্ট্র ছিল উড়িষ্যা। উড়িষ্যার জগন্নাথদেব হলেন বৈষ্ণবদের পরম আশ্রয়স্থল। এই দেবমন্দির যুগ যুগ ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার হিন্দুকে আকর্ষণ করেছে। সুতরাং এরকম একটি হিন্দুরাজ্যের তীর্থক্ষেত্রকে তাঁর কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নেওয়া অধিক উপযোগী বলে মনে হল কেন? বৈষ্ণবদের সাধনধাম মহাতীর্থ মথুরা বৃন্দাবন তখন মুসলমান সম্রাটদের অধীন। কেবল পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ ভারতে তখনও কিছু স্বাধীন হিন্দু রাজ্য ছিল।

প্রসঙ্গত বলা দরকার চৈতন্যদেবের হিন্দু ধর্মের প্রসার চিন্তা রাজনীতি ঘেঁসেই ছিল। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোন ধর্ম সমাজে ও গণ মানসে স্থায়ী সমাদর পায় না। অথচ পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ ভারতে বলশালী হিন্দু নরপতিরা পরস্পরের সঙ্গে সর্বদা বিবাদে লিপ্ত। নীলাচলে পা দিয়েই তিনি টের পেলেন এই বিবাদের রন্ধ্রপথ দিয়ে মুসলমান রাজশক্তি ভারতের মাটিতে শিকড় গেড়ে বসেছে। উড়িষ্যার প্রতাপ রুদ্র এবং কর্ণাটকের কৃষ্ণদেব রায়ের নিরন্তর সংঘর্ষে উড়িষ্যা রাজ্য হুসেন শাহের অধিকারভুক্ত হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। হুসেন শাহের উড়িষ্যা আক্রমণের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করার জন্য প্রতাপ রুদ্রের শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। এই কাজটি করতে তিনি গোপনে রামকেলিগ্রামে গেলেন। সেখানে অর্ধরাত্রে হুসেন শাহের শক্তি ও সমৃদ্ধির দুই স্তম্ভ যে দুজন রাজকর্মচারী ছিল দবীর খাস ও সাকর মল্লিক ওরফে রূপ-সনাতন এর সঙ্গে গোপনে মিলিত হলেন। হুসেন শাহকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য তাদের দুজনকে কৌশলে সরিয়ে আনলেন।

এর পরেই তিনি দক্ষিণ ভারতে রওনা হলেন। চৈতন্যদেবের প্রচেষ্টায় সেখানকার হিন্দুরাজারা উপলব্ধি করল পরস্পরের সঙ্গে কলহে ও লড়াইতে লিপ্ত থেকে তারা শুধু

নিজেদের শক্তিক্ষয় ও জাতির সর্বনাশ করছে। অথচ, একটু ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হলে হিন্দু অধ্যুষিত ভারতবর্ষে কোন বিদেশি শক্তিই টিকে থাকত না। মানুষ শক্তির উৎস। বিভেদ, বিদ্বেষ, শত্রুতায় তা খর্ব হচ্ছে। সহযোগিতা, বিশ্বাস, মৈত্রী, একতা রাজশক্তির উৎস। চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের ফলে প্রতাপ রুদ্র ও কৃষ্ণদেব রায়ের যুদ্ধ বন্ধ হল এবং তারপর থেকে কৃষ্ণদেব রায় মুসলমান রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। চৈতন্যের ভারত পর্যটনও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগ্রাসী মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির সামনে হিন্দুদের সংহত রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি জাত-পাতের বেড়া ভেঙে বৈষ্ণব ধর্মের ছত্রছায়ায় তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্য গড়ে তোলেন। এইভাবে প্রেমধর্মের সাফল্যজনক প্রচার শেষ করে তিনি নীলাচলে স্থায়ীভাবে বসলেন। শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল বিশ্বমানব প্রেমে বিশ্বাসী এক বিশেষ বৈষ্ণবগোষ্ঠী। নীলাচলে পরমহংস শ্রীচৈতন্যের জনপ্রিয়তা, রাজশক্তির আনুকূল্য, রাজপুরোহিতের আনুগত্য, অসংখ্য মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা, অনুরাগ এক স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করল। মানুষের চোখে তিনি প্রেমের ঠাকুর। তিনি অবতার, ক্রমে উড়িষ্যাবাসীর উপাস্য হয়ে উঠলেন।

চৈতন্যের জাতিভেদ বিরোধী প্রচার পুরোহিত ও পাণ্ডাদের জীবিকার ও সামাজিক মর্যাদার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তারা রাজ আমাত্য বিশ্বাসঘাতক, অভিসন্ধিপরায়ণ গোবিন্দ বিদ্যাধরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চৈতন্যদেবকে মন্দির মধ্যেই হত্যা করে পথের কাঁটা অপসারিত করল। তাই তো বলেছিলাম সাম্য, প্রেম, মৈত্রীর পূজারী, মানবপ্রেমিক রাজনৈতিক, সচেতন সন্ন্যাসী হিন্দু ধর্মের ভিত সুদৃঢ় করার মূল্য দিলেন নিজে শহিদ হয়ে।

# গণ সঙ্গীতের উদ্গাতা শ্রীচৈতন্য

দলিত মানুষের গণবাণী হরিনাম। এই নামে জনগণ একত্র হয়, মাতোয়ারা হয়। হরিনাম হল বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর গান। মুক্তির সঙ্গীত। আধুনিক পরিভাষায় গণসঙ্গীত। এই অর্থে, গণসঙ্গীতের প্রথম উদ্গাতা শ্রীচৈতন্যদেব। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে যে চমকে উঠবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ 'গণসঙ্গীত' কথাটা হাল আমলের। কিন্তু চৈতন্যদেব মানবমুক্তির আন্দোলনে গণসঙ্গীত প্রথম ব্যবহার করেন।

গণসঙ্গীতের কথা শুনলে সংগ্রামী মানুষের বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় দৃপ্ত সমবেত কণ্ঠের পথ চলা গানের এক চিত্রকল্প ফুটে ওঠে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং মুক্তি সংগ্রামের ছবি। দ্বিতীয়ত, গণসঙ্গীতের বাণীতে প্রকাশ পায় সংগ্রামে সংকল্প, ঐক্যে বিশ্বাস এবং জীবনকে সুন্দর করে তোলার আকুতি। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় নানাবৈষম্য, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, ঘৃণা এবং শোষণ থেকে উদ্ভূত সমস্যা জনগণকে প্রতিনিয়ত যে সংঘাত ও সংঘর্ষের সম্মুখীন করছে তাকে শৈল্পিক রূপদান করা গণসঙ্গীতের আর এক অবশ্যপালনীয় শর্ত। চতুর্থত, জনগণকে সহজে আকৃষ্ট করা, তাদের চিন্তা চেতনার উপর স্থায়ীভাবে দাগ কাটা, জনগণকে বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, প্রেরণা যোগানো গণসঙ্গীতের শর্ত। চৈতন্যদেব হরিনাম সংকীর্তনের ভেতর দিয়ে গণসঙ্গীতের শর্তগুলো সর্বপ্রথম পূরণ করতে সক্ষম হলেন। হরিনাম সংকীর্তনের সুরের পথ ধরে অবহেলিত অপাংক্তেয় অসহায় মানবসমাজ মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে।

মধ্যযুগের ধর্মান্ধতা এবং হতাশাপীড়িত মানুষের হৃদয়ে নতুন উদ্যম ও উৎসাহ সঞ্চারের জন্য ধর্মপ্রাণ মানুষের হৃদয়ের বাণী হরিনাম কীর্তনকে চৈতন্যদেব করে তুললেন গণজাগরণের মন্ত্র। শান্ত নিরীহ, ক্ষুব্ধ মানুষের সমবেত কণ্ঠের হরিনাম কীর্তন ধর্মের বিরুদ্ধে, সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি ও অনুপ্রেরণা দিল। বিপ্লবী চরিত্রে দৃঢ়তা প্রকাশ করল। এই অর্থেই হরিনাম সংকীর্তন গণসঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে। কারণ, এর পূর্বে আর কোনো লোকরঞ্জনী নামকীর্তন বা সঙ্গীতে অনাদৃত অবহেলিত মানবসমাজের তথা সর্বহারা জনগণের সমাজ ও ধর্মের শৃঙ্খলমোচনের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ পায়নি।

নিমাই প্রবর্তিত নামকীর্তনে মানুষের আবেগ আকাঙ্খা মুক্তি পেল। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের এক প্লাবন বয়ে গেল তৎকালীন বাংলাদেশে এবং ভারতভূমিতে। মুসলমান শাসক ও তার শোষণ-নিপীড়ন এবং হিন্দুধর্মের প্রবল বর্ণবিদ্বেষ, জাতপাতের সংস্কার উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণের বিভেদ বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনগণকে হরিনাম সংকীর্তনের ছত্রছায়ায় এনে তাদের বলিষ্ঠ সংগ্রামী জনতায় পরিণত করার এক নতুন আবেগ সঞ্চার করল। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের, নিপীড়ক ও নিপীড়িতের, উচ্চ ও নিম্নবর্ণের শ্রেণী বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিমাই হরিনাম সংকীর্তনকে গণসঙ্গীতের পর্যায়ে নিয়ে গেল। হরিনাম সংকীর্তন মধ্যযুগে ধর্মান্ধতা থেকে মানুষকে মুক্ত করল। জনগণকে সঙঘবদ্ধ ও সংগঠিত হতে সাহায্য করল। এই নামগান তাদের এগিয়ে চলার শক্তি সাহস ও প্রেরণা দিল। নিদ্রাচ্ছন্ন বাঙালি জাতির প্রাণে বন্ধনমুক্তির উন্মাদনা জাগাল। এই জন্যেই চৈতন্যদেবকে গণসঙ্গীতের উদ্‌গাতা বলেছি।

নিমাই অসাধরণ প্রজ্ঞাবলে অনুভব করেছিল প্রত্যেকটি হিন্দুর অন্তরে হরিনাম গানে যত প্রবল ধর্মভাব জাগে, ভজন পূজনে তত নয়। প্রত্যেক বাঙালি তথা ভারতবাসীর নামগানের প্রতি একটা স্বাভাবিক অনুরাগ এবং আকর্ষণ আছে। ধর্মের প্রভাব ভারতবাসীর মনে কত গভীর ও ব্যাপক নিমাই তার অল্প বয়সে টের পেয়েছিল। বাস্তবে এ প্রভাবকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে মানুষের হৃদয়-জয়ের পথ খুলে যাবে। জনগণও অনুগত ও বশে থাকবে। বিপ্লব-বিদ্রোহের হাতিয়ার হবে! ঈশ্বরের নাম, মানুষই শক্তির উৎস। হরিনাম তাকে কেবল চুম্বকের মত আকর্ষণ করে আনবে উৎসের দিকে। কারণ হরিনাম সংকীর্তনের ভেতর ভারতাত্মার বাণীরূপ লুকিয়ে আছে। এই সত্যদর্শন নিমাই'র সাফল্যের চাবিকাঠি।

হরিনাম সংকীর্তন খুব অল্প আয়াসে হয়ে উঠল ঘুম ভাঙার গান। মানুষ বশের মন্ত্র। যুগ যুগান্তরের ধর্ম ও সংস্কারের ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষের ঘুম ভাঙল হরিনামের সুরের ঝংকারে। হরিনাম দেশের উঁচু-নিচু, শিক্ষিত-আশিক্ষিত, পণ্ডিত-অপণ্ডিত, ধনী-নির্ধন এবং অগণিত ধর্মভীরু মানুষকে ঘরের বাইরে বার করে আনল। হরিনাম হলো মানবমুক্তিরও ঐক্যের গান তার অভিযানের সঙ্গীত। অচলায়তন ভেঙে ফেলার সঙ্গীত। তাই তো দেশের একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ হরিনামে পাগল হলো। ছোট, বড়, উঁচু, নিচু ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সব একাকার হয়ে গেল। যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষ যে ধর্মীয় সংস্কারের অচলায়তনের কারাগারে বন্দী তার দেয়ালে ফাটল ধরল। জাতপাতের সংস্কারের অচলায়তন থেকে নামকীর্তন মানুষকে নিয়ে এল মানুষের কাছে। কার্যত নামসংকীর্তনে অংশীদারী নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, মেহনতী মানুষের অন্তরে প্রত্যাশার দীপ জ্বালাল। এক বিরাট সামাজিক বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হলো বাঙালি মানসলোকে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পণ্ডিত, পুরোহিত, ধার্মিক, সন্ন্যাসীরা এসে মিলল নিমাইয়ের সঙ্গে। বিদ্যায় বুদ্ধিতে, অভিজ্ঞতায় বয়সে নিমাই অপেক্ষা তাঁরা বড়। তবু নিমাই-এর নেতৃত্বে তাঁরা আস্থা জ্ঞাপন করলেন। এ নেতৃত্ব

মানুষের ভালবাসা থেকে উৎসারিত। জনগণের প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা তাকে সর্বমানবের হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করল।

নিমাই সমাজে, জীবনে, মননে এবং ধর্মে নিঃসন্দেহে বিপ্লব এনেছিল, তৎকালীন সামাজিক অবস্থাই এই বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থাই মানুষকে পথের সন্ধান দেয়, অনেক সময় তাকে গড়েও তোলে। নিমাইয়ের সমকালীন আয় রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থাই তাঁর আগমনের পটভূমি। জাতিবর্ণ বিভক্ত সমাজে নানাপ্রকার বঞ্চনা, ঘৃণা, অবহেলা, বেদনা, নিপীড়ন, তন্ত্রের বিকৃতি, অনাচার, ব্যভিচার সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিল। জীবনের থিত ভিত ভেঙে পড়ল। অথচ সেজন্য কারো বেদনাবোধ নেই। সংকীর্ণতা থেকে সমাজের মানুষকে মুক্ত করার কোনো আকাঙ্খাও নেই।

সুখের বিষয়, গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিবারের সন্তান হয়েও নিমাই-এর বিদ্যা, ব্রাহ্মণত্বের অভিমান ছিল না। কিংবা কোনো সংকীর্ণ মনোভাবের দ্বারা সংকুচিত নয় তাঁর চিত্তদেশ। তাঁর স্বজাতিপ্রীতি, স্বধর্মপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম ছিল খাঁটি। দেশকে এবং দেশের মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন বলেই জাতপাত, বর্ণভেদ, জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। ফলে, তাঁর পক্ষেই ব্রাত্য মানবসমাজ এবং অবহেলিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষের জন্য আরো বেশি ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক অধিকারের দাবি জোরাল কণ্ঠে ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছিল। মানবমুক্তির দাবিতে, তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেতর থেকেই একশ্রেণীর কিছু উদার প্রগতিশীল হিন্দুপণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ নিমাইকে সমর্থন করলেন। দেশের গণনাহীন সাধারণ দুঃখী মানুষের জীবনে মুক্তির স্বাদ বইয়ে দেবার জন্য এবং সমাজে তার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য নিমাই মাটির কাছাকাছি মানুষের সমতলে নেমে এলেন। তার চাওয়া অধিকার ও মুক্তি মানেই সমাজের একেবারে শেষপ্রান্তে অচ্ছুৎ অপাংক্তেয় হয়ে যারা বাস করে সেই অগণিত নিরুপায় নিঃস্ব মানুষের মানবিক মর্যাদা ও গৌরব নিয়ে বেঁচে থাকার। অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

মানুষের জীবনের প্রকৃত শরিক হওয়া, তাকে ঐক্যবদ্ধ করা, সংগঠিত করা এবং অনুপ্রাণিত করা। এই দায়িত্ববোধ থেকেই নিমাই'র গণসঙ্গীতের পরিকল্পনা। একমাত্র সঙ্গীতের দ্বারা মানুষের মনে ভাবের প্লাবন বইয়ে দেওয়া যায়। মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়। সঙ্গীত যত সহজে মানুষকে আকর্ষণ করে তাকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত করে, প্রত্যেককে সঙ্গে প্রত্যেকের ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করে, এক এক প্রাণ হতে মন এবং গণমুখী করতে পারে আর কিছু তা পারে না। ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতরূপে নিমাই হরিনাম সংকীর্তনকে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির অন্যতম মাধ্যমরূপে নির্বাচন করলেন। সত্যকারে গণমুখী ঐতিহ্য একমাত্র হরিনামেই আছে। সব শ্রেণীর সব বর্ণের এবং সম্প্রদায়ের হিন্দু নাম সংকীর্তনে অভ্যস্ত। এর প্রতি সকল হিন্দুর অনুরাগ, শ্রদ্ধা অসীম। এর সুর ভাষা

একই। দলবদ্ধ হয়ে সকলে একত্রে একপংক্তিতে মৃদঙ্গ, কর্তাল করতালি সহযোগে গলা মিলিয়ে প্রাণের আনন্দে গান গায়। মানুষ ভক্তিতে আবেগে, অনুরাগে, এক আসরে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ মত নির্বিশেষে ধনী দরিদ্র সকলে শ্রীহরির নামগানে এক হয়ে যায়। এই কোরাস গান অধঃপতিত হিন্দুর বেঁচে ওঠার ও বাঁচিয়ে তোলার গান। এযে মহাসাম্যের গান তাতে নিমাই'র কোনো সন্দেহ রইল না।

এটি যথার্থই গণসঙ্গীত। এই গানে ধর্মপ্রাণ জনগণের একটা তীব্র ভাবাবেগ প্রকাশ পেয়েছে। এই নামকীর্তনের প্রতি হৃদয়ধর্মের অধিক্যের মূলে আছে বাঙালির সহজাত কৃষ্ণপ্রীতি। শ্রীকৃষ্ণ সমাজে অত্যাচারিত, অবিচারিত, নির্যাতিত, পতিত, অনাদৃত শ্রেণীর মানুষের জন্য অপরিমেয় সহানুভূতিশীল ছিলেন। নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষের দুঃখের কারণ যারা তাদের ধ্বংস করতে সর্বনাশা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করেছিল। কৃষ্ণ নিজেও ছিল অত্যন্ত সাধারণ অবস্থায়। স্বৈরাচারী, অত্যাচারী, সাম্রাজ্যবাদী শাসকের হাতে সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবনযাত্রা দুর্বিষহ ও দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। শ্রীকৃষ্ণই অসহায় মানবকুলকে অত্যাচার অপমান থেকে উদ্ধার করেছিলেন। মানুষের ঐকান্তিক প্রেমে ধরা দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন জনগণের অধিনায়ক, পরম প্রেমময় ঈশ্বর। মানুষের হরিনামের দুর্নিবার ভাবাবেগের ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এই চেতনা। এই প্রকার ভাবাবেগের ঐশ্বর্য বা প্রাচুর্য গণজাগরণের এবং বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার যে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম সে বিষয়ে নিমাই-এর মনে সন্দেহ ছিল না। কারণ যে নামগান দেশের অগণিত, পীড়িত, আর্ত সর্বহারা মানুষের জীবনে সান্ত্বনার বাণী, তাকে দুঃখী মানুষের দুর্গতিমোচনের হাতিয়ার করে তুললে বেঁচে থাকার এক অনুকূল সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠবে, এরকম একটা প্রত্যয় নিমাই নাম সংকীর্তনে সৃষ্টি করলেন।

হরিনামের উদ্দেশ্য শুধু নাম সংকীর্তন নয়। ঈশ্বরের নামে ধর্মপ্রাণ মানুষকে একত্রিত করে উদ্দীপিত করা, সংঘবদ্ধ করা, সংঘচেতনা এবং ঐক্যে আস্থাবান করা। কাউকে প্ররোচিত না করে শুধু নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ অহিংস গণ আন্দোলনের নিঃশব্দ ঢেউটি সর্বশ্রেণীর মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেয়। নগর সংকীর্তন হলো পথ চলার গান ইংরেজিতে যাকে বলে 'মার্চিং সঙ্স্'। জনস্বার্থের সঙ্গে, দেশের সর্বব্যাপী আকাঙ্খার সঙ্গে জনগণের স্বার্থ ও অধিকার সুরক্ষার এক বিপুল ভাবাবেগ গণসঙ্গীতের শর্তপূরণ করল।

নাম-সংকীর্তন সামাজিক প্রথা এবং নিষেধ ভেঙে চুরমার করে মানুষের মনের বাধা দূর করল, যে পবিত্র তাকে পবিত্রতা দিল, যে অপবিত্র তাকে পবিত্র করে তুলল। 'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে'। একবার হরিনাম করলেই তার সব দোষ, কলুষ খণ্ডন হয় হরিনাম সংকীর্তন যথার্থই মানবমুক্তির পথ করে দিল। আপামর মানুষের কণ্ঠে নিমাই দিলেন হরিনাম। হরিনামে তারা সংঘবদ্ধ হলো, পথের বাধা, মনের বাধা দূর করে তাদের এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিল।

হিন্দুধর্ম রক্ষার এক পরিবেশ তৈরি হলো। শুধু ধর্মের তকমায় ঈশ্বরের নামে মানুষকে একত্রিত করল। তাহলে দুঃখে, বেদনায়, বীর্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহসে, সবার উপরে মানুষ সত্য এই বিশ্বাসে প্রত্যয়বান হয়েই নগরসংকীর্তনে নামল। কোনো বাধা নিষেধের ভয়ে থেমে গেল না। জগাই মাধাইয়ের মারের মুখে তাদের দৃঢ়তা সাহস, বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, দৃপ্ত সংকল্প, সংগ্রামী চেতনা অতবড় পাষণ্ডদেরও ভাবাল। তারাও হরিনামের দলে মিশে গেল। এ-জয় জনতার। জনগণের ঐক্য, সাংগঠনিক শক্তি নেতৃত্বের দৃঢ়তা, নৈতিক সাহস, আত্মপ্রত্যয় বৈপ্লবিক মর্যাদা পেল। কাজী দলনের সময় হরিনাম সংকীর্তন নিমাই-এর কণ্ঠে হয়ে উঠল বিদ্রোহী মানুষের রণসঙ্গীত। অত্যাচারী শাসন শক্তিকে পরাভূত করে সাধারণ মানুষের যে জয় হলো তার বিজয়বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সাধারণ মানুষ আরো বেশি দলবদ্ধশক্তিতে আস্থাবান হলো। গণসঙ্গীতের যথার্থ সঠিক ধর্ম প্রকাশ পেল। হরিনামকে ধর্মীয় সঙ্গীতের পর্যায়ে না ফেলে অনেকে দেশাত্মবোধক বা জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত পর্যায়ে ফেলা উচিত বলে ভাবল। এর কোনো যুক্তি নেই। 'বন্দেমাতরম' তো উনিশ শতকের জাতীয় ভাবোদ্দীপক গণসঙ্গীত ছিল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত গণসঙ্গীতের সব অবশ্য পালনীয় শর্ত ও বৈশিষ্ট্যগুলি হরিনাম সংকীর্তন পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। নিমাই-এর এই বাস্তববুদ্ধি এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল সাফল্যের চাবিকাঠি। হরিনাম সংকীর্তন তৎকালে প্রচ্ছন্নভাবে স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটা ভূমিকা পালন করেছিল। এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মূলত জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করে, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ করে মধ্যযুগীয় সংস্কার, বিশ্বাস এবং স্বৈরাচারী দর্শন নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি ও বিপ্লবী চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ করল। মধ্যযুগের সাধারণ মানুষের জীবনের ব্যর্থতায় যে হতাশা এসেছিল, যে নৈরাশ্য জাতীয় জীবনকে কুরে কুরে খাচ্ছিল হরিনাম সংকীর্তন তার মুক্তির পথ করে দিল।

এক মহান ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যই চৈতন্যদেব একবুক সামুদ্রিক আবেগ, বিশ্বাস ও সাহস নিয়ে একসঙ্গে ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। মধ্যযুগীয় পশ্চাৎপদতায় স্থবির সমাজে চৈতন্যের কর্মসূচি ও মহৎ উদ্দেশ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, জমিদার, ধনী ও নৃপতিদের আকর্ষণ করল। এর ফলে চৈতন্যের গোটা উদ্দেশ্য গভীর তাৎপর্যতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

হরিনাম সংকীর্তন গণসঙ্গীতের সব শর্ত পূরণ করেছে। তবু সংশয় দূর করার জন্য একটা কথা বলার আছে। গণসঙ্গীতের 'গণ' শব্দটি প্রকাশ করল সাধারণ দুঃখ দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা এবং তাদের বাঁচার দাবিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামীরূপ। হরিনাম সংকীর্তনে গণচেতনার সেই পথ খুলে দিয়েছে। মধ্যযুগের ধর্মান্ধতার যুগে হরিনামের

দৌলতে উচ্চবর্ণের হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এবং সমাজে অবাধ কর্তৃত্ব ও শাসন থেকে জীবন ও মননের মুক্তি গণসচেতনতার পথেই এসেছে। সমাজে যাদের কোনো মর্যাদা ছিল না, তারা পেল জীবনের গৌরব ও সামাজিক অধিকার, মানুষের মর্যাদা। এটা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য যে জনগণকে সকল অনাচার অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি সাহস যেমন সার্থক গণসঙ্গীতে সৃষ্টি করা হয়, হরিনাম সংকীর্তন মধ্যযুগের ধর্মপ্রাণ মানুষের অন্তরে তেমনি অবিচার অপশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। নিমাই গণসঙ্গীতের চাবিকাঠিটি হরিনাম সংকীর্তনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল। যথার্থ অর্থে হরিনাম কীর্তন সর্বহারা মানুষের মনে অপমানিত মানুষের সত্তায় সত্তায় সাহস, শক্তি, দৃঢ়তা সংগ্রামী মনোবলের শিখার মশাল জ্বেলে দিল।

কার্যত এক অরাজনীতিকে অবলম্বন করে চৈতন্যদেব ধীরে ধীরে রাজনীতির অঙ্গনে এসে দাঁড়াল। এখন রাজনীতি বলতে কি বুঝি? বলাবাহুল্য এর সর্বসম্মত কোন উত্তর নেই। কেউ বলবেন বিপ্লব, কেউ বলবেন ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব, কেউ বলবেন নেতৃত্ব অর্জনের প্রচেষ্টা। কিন্তু চৈতন্যের রাজনীতির মূলে এসব কিছু ছিল না। মানুষ ধর্মে সুন্দর ও পবিত্র হোক এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। পৃথিবীটা মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার অঙ্গীকার তাঁকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

চৈতন্যের রাজনীতিতে জনস্বার্থ সংরক্ষণ ও বিকাশের কৌশলগত দিকটাই ছিল বড়। অন্যভাবে বলতে পারি, বিবদমান গোষ্ঠী ও দলের মধ্যে সমীকরণই ছিল তাঁর রাজনীতির অঙ্গ। সকল প্রকারের স্বার্থগোষ্ঠী সজ্ঞানে নিজেদের স্বার্থকে বিকশিত করতে চায় এবং তার থেকে একটা সংঘাতের জন্ম নেয়, মূল আন্দোলন সংকুচিত হয়, এই স্বার্থ সামঞ্জস্যের জন্যই তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ। সন্ন্যাসী হয়ে জনগণের মর্মের বাণী হরিনাম সংকীর্তনকে দেশে দেশান্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। এটাই চৈতন্যের রাজনীতির বোঝার দিক। সমাজকে সোজাসুজি আক্রমণ করলে নানারকম প্রতিক্রিয়া ও বিড়ম্বনার সম্ভাবনা থাকত। তাই ঐ ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে ভক্তি, প্রেমভক্তি বিলিয়ে শুধু নামগানের সহজ উপায়ে যত অধিক সংখ্যক মানুষকে বৈষ্ণব করে তোলা যায়, যত বেশি লোককে মাতোয়ারা করা সম্ভব হয় তত অধিক পরিবর্তন আসে সমাজে। জাতটা কিছু নয়, মনটাই আসল। সেই মন প্রেমের পরশে গলে যায়, হরিনামে বিভোর হয়।

একথা বলার উদ্দেশ্য হলো ধর্মের হাত ধরে চৈতন্যদেব রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেন। হিন্দুধর্মের উপর রাজশক্তির আক্রমণ প্রতিহত করার প্রয়োজনবোধ তাঁকে দায়িত্বশীল কূটকৌশলী রাজনৈতিক এবং সামাজিক নেতা করে তুলল। কার্যত নিমাই হরিনাম সংকীর্তনকে ধর্মের মতো ব্যবহার করেছেন। জনগণের কণ্ঠে হরিনামের মন্ত্র দিয়ে হিন্দুধর্মের ক্ষয়ক্ষতি, ধ্বংস রোধ করতে এবং মানুষের সহযোগিতা পারস্পরিক নির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলতে হরিনাম সংকীর্তন হলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাধ্যম ধর্মীয় ও সামাজিক বিপ্লবের সাফল্যের মাইলস্টোন।

নিমাই বাংলার তথা ভারতবর্ষের গণজাগরণের চাবিকাঠি হিসাবে গণসঙ্গীতের প্রথম সূচনা করল। তাঁর এই গণসঙ্গীত কথায়, ছন্দে, সুরে, জনগণের অংশগ্রহণের এবং অভিনয়ে বৈচিত্র্যময়। একটি ধর্মীয় সঙ্গীতকে গণসঙ্গীতে পরিণত করা নিমাই-এর কৃতিত্ব নিমাই-এর প্রয়োগ কৌশলে হরিনাম সংকীর্তন গণসঙ্গীতে রূপান্তরিত হলো। নির্যাতিত, দুঃখী মানুষের প্রতি সমবেদনা ও জেগে ওঠার আহ্বান এবং অত্যাচারীর প্রতি বিদ্রোহের আহ্বান কিন্তু হরিনাম পূরণ করেছে। হরিনাম সংকীর্তনকে নিমাই করে তুলেছে নতুন যুগের আগমনী।

# ধর্ম, জাতীয়তা ও সাহিত্য

ভারতে উগ্র ধর্মান্ধতার পাগলামি চলেছে এখন। দেশের মানুষ নিরাপত্তাবোধের অভাবজনিত দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। এরকম একটা স্পর্শকাতর সমস্যার কথা লিখতে বসে আমার কেবলই মনে হচ্ছে ; এতবড় একটা সাম্প্রদায়িক সমস্যা যার শিকড় কয়েক শতাব্দীর গর্ভে প্রোথিত, তার সমালোচনা করা, ভালোমন্দ বিচার করতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। সাহিত্যের দরবারে তার মূল্যই বা কতটুকু ? সাহিত্যিক তো আর ঐতিহাসিক নয় যে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সত্যকে দেখবে? সাহিত্যের কারবার মানুষের মনকে নিয়ে; সুন্দরকে নিয়ে। এসব সমস্যার মীমাংসার দায়িত্ব, পণ্ডিত, গবেষক, ইতিহাসবেত্তা, রাষ্ট্রনেতা, ধর্মীয় গুরু এবং সমাজ সংস্কারকের।

কিন্তু একজন সাহিত্যিকের কাজ জীবনের ছবি আঁকার। সেই ছবি জীবন ও সমাজের অনেক কিছু নিয়ে। বিকাশমান জীবনের সূত্রে একজন লেখক পরম মমতায় হৃদয় খুঁড়ে বার করেন ; — ধর্মের কারণে কত ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সংকটে একজন মানুষ কষ্ট পায়, কত জায়গায় তার বেদনা, কোথায় তার অভিমান আর কী নিদারুণ বিড়ম্বনায় কাটে তার প্রহরগুলি।

জীবনের মূল্যবোধগুলি দ্রুত হারিয়ে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে যাচ্ছে মানুষ। অথচ সেজন্য সমাজের কারো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু মনের অতলে ফল্গুধারার মতো তার একটা প্রতিক্রিয়া থাকেই। সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভারতের জাতীয় সংকট ও সমস্যা নিয়ে দু'চার কথা এই নিবন্ধে বলার চেষ্টা করব।

ধর্ম ও জাতীয়তার মতো একটা পুরনো দীর্ঘমেয়াদী বিরোধ নিয়ে মন ভোলানো, মন রাঙানো বক্তৃতা করে কিংবা হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাবের বিচ্ছিন্ন কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে ধর্মপ্রাণ উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মাভিমানের লোভ দূর হবে না। সমস্যার মূলে পৌঁছে তার আত্মাকে খুঁজলে মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে দেশ বিভাগের পর ভারতে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক সহজ হয়ে উঠতে পারত। সেই পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে রাজনৈতিক নেতাদের যে আন্তরিকতা দেখানো উচিত ছিল ক্ষুদ্র স্বার্থে তাঁরা তা করেননি। মানে, করার চেষ্টা হয়নি। কার্যত, তাঁরা চান না হিন্দু-মুসলমানের রেষারেষি মিটে যাক। এই রেশটাকে

যতকাল টিকিয়ে রাখা যাবে ততকাল তারা রাজনৈতিক ফয়দা লুটতে পারবে। ফলে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্বটা শুধুই বেড়ে যাচ্ছে।

স্বাধীনতার পরের প্রজন্মের কাছে হিন্দু এবং মুসলমান একে অন্যের কাছে অপরিচিত থেকে গেল। স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশতাব্দীতে পৌঁছে দেখা যাচ্ছে যে মুসলমান আরও মুসলমান হবার সাধনায় মেতেছে এবং হিন্দু আরো হিন্দু হয়ে উঠতে চাইছে। মানুষ যাতে মানুষের পরিচয় মুছে সম্প্রদায় হয়ে ওঠে তারই মহড়া চলছে যেন। ধর্মই হয়েছে জাতীয়তা নিরূপনের ভিত্তি। ধর্ম আলাদা বলেই হিন্দু এবং মুসলমান আলাদা আলাদা জাতি। ভারতের জাতীয়তাবোধ মূলত এই দুই ধর্মের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে ধর্ম ও জাতীয়তার প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলমানের প্রসঙ্গ উঠছে কেন? কারণ ভারতে জনসংখ্যার বিচারে এই দুটি ধর্ম সম্প্রদায় প্রধান। ধর্মীয় বিবাদ বিরোধ যা কিছু তা এই দুই ধর্মের মানুষের ভেতর। বিভেদের বিদ্বেষের এই বিষবৃক্ষটি ভারতের মাটিতে বপন করে গেছে বৃটিশ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষকে তারা তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছে : মুসলিম, নন-মুসলিম এবং খৃস্টান। মনে হবে, ভারতবর্ষে মুসলমানেরাই প্রধান। তাদেরই দেশ। তাদের সঙ্গে অল্পকিছু অন্য ধর্ম-সম্প্রদায় এবং খৃস্টান আছে।

ইংরেজ যা কিছু ভাবতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের নির্মোহ বিচারে ভারতবর্ষ হলো হিন্দুর দেশ। হিন্দু সভ্যতা বহু প্রাচীন। ভারতবর্ষের ধর্ম হিন্দুর, সংস্কৃতি হিন্দুর, ইতিহাসও হিন্দুর। দেশকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করার উদ্যোগও হিন্দুর। সারা ভারতে ইংরেজ বিরোধী যে আন্দোলন হয়েছিল তা ছিল নন-মুসলিমের। অর্থাৎ যা হিন্দুর এবং হিন্দুধর্মেরই শাখা-প্রশাখা। তাই হিন্দু পরিচয় মুছে ফেলতে ইংরেজরা হিন্দুসম্প্রদায়ের মানবকুলকে নন-মুসলিম শ্রেণীতে চিহ্নিত করল। হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়কে শিখণ্ডীর মতো দাঁড় করাল। ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিঘ্নকারী শক্তি হিসেবে হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রভাব যেভাবে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাতে ইংরেজরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। নিজেদের বিপন্ন অস্তিত্বকে রক্ষা করতে বিভেদনীতির আশ্রয় নিল। মুসলমানদের অস্ত্র করে হিন্দুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করল। ইংরেজের মুসলিম তোষণ নীতি হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করল। ভারতবর্ষে একটা মুসলিম প্রধান প্রদেশ গড়ে তোলা ছিল ইংরেজদের পরিকল্পনা। নন্-মুসলিমদের স্বদেশি-আন্দোলন ব্যর্থ করে দেবার উদ্দেশ্যেই হিন্দুদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করতে জাত-পাতের ভিত্তিতে অনগ্রসর সংখ্যালঘু শ্রেণীকে মাইনরিটি নামে চিহ্নিত করে হিন্দুতে হিন্দুতে বিবাদ বাধিয়ে দিল। এই নতুন ভেদনীতির ফলে, কে কোন বর্ণের মানুষ কোন ভাষার লোক, কোন সম্প্রদায়ের, তার জাতি কি-এসব চেনাল। হিন্দুর মনকে সুস্থ থাকতে দিল না।

দুঃখের কথা, নিজের স্বার্থে ইংরেজ বিভেদ-বিদ্বেষের বিষবৃক্ষের যে বীজটি বপন করল এদেশের মাটিতে স্বাধীন দেশের সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলি তাকে উৎপাটিত

না করে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরে তার মূলে জলসেচন করছে। নবভারতের ভোটযুদ্ধে এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে কার্যত উক্ত বিভেদনীতি অনুসরণ করে যে যার ফয়দা তুলেছে। আমাদের জাতীয়তাবোধে ঘুণ ধরার জন্যেই দেশের কথা দেশের মানুষের স্বার্থর নাম করে আত্মছলনা করি। ফলে, ইংরেজের লাগানো বিষবৃক্ষের চারাগাছটি এখন মহীরুহ হয়েছে। প্রাচীন ভারতের সমাজ চলত মনুসংহিতা মতে, স্বাধীন ভারতে শাসন-ব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থা চলছে বৃটিশ সংহিতা মতে।

তাই সাহস করে এমন কিছু বলা হয় না যাতে দুই ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতিবেশীসুলভ বাইরের সদ্ভাব চোট খায়। পাছে বিভ্রান্তির অপচেষ্টা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই রাজনৈতিক দল এবং নেতারা মূল সমস্যাকে এড়িয়ে বাইরের মিলটাকেই ফলাও করে প্রচার করে। কিন্তু তাতে সুফল হয়নি কিছুই। ভারতীয়বোধে মুসলমানেরা অনুপ্রাণিত হয়নি। এদেশের বাসিন্দা হয়েও তাঁরা কেউ নিজের দেশ বলে মনে করে না। সেজন্যে দেশপ্রীতির শিকড় ছড়ায়নি ভারতের মাটিতে।

ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর। ভাবতে অবাক লাগে, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা কিন্তু নিজেদের ভারতীয় মনে করে না। প্রগতিশীল বামফ্রন্ট সরকারের জনৈক মুসলিম মন্ত্রীকে বলতে শুনেছি, তিনি সবার আগে মুসলমান তারপর ভারতীয়। ধর্মীয় চেতনার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি তাঁর জাতিসত্তা। হিন্দুধর্মের সঙ্গে রেষারেষি বলেই সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় গোঁড়ামি অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। ভারতের জাতীয়তা প্রত্যেক মুসলমান সম্প্রদায়ে র চোখে আজও হিন্দু জাতীয়তা হয়ে আছে। সমস্যাটা এখানে হিন্দুর সংস্পর্শে থেকে দূরে সরে থাকার জন্যেই সর্বাগ্রে তারা নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেয়। ধর্মই তাদের জাতিসত্তা। এর অর্থ হিন্দু জাতীয়তার মতো সমান্তরাল ধারায় মুসলমান জাতীয়তাও ৮০০ বছর ধরে ভারতে আছে। হিন্দু জাতীয়তার চেয়ে কোন অংশে তা ন্যূন নয়। এই রেষারেষি মনোভাবই তাদের যথার্থ ভারতীয় হওয়ার পথে বাধা। আসলে, এ এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সংকট। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে কোথাও তাদের ছোট করে দেখা হয়নি। বরং, অতি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সে প্রসঙ্গে পরে আসব। তা হলে, মুসলমানে এই সংক্ষোভ কেন?

প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষের মাটি, মানুষ ধর্ম, সংস্কৃতির মূলটা হিন্দুধর্মের গভীরে প্রোথিত। ভারতের আদি অকৃত্রিম ধর্ম হলো হিন্দু। ধর্মের ভিত্তিতে তাদের জাতি পরিচয়টা স্থির হয়ে গেছে। বহিরাগত মুসলমান শাসকেরা এ দেশে পা রেখেই বুঝেছেন হিন্দুরা নানা গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এবং তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা গোটা ভারতভূমিকে মুসলমান রাজ্য এবং মুসলমান ধর্মের দেশ করে তোলার স্বপ্ন দেখল। হিন্দুর ধর্ম মুছে ফেলতে মন্দির ভাঙা শুরু হলো। হিন্দুর দেব-দেবীর বিগ্রহও চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হলো। বড় বড় মন্দিরগুলো মসজিদে রূপান্তর করা হলো। ধর্মান্তরকরণের জন্যে নানারকম উৎপীড়ন অত্যাচার হতে লাগল। ইংরেজরা না

এলে হয়তো ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত হতো। লর্ড ক্লাইভের মুখে আমরা তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণকে বলেছিলেন পলাশী যুদ্ধের জয়, মুসলমানের নয়, ইংরেজের নয়, হিন্দুর। তোমরা দেবীর বোধন করে পলাশীর বিজয়োৎসব কর।

দুঃখের কথা, মুসলমান শাসকেরা ধর্মপ্রাণ হিন্দুর অভিমানকে, হিন্দু মনকে বোঝার কোন চেষ্টা করল না। বিদ্বেষবশতঃ তারা হিন্দুত্বকে ছিন্ন ভিন্ন করল। ধর্মের পৃথক অস্তিত্ব মুছে ফেলার জন্যে হিন্দুদের উপর জুলুম হলো ভয়ানক। হিন্দুদের হিন্দুয়ানিকে এভাবে নিশ্চিহ্ন করতে যাওয়া মুসলমানদের ভুল হয়েছিল। হিন্দু মনের সেই ক্ষত আজো সারেনি। হিন্দুর মন্দির, বিগ্রহ ভাঙা, ধর্মস্থান অপবিত্র করা হিন্দুরা ভালো মনে মেনে নেয়নি। মুসলমানদের আগ্রাসী মনোভাবই হিন্দুর মুসলমান বিরূপতার অন্যতম কারণ। সেই বিরূপ মনটা আর অনুকূল হলো না। অনেকটা কৌরব পাণ্ডবের বিবাদের মতো। সে প্রসঙ্গে পরে আলোকপাত করব।

বৃটিশ শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার আন্দোলনে হিন্দুরা মুসলমান শ্রেণীকে ডাকল না। তাদের সংস্রব মুক্ত হয়ে একাই আসমুদ্র ভারতব্যাপী যে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলল মুসলমান শ্রেণী তার কেউ নয়। এটা হিন্দুর দোষ কি না ভেবে দেখার বিষয়।

ভারতবর্ষের ধর্ম, সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতির ভিতটি হিন্দুধর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দুধর্ম অনন্ত শাখা-প্রশাখা নিয়ে বটবৃক্ষের মতো শাখামূলের উপর আলাদা আলাদা ভাবে ভর করে আছে। হিন্দুধর্ম অনন্ত বৈচিত্র্য নিয়ে কালে কালে নব নব রূপ লাভ করেছে। ভারতের মাটিতেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, তন্ত্র, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি। সবার জননী হিন্দুধর্ম। মত ও পথের ভিন্নতা যাই থাক, জননী এক হওয়ার জন্যে সর্বভারতীয় ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে, সংস্কৃতির মধ্যে জাতিগত সংহতি ও ঐক্য অবশ্যই আছে। জাতীয় দুর্দিনে এবং সংকটেই তা শুধু টের পাওয়া যায়। ইংরাজশাসিত ভারতবর্ষে-স্বাধীনতা যুদ্ধে এই ঐক্যের কাছে বিশ্বগ্রাসী ইংরেজকেও মাথা হেঁট করতে হয়েছিল। আশ্চর্য হওয়ার মতো কোনো ঘটনা এটা নয়। বটবৃক্ষের মূল কাণ্ডটি যে মাটি থেকে রস শোষণ করে– শাখামূলগুলোও সেই মাটির রস নেয়।

ধর্মই ভারতের জাতিত্ব এবং জাতীয়তা নির্ণয়ের মাপকাঠি। ধর্মের অর্থই হলো, যা আমাদের সমগ্র জীবনকে 'ধারণ' করে থাকে। সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, গৃহনীতি, ঐহিকতা ও পারত্রিকতা সবই আমাদের বৃহত্তর জীবনের অন্তর্ভুক্ত। জাতীয়তাও বৃহত্তর ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারতের জাতিসত্তা ও জাতীয়তা বলতে হিন্দু জাতীয়তাই বোঝায়। তবু ৮০০ বছর ধরে মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার নিয়ে আর একটা আলাদা জাতিসত্তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষে। ধর্মের ভিত্তিতে তাই ভারতবর্ষ দুটুকরো হলো। মুসলিম জাতিসত্তা রক্ষা করতে মুসলিমরা ভারতের অভ্যন্তরে নিজেদের ধর্ম ও জাতিসত্তা রক্ষার জন্যে তারা এক স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করল।

বলাবাহুল্য, সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি নিয়ে ভারতের নিজস্ব হিন্দু জাতীয়তাবোধটি

অনেকদিন ধরে আর্য-অনার্যের সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল। ভাবান্তরের পালা সেও দুই গোষ্ঠীর সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছিল। চিত্তমুক্তির পথ ধরেই অনার্য দেব-দেবী, বেদমূলক হিন্দুদের সভায় নিজের একটা আসন করে নিয়েছিল। এভাবে ঋগ্বেদের তেত্রিশ দেবতা হলেন তেত্রিশ কোটি। এই সমন্বয় সংমিশ্রণ শুধু ধর্মমতে হলো না ব্যবহারিক জীবনে ভাবের আদান-প্রদানের দিকে প্রসারিত হয়ে গেল। আর্যেতর মানুষের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধন, আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং বন্ধুত্বের আকর্ষণে আর্যরা অনার্য শ্রেণীর ঘরের লোক হয়ে উঠল। রেষারেষির তাপ কমল। সমাজে ও জীবনে ভাবান্তর প্রত্যক্ষ হলো। বিরোধের মধ্য দিয়ে আর্যদের সঙ্গে অনার্যের রক্তের বন্ধন ধর্মের মিলন এক মিশ্র সংস্কৃতি চেতনা ও আধ্যাত্ম অনুভূতি সৃষ্টি করল। উভয় গোষ্ঠীই স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে এক ধর্মের বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিল। হিন্দু ধর্মের আনুগত্যে জাতিবন্ধন ঘটেছে বলে একে হিন্দু জাতীয়তা নামে অভিহিত করা হয়েছে। বিকাশমান জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই হিন্দু-সভ্যতার বিস্তৃতি। ভারতের জাতীয়তার সর্বভারতীয়বোধটি হিন্দুধর্মের উপর দাঁড়িয়ে।

অপরপক্ষে, মুসলমান সম্প্রদায়ও নিজের আচার প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার ও ধর্মমত আলাদা এক জাতিসত্তা নিয়ে ভারতে বসবাস করছে। যদিও এদের বারো আনা মানুষ হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে এসেছে, তবু হিন্দু-মুসলমানের ভাবগত সংস্কৃতিগত অভিযোজন ঠিকভাবে হয়নি। কারণ, এদেশের মুসলমানদের বড় অংশ ধর্মান্তরিত হিন্দু। এই হিন্দুরা নীচ বংশোদ্ভূত অপাংক্তেয় মানবশ্রেণী। এরা অত্যন্ত অভাবী এবং দরিদ্র। বর্ণাশ্রম প্রথার শিকার। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অপমান, অসম্মান, অমর্যাদা এবং হেনস্তা নিয়ে অত্যন্ত সসংকোচে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস করত। কিন্তু তাদের কোনো ধর্মীয় অধিকার ছিল না। হিন্দুর মন্দিরে ঢোকা তাদের নিষিদ্ধ ছিল। মুসলমান অভিযানের পর এই শ্রেণীর হিন্দুদের অসহায়তা, দুর্বলতা এবং দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করা হল। মুসলমান হওয়ার পরেও তারা অচ্ছ্যুৎ রয়ে গেল। ধর্মান্তরিত হওয়ার লজ্জা, অপরাধবোধ তাদের সংকুচিত করে রাখল। হিন্দুদের সঙ্গে মিশে যেতে পারল না। সর্বদা একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলল। অর্থাৎ, ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও তারা অচ্ছ্যুৎভাবটা কাটিয়ে ওঠতে পারল না। তাদের আচরণেও কোনো পরিবর্তন হল না। কাজেই, একে হিন্দুদের মুসলমান বিরূপতা বলে ভাবার কোনো কারণ নেই। হিন্দু ধর্মের মধ্যেই যে বিবাদ বিভেদের প্রাচীর ছিল ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে তা ভেঙে ফেলা গেল না। তবে ঐ বিরূপতার রন্ধ্রপথ ধরে পরবর্তী প্রজন্মে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের মনে সংক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল তা কালক্রমে মূদের আগ্রাসী করে তোলে। অচ্ছ্যুৎ হিন্দুদের ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির কোনো যোগসূত্র গড়ে ওঠেনি। তাই খুব তাড়াতাড়ি নতুন ধর্মমতের প্রভাবে হিন্দুধর্মের প্রতি পরবর্তী প্রজন্মে এক আগ্রাসী মনোভাবের জন্ম নেয়। মুসলমান ধর্মান্ধতা এবং মৌলবাদ একে মদত দিয়েছিল। একথা বলা বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে, মুসলমান

ধর্মান্ধতা এবং মৌলবাদের জঙ্গিরূপই দুই সংস্কৃতির সমন্বয়ের অন্তরায় হয়েছে। ধর্মান্তরিত হিন্দুদের মনে হিন্দুমূল্যবোধকেই সংহার করা হয়েছে। ফলে আর্য-অনার্যের মতো সংঘাত-সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মধ্যে চিত্তমুক্তির পথ ধরে অগ্রসর হয়নি হিন্দু-মুসলমান জনসংঘ। যা হয়েছে তাও নগণ্য।

বলাবাহুল্য, ভারতবর্ষে ধর্ম যেহেতু জাতিত্বের পরিচয়পত্র, সেহেতু মুসলমান ধর্মের ওপর মুসলমান জাতীয়তাবোধের সৌধ তৈরি হয়েছে। এর সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের কোন যোগসূত্র নেই। বিনিসুতোর মালার মতো ভারতের জাতীয়তার সঙ্গে ঝুলে আছে। একটু নাড়া লাগার জো নেই। তা-হলেই মালা ছিঁড়ে সুদূর আরব দেশের সঙ্গে তাদের ধর্ম-সংস্কৃতির নিকট আত্মীয় সম্পর্ক বেরিয়ে পড়বে। মৌলবাদীদের জঙ্গি মনোভাবই হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ককে সুস্থ ও সুন্দর হতে দিচ্ছে না। এবং মুসলমান জাতীয়তায় ভারতীয়বোধের ছোঁয়া কতখানি লেগেছে তা বিচারসাপেক্ষ। একথা বলা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, ভারতের অধিকাংশ মুসলমান মনের দিক থেকে পাকিস্তানের নিকটতম প্রতিবেশী। ধর্ম ও সংস্কৃতিগত ঐক্যই এই নৈকট্যের হেতু। রাতারাতি দেশ-বিভাগ করে তাদের আলাদা করে দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মনের উপর তো আর পার্টিশনের দেওয়াল তুলে দেওয়া যায় না। তা-ছাড়া এদেশ-ওদেশের মানুষের সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক, বন্ধুত্ব সম্পর্ক তো ভারত বিভাগের অনেক আগে থেকে আছে। দেশ ভাগাভাগির সঙ্গে সেই সম্পর্ক তো আর ছিন্ন হয়ে যায়নি। শুধু এই কারণেই ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় খাঁটি ভারতীয় হতে পারছে না বলে আমার ধারণা। এই অপ্রিয় সত্য ঘটনাটি আজ কোনোভাবে আর চাপা নেই।

এজন্যে ভারতের সংবিধানই দায়ী। বিভেদের বিষবৃক্ষের বীজটি ভারতের সংবিধানে বপন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মুসলিম ও নন্-মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের জন্যে সংবিধানকে খুব মোটা দাগে দু'ভাগ করা হয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, খৃস্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীরাই নন্-মুসলিম। সংবিধানে মুসলমান সম্প্রদায়কে আলাদা মর্যাদা দেওয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। ইংরেজদের মতো ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নিজেদের স্বার্থে সংবিধানে এই বিষাক্ত চারাগাছটির মূলে জলসেচন করেছে। সাংবিধানিক কাঠামোতে উভয় সম্প্রদায়ের বিভেদ ও বিরোধকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এর ফলে ভারতীয় গণমানসে এক মনস্তাত্ত্বিক সংকট সূচিত হয়েছে। এ থেকে উত্তরণের পথ খোলা নেই।

দুর্ভাগ্য, ধর্মনিরপেক্ষ, রাষ্ট্র, ধর্ম নিয়েই বেশি ব্যতিব্যস্ত। অথচ সংবিধানের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল ভারত রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই ভারতীয়। এটাই হলো তাদের একমাত্র জাতিসত্তা। কার কি ধর্ম, রাষ্ট্রের কাছে সেটা জ্ঞাতব্য বিষয় নয়। সংবিধানের চোখে সবাই সমান। তথাপি, ভারতের সংবিধানে সেই নির্মম পরিহাসকেই তোয়াক্কা করা হয়েছে। প্রত্যেকের আব্দার মেটাতে আর সন্তুষ্ট করতে এমন সংকট সৃষ্টি হয়েছে যা থেকে

মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। ভারত ছাড়া বিশ্বের সব রাষ্ট্রে সমস্ত জাতি এবং ধর্মের মানুষের জন্যে এক আইন। আইন কখনো দু'রকম হয় না। এই ধরনের আইনের বৈধতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় ও সুপারিশ আমাদের শাসকবর্গ ভোটের স্বার্থে বাতিল করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি। নিজের স্বার্থে বৃটিশ যে, বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেছিল, ভারতীয় সংবিধান তাকে উপড়ে না ফেলে আইনের বেড়া দিয়ে নিরাপদে বাড়তে দিল। এখন তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ডালপালা মেলে দিয়ে নিত্য নতুন সংকট ও সমস্যা তৈরি করছে। ইংরেজের বশংবদ স্বদেশি সরকার গদির লোভে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছে। সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা এবং গোষ্ঠীস্বার্থ নিয়ে গোটা ভারতবর্ষ আজ রণক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে। নানা স্বার্থের সংঘাত, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যালঘু তোষণ এবং বিরোধীপক্ষকে জব্দ করার মনোবৃত্তিই জাতীয় সংহতি বিপন্ন করছে। বলতে কি, ভারতীয় সংবিধানই জাতীয় সংহতি সংহার করছে। এর ফলে, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার মানে দাঁড়ায় সকল ধর্মের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন। অর্থাৎ ধর্মকেই খুশি রাখতে হবে। কেউ গোঁসা করে না যেন। এই নীতির দরুন, মুসলমান, হিন্দু, শিখ সকলেই ঘাড়ে চেপে বসেছে। অযোধ্যার সমস্যাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সংবিধানের কারণে জাতীয় জীবনে এমন ক্ষণভঙ্গুর অবস্থা। জাতীয় সংহতির ভাঙন ধরেছে বলেই দেশের গায়ে একে একে ফাটল দেখা দিচ্ছে ; বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং ভাষাভাষীর মানুষ পাশাপাশি মিলেমিশে থাকতে গেলে যে সংহতিবোধ ও আত্মীয়তাবোধ প্রয়োজন ভারতীয় সংবিধান তার দাবি মেটাতে পারছে না। অথচ একদিন' এই বৃহৎ ভারতবর্ষে আমরা সব সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে একসঙ্গে তো ছিলাম। কিন্তু আজ এত অসহিষ্ণু হয়েছি কেন— এ প্রশ্ন কেউ করি না।

ইংরেজ রাজত্বে আমাদের বিচ্ছিন্নতা, অনৈক্য, স্বার্থ-সংঘাত এমন উগ্র ছিল না। সে সময় আমরা একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলাম। প্রতিবেশীসুলভ সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্য ছিল। কিন্তু যেই স্বাধীন হলাম অমনি হৈ হৈ করে স্ব স্ব স্বার্থ সম্পর্কে এমন অতিমাত্রায় সকলে সজাগ হয়ে উঠল যে আমার ধর্ম, আমার ভাষা, আমার সংস্কৃতি, আমার ঐতিহ্য, আমার ভূ-খণ্ড রব তুলে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল।

নবীন ভারতের নরম মাটিতে নিঃশব্দে মহাভারতের আর এক কুরুক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। ভারতের শাসকবর্গ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রে মত। তাকে সুপরামর্শ দিয়েও প্রতিকার কিছু করা যাচ্ছে না। পাছে ভোট হারায়, এই ভয়ে অন্যায়কে তোষণ করছে। দুঃখের কথা তাঁরা জনগণের মন বোঝেন না। তাঁরা দুর্যোধনের মতো শুধু কর্তৃত্ব চান। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হচ্ছে, আর একটা লঙ্কাযুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ না হয়ে থামবে না।

ভারতে এখন যা হচ্ছে তা পাঁচ হাজার বছর আগের রামায়ণ এবং মহাভারতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনার সূত্রে রামায়ণ মহাভারতের প্রধান প্রধান দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও সংঘাতের ঘটনাগুলি দৃষ্টান্তরূপে

তুলে ধরা যায়। রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান নিয়ে উপন্যাস রচনার সময় আমি একালের ভারতকে তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। সময়ের থেকে পিছিয়ে নয়, বর্তমানকে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে উপন্যাসগুলো লেখা বলে একালের মূল্যবোধের আলো পড়ে চরিত্র ও কাহিনী দুই উজ্জ্বল হয়েছে। আসলে, জীবনের মূল সমস্যাগুলো এক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপান্তর ঘটে মূল্যবোধ বদলে যায়, কিন্তু গভীরতা কমে না। তাই হয়তো উক্ত মহাকাব্যদ্বয়ের জনপ্রিয়তা পাঁচ হাজার বছর পরেও কমেনি। টি ভি সিরিয়ালে রামায়ণ, মহাভারত মুসলমান মনকেও ছুঁয়েছিল। হিন্দুর ধর্মোপাখ্যান বলে বিদ্বেষ বশে কেউ বর্জন করেনি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় জাতীয় সংহতি এবং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপনের ক্ষেত্রে উক্ত মহাকাব্যদ্বয় একটা ভূমিকা নিতে পারত হয়তো অনেক মুসলমান শাসক নিজে এবং অন্যকে দিয়ে রামায়ণ-মহাভারত মুসলমানী বাংলা ভাষায় রূপান্তর করেছেন। মুসলমান মনের এই ভারতীয় সংস্কৃতি-প্রীতিকে উৎসাহ দেওয়া হয়নি। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই মনের উৎস শুকিয়ে গেছে।

সে যাই হোক, লোকে পুরাণকে এখনও বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে। পুরাণের গল্প তাদের কল্পনাকে নাড়া দেয়। কারণ মানুষ এবং সমাজের বিবিধ দ্বন্দ্ব সংঘাতের ভিতটা বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে। তাই অতীত থেকে পাঠ নেওয়ার জন্যে পুরাণ ঘটনাকে বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এ ধরনের দৃষ্টান্ত সাধারণভাবে চিরন্তন বিশ্বাসের এবং সংস্কারের যেমন অনুমোদন চায়, তেমনি চায় ইতিহাস ও বাস্তবের সমর্থন। তা-ছাড়া একটা নতুন মূল্যবোধ সেকাল ও একালের মিলনসেতু রচনা করে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতের দুটি প্রধান ধর্ম হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ ও সংঘর্ষের জঙ্গি মনোভাব এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে যে কোন মুহূর্তে ভারতের মাটিতে লঙ্কাযুদ্ধ কিংবা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মতো একটা ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী সংঘাত বেধে যেতে পারে। এরকম একটা সংঘর্ষ না হওয়া পর্যন্ত এই বিবাদের নিষ্পত্তি হবে না। দুটো ঐতিহ্যবাহী ধর্মমত স্ব স্ব অস্তিত্ব রক্ষার আগুনে প্রতিহিংসা বিদ্বেষের ধুঁয়া দিয়ে যাচ্ছে। ভুললে হবে না, লঙ্কাযুদ্ধ কিংবা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সাধারণ মানুষের কোনো লাভ হয়নি। মহাশ্মশানের বুকে রাজ্যপাট করতে রাম বিভীষণ কিংবা যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ কারো ভালো লাগেনি। ধর্ম মানুষকে নানা দুঃখ যন্ত্রণা ছাড়া কোন শান্তি সুখ দিতে পারে না।

লঙ্কাযুদ্ধের জন্যে আমি রামকেই দায়ী করি। রাম বকধার্মিক সেজে রাবণের রাজ্যে নাক গলালো। আর্যদের ঐ বদ অভ্যাসটির জন্যে আনার্য অধ্যুষিত ভারতে যত অশান্তি আর গণ্ডগোল। এটা রাবণের কাছে বিরক্তিকর ছিল। রামের অভিসন্ধি রাবণের ভালো লাগেনি। তবু রাগ, ক্ষোভ, বিদ্রোহ প্রকাশে সে সংযত ছিল। কিন্তু ভগিনী সূর্পনখার নাক কেটে লক্ষ্মণ তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিল। লক্ষ্মণের নারী নির্যাতনের অপরাধ কেউ নির্দে করল না। ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ রাবণ ভগ্নীর অপমানের পাল্টা প্রতিশোধ নিতে সীতা হরণ করল। অমনি চারিদিকে ছিঃ ছিঃ পড়ে গেল। রামায়ণ পাঠকেরা বিচার না করে অন্ধের মতো

রাবণকেই দোষী করল। রাবণের পাশে দাঁড়িয়ে সুবিচার প্রার্থনার মানুষ নেই। ভাই বিভীষণও রাজ্যের লোভে শত্রুপক্ষের নেতা রামের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশ, জাতি এবং ভাইয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। রামের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সেও বলল, অধর্মচারী ভাইয়ের মুখদর্শন করা এবং সংস্রবে থাকাও পাপ। অতএব, রামচন্দ্র যুগ যুগ জিয়ো।

রামায়ণ শুধু কাব্য নয়, ধর্মগ্রন্থ নয় — ভারতবর্ষের জাতীয়তার ইতিহাস। একটু চোখ খুলে রাখলে একালের ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা কঠিন কিছু নয়। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে হিন্দুরা যখন ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার গণঅন্দোলন করছিল তখন মুসলমান রাজনৈতিক নেতারা সেই সংগ্রামের শরিক না হয়ে বিভীষণের মতো ইংরেজ শিবিরে ভিড়ল। তাদের অনুকম্পা নিয়ে এদেশের শাসক হতে চাইল।

অপরপক্ষে, অযোধ্যার রামমন্দির নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ অনেকটা রাবণের সীতা হরণের অপবাদের মতো হিন্দুদের দোষী করা হলো। অথচ, যে মুসলিম শাসক বিদ্বেষবশত মন্দিরের চূড়া ভেঙে তার উপর গম্বুজ বসিয়ে মসজিদ করল — সেটা দোষ বলে গণ্য হলো না। এই ভাঙা-গড়া হলো মুসলমান শাসকের রাজত্বকালে। রাজার মর্জির প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না কারো। কিছু যদি হয়েও থাকে, ইতিহাসের পাতায় তার কোন নজির আমার জানা নেই। সাত-আট'শ বছর ধরে হিন্দুরা নিরুপায় হয়ে অসহায়ভাবে মেনে আসছে বলেই সেটা মসজিদ হয়ে থাকবে এটা কোনো কাজের কথা নয়। কোনো এক প্রাচীনকালে একদল লোক কি অবস্থায় বাধ্য হয়ে একবার মেনে নিয়েছিল বলে চিরকালের মতো সে ব্যাপারটা চুকে গেল তা নয়। দীর্ঘকাল পরে যদি কারো চোখ খুলে যায়, নিজের জিনিস বলে দাবি করে — তাহলে দোষ হবে কেন?

বহুকাল পরে তিব্বতকে চীনের ভূখণ্ড বলে হঠাৎ চীন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা যদি অপরাধ না হয়, তা'হলে অযোধ্যা মন্দিরকে হিন্দুর মন্দির বলে স্বীকার করতে বাধা কোথায়? বাধা হলো ভোটের। হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে রাজনৈতিক দলগুলো দেখে না। মুসলিম ভোটের ফলাফল দিয়ে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ণয় হয় বলেই, রাজনৈতিক দলগুলির নির্লজ্জ মুসলিম তোষণকে হিন্দুরা সহ্য করতে পারছে না। মুসলমানদের ওপর হিন্দুর বিরূপ হওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিই কার্যত দায়ী। এই দলগুলি কেউ দেশের কথা ভাবে না। কর্তৃত্ব অর্জনের জন্যে বিভীষণের ভূমিকা নেয় তারা। তাই দেখি এ কালের বিভীষণেরা ভোট পাওয়ার লোভে, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং নিজের গদি অটুট রাখতে নানা গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দুদের ভেতর বিবাদ বাধিয়ে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার জন্যেই জাত-পাতের রাজনীতি করতে মণ্ডল কমিশনকে হিমঘর থেকে হঠাৎ বার করে আনল। অগ্রসর অনগ্রসর বিরোধ পাকিয়ে মন্দিরের উপর হিন্দুর অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে দুর্বল করার এক ষড়যন্ত্র করল। গ্রহণযোগ্য ইতিবাচক সমাধানের কোনো চেষ্টা না করে তাকে জটিল করে ফেলল।

মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও এক হারানো পুরনো অধিকার ফিরে পাওয়ার স্বার্থেই হয়েছিল। অধিকার কখনো পুরনো কিংবা চিরতরে বাতিল হয় না, একদিন কোন এক অবস্থায় যে অধিকার হারাতে হলো বলে তাকে আর দাবি করা যাবে না এমন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। হারানো অধিকার পুনরায় দাবি করা অথবা তার জন্যে সংগ্রাম করা কোন অপরাধ নয়। আফ্রিকার ওপর জন্মগত দাবি ও অধিকার ফিরে চাওয়ার জন্যে কালো মানুষের মরণ-পণ সংগ্রামকে কেউ অন্যায় বলে না। মহাভারতে চোদ্দ বছর পরে পাণ্ডবেরা যে ইন্দ্রপ্রস্থ দাবি করল সেই ছিল তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার। কিন্তু কায়েমি স্বার্থ তাদের দাবি মানল না বলে যুদ্ধ হলো। অযোধ্যার রাম মন্দির নিয়ে বিরোধ অনেকটা কৌরব-পাণ্ডবের প্রাক্‌কুরুক্ষেত্রের মীমাংসাহীন পর্বে থমকে থাকল। যে-কোন মুহূর্তে রামমন্দির নিয়ে বড় কিছু ঘটতে পারে দুই ধর্মের মানুষের ভেতর।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রধান কারণ ত্যাগ ও সহমর্মিতার অভাব। আত্মীয়ে আত্মীয়ে যে স্পর্শকাতর সম্পর্ক থাকে তাকে পরম মমতার হৃদয় খুঁড়ে যদি কেউ দেখতে না শেখে তারা দুর্যোধন, দুঃশাসন হয়ে যায়। যাই হোক, দুর্যোধন বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবদের সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়ল না বলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হলো। অধিকার, কর্তৃত্ব সামান্য ত্যাগ করলে যে যুদ্ধ বন্ধ হতো, কৌরবপক্ষের অনমনীয়তায় তা অনিবার্য হলো।

স্বাধীন ভারতেও জাতি, বর্ণ, ধর্ম, নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সম্প্রদায়ের ধর্মের লোক বিনা সংঘর্ষে কেউ কাউকে সূচ্যগ্র ভূমি দিতে নারাজ। রামমন্দির নিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধ, পাঞ্জাব নিয়ে শিখদের জেহাদের মূল কথা—ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন জাতিসত্তা গড়ে উঠতে পারে না। কারণ, যে, দেশের জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে ধর্মের উপর, সে দেশের মানুষের কাছে সবার উপরে ধর্ম সত্য। অপরদিকে, দার্জিলিং-এ গোর্খারা, ঝাড়খণ্ডে ঝাড়খণ্ডীরা, অসমে আলফারা জাতিগত ভূমির দাবিতে সূচ্যগ্রভূমি অন্যজাতকে দেবে না। দেশের সম্পদকে অন্যরাজ্যে যেতে দেবে না। তাদের স্লোগানই হলো — 'রুটি আগে, মাটি পরে'। দেশের নেতাদের মুখে দেশের ও দশের চাইতে দেব-দেবী ঠাকুর দেবতার কথাই বেশি। একদিন স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ারে দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে তাঁরা গাইলেন — "তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।" ধর্মীয় চেতনাকে উস্কে দিয়ে যে দেশের জাতিসত্তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হয় সে দেশের মানুষ ধর্ম এবং জাত নিয়ে হানাহানি, খুনোখুনি, বিশৃঙ্খলা করে যদি আর একটা কুরুক্ষেত্র বাধে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বলা যেতে পারে, ভারতের মাটিতে পাঁচ হাজার বছর আগের সেই প্রাক যুদ্ধকালীন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের লক্ষণগুলো আবার সূচনা হয়েছে।

ভারতবর্ষের নিজস্ব জীবনধারার ছন্দে বিকাশমান জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অনেকদিন ধরে অনেক মাজাঘষা করে রামায়ণ-মহাভারত রচিত হয়েছে বলেই ভারতের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, স্বভাব-চরিত্র, ধর্ম এবং বিবিধ সমস্যামূলক ঘটনা বিরোধ, বিভেদ, দ্বন্দ্ব একটা সার্বজনীনতা পেয়েছে। যথার্থ জাতীয় মহাকাব্য হয়ে উঠেছে। হাজার হাজার বছর

পরেও তার মূল্য একটুও কমেনি। বরং স্বাধীন ভারতে যা ঘটছে তা তো রামায়ণ মহাভারতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে।

আধুনিক মহাভারত রচনার শুরুতেই হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে দুই ভিন্ন জাতি। এই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত দ্বিখণ্ডিত হলো। মহাভারতে যেমনটা হয়েছিল দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার পরে। পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরের উপর তাদের উত্তরাধিকার দাবি করল। কৌরবেরা বললে : হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদের কোনা জায়গা হবে না। পাণ্ডবেরা বললে: তারাও কৌরবের সঙ্গে থাকবে না। তাদের ভাগের ভাগ মিটিয়ে দেওয়া হোক। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র বলল : হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদের ঠাঁই না হওয়া ভালো। ওরা আলাদা হতে চায় হোক। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এক বংশের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডব এবং কৌরব আলাদা হয়ে গেল। পাণ্ডবদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিতে কুরুসাম্রাজ্যের একটা অংশ কেটে আলাদা করে পাণ্ডবদের দেওয়া হলা। হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মেটাতে ইংরেজ যেমন এদেশটাকে কেটে দুটুকরো করেছিল, পাণ্ডবেরা এক বংশের, এক পরিবারের সন্তান হয়েও কৌরব পরিচয় নিয়ে হস্তিনাপুরে থাকতে রাজি হলো না। তাদের জন্য এক পৃথক ভূখণ্ড চাইল। যেমন ভারতবর্ষে আটশ বছর ধরে বাস করেও মুসলমানশ্রেণী মনেপ্রাণে ভারতীয় হলো না। ইংরেজরা দেশ ছাড়তে যখন প্রস্তুত মুসলমান সম্প্রদায় তাদের জন্যে এক পৃথক ভূখণ্ড দাবি করল তখন। তার কারণও এক। হিন্দুদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা অসম্ভব। বৃটিশরা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বলল: ওরা যখন আলাদা হতে চায় হোক। এক দেশের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তারা ভারত থেকে আলাদা হয়ে পাকিস্তান নামে এক নতুন রাষ্ট্রের পত্তন করল।

ঘটনার শেষ নয়, শুরু। মহাভারতে এই ভাগাভাগি কৌরব সাম্রাজ্যের মুকুটহীন সম্রাট ভীষ্মের নীরব সম্মতিতেই হয়েছে। ভীষ্ম একটু কঠোর হলে সেই মুহূর্তে দ্বিজাতিতত্ত্বকে গলা টিপে হত্যা করতে পারত। হস্তিনাপুরের কুরুবংশের সন্তানদের অন্য কোন জাতিসত্তা কিংবা বংশপরিচয় থাকতে পারে না। তারা এক পরিবার এবং এক বংশধারার অন্তর্ভুক্ত। কৌন্তেয়রাও কৌরব। কেউ সেই সহজ কথাটা স্পষ্টবক্তা সত্যভাষী পিতামহ কঠোর ভাষায় বলতে কেন দ্বিধা করেছিল তিনি জানেন। তাঁর ভুলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঠেকানো গেল না। জীবন দিয়ে তাঁকে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো।

নব মহাভারতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। স্বাধীন ভারতবর্ষকে বৃটিশ যখন ভেঙে দুটুকরো করল তখন পিতামহের মতো ভারতের বাপুজি এই বিভাগকে নিরুপায় হয়ে অনুমোদন করেছিলেন। তাঁর অনুমোদন ছাড়া ভারত বিভাগ হতো না। অথচ, একমাত্র তিনিই সকলের মুখের ওপর স্পষ্ট করে বলতে পারতেন আমাদের এই ভারত রাষ্ট্রের সকল অধিবাসী একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। তাদের একমাত্র পরিচয় ভারতীয়। কোন অজ্ঞাত কারণে নেহরুর মুখের উপর বলতে দ্বিধা করলেন — কার কী ধর্ম রাষ্ট্রের কাছে সেটা জ্ঞাতব্য বিষয় নয়। যারা মনে ভাবছে ভিন্ন ধর্মীয় বলে তারা ভিন্ন জাতিভুক্ত দেশ

ভাগাভাগির মুহূর্তে তাদের এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। বোধ হয়, নিজের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে কঠোর ভাষায় কঠোর কথাটা বলতে দ্বিধা করেছেন। বাপুজি যদি ঐ কথাগুলো একবার বলতেন তা হলে নব-ভারতে আর একটা প্রাক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হতো না। এ থেকে প্রমাণ হয়ে গেল ইতিহাসের শুধুই পুনরাবৃত্তি হয়।

নব মহাভারতের আর এক সমস্যা মাইনরিটি। পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপ এবং বিদুর সকলে পাণ্ডবদের মাইনরিটি বলে তোয়াজ করে চলতেন। পাণ্ডবেরা কৌরবদের বিরোধীপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও মাইনরিটি বলে তাদের সব দাবি ও আব্দার মেটাতেন তাঁরা। দেশবিভাগের পরে ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপের মতো বাপুজি, নেহেরু প্যাটেল সকলেই ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে মাইনরিটি নামক রক্ষাকবচ পরা মুসলিম সম্প্রদায়কে ভোটের স্বার্থে তোয়াজ করে চলেছেন। শুধু একটি মাত্র ধর্মসম্প্রদায়েরই ওজর-আপত্তি, অকাতরে মানা হচ্ছে, কিন্তু অন্য মাইনরিটির ধর্ম সম্প্রদায়ের দিকে ফিরেও তাকানো হচ্ছে না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধর্মে ধর্মে এ বৈষম্য কেন? সুদূর অতীতে মহাভারতেও এমনটা হয়েছিল তার কথা বলেছি। পাণ্ডবদের প্রতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ যেরকম পক্ষপাতমূলক আচরণ করতেন কৌরবদের প্রতি সেরকমটা করতেন না। ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রে মুসলমানদের জন্যে এক আইন এবং ভারতের অন্যধর্মের মানুষ যাঁরা নন-মুসলিম তাঁদের জন্যে আর এক আইন। পিতামহর নিরপেক্ষতা আর ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতার মধ্যে তফাত নেই। এভাবে গোটা মহাভারতের দৃষ্টান্ত দিয়ে ভারতবর্ষের মধ্যযুগ আর আধুনিক যুগের ইতিহাসের তুলনামূলক মূল্যায়ন কোন কঠিন কাজ নয়।

নব মহাভারত গঠনের প্রথম পদক্ষেপ হবে সংবিধান সংশোধন করা। কার ধর্মের ভাবাবেগে কোথায় একটু আঘাত লাগল তার প্রতিক্রিয়া ভোটবাক্সে কতখানি পড়ল দেশের বৃহত্তম স্বার্থের কাছে তা নিতান্ত গৌণ। দেশের স্বার্থকে সবার ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে।

দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাসকারী সব মানুষের জাত একটাই। সেই জাতিত্ববোধটাই তার জাতীয়তা। দুঃখের কথা, প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল মাইনরিটির রক্ষাকবচের আড়ালে একটা সম্প্রদায়কে দীর্ঘকাল ধরে তোয়াজ করার নীতি বদলাতে হবে। জাতীয় স্বার্থে গোটা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত করতে জাতি, বর্ণ ও ধর্মের মধ্যে রেষারেষি কমাতে, রাজ্যগুলির বিচ্ছিন্নতা রুখতে, সন্ত্রাসের পথ থেকে সুস্থ জীবনস্রোতে ফেরানোর জন্যে যা করলে ভালো হয়, দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়, সৌহার্দের পরিবেশ গড়ে ওঠে তার জন্যে রাজনৈতিক দলগুলিকে ভোটের কথা ভুলে জনগণের মনকে বোঝার জন্যে বেশি সময় দিতে হবে।

ধর্ম, মাইনরিটি অনগ্রসর শ্রেণীর স্পর্শকাতর প্রশ্নগুলো গুরুত্ব দেওয়ার নাম করে সস্তা রাজনীতির চমক রাজনৈতিক দলগুলোকে ছাড়তে হবে। রাজনৈতিক দলগুলিই দেশের সংহতির সংহার করছে। দেশসুদ্ধ মানুষ ছোট ছোট গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। মন ছোট

হয়ে গেলে দেশ ছোট হয়ে যায়। দেশের প্রতি তখন মমতা থাকে না। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, অসম তার দৃষ্টান্ত। ছোট মন নিয়ে বহুজাতি, ভাষাভাষি এবং ধর্মের দেশ ভারতবর্ষে বাস করা যায় না। মনকে বড় ও উদার করার জন্যে জাতীয় সরকারকে বিশ্বাসযোগ্য ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সত্যিকারে এক দেশ, এক জাতি, এক রাষ্ট্র স্থাপনের জন্যে চাই সরকারের বিশ্বাসযোগ্য ভূমিকা এবং নিরপেক্ষ ন্যায়নীতি। কিন্তু সেরকম যোগ্যব্যক্তি ভারতে কোথায়? দেশে আজ বিরাট ব্যক্তিত্বের অভাব। ব্যক্তিত্বের শূন্যতার জন্যে দেশব্যাপী এই নৈরাজ্য, হতাশা, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, হানাহানি, রক্তারক্তি। রাজনৈতিক দলগুলি নেতৃত্বের অভাবে ধুঁকছে। নব মহাভারতের শান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, সৌভ্রাত্র গড়ে তোলার জন্যে শক্ত হাতে দেশের হাল ধরার জন্যে কৃষ্ণের মতো পুরুষোত্তমের আবির্ভাবের দিকে সারা দেশ সকাতরে তাকিয়ে আছে। নব মহাভারত রচনায় কৃষ্ণকে জাতির বড় দরকার আজ।

পরিশেষে বলব, কোন ধর্মের মানুষকে আঘাত করা কটাক্ষ করা, কিংবা পক্ষপাত দেখানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিনি। ঐতিহাসিকভাবে যা সত্য অকুণ্ঠচিত্তে তাকে উদঘাটন করে বিভ্রান্তি থেকে দেশবাসীকে সতর্ক করার কথাটা বোঝাতে চেয়েছি। কারণ আমি খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সংখ্যালঘু ধর্মের মানুষ যতক্ষণ না মনে করছে তারা ভারতেরই নাগরিক ততক্ষণ এদেশে শান্তি আসবে না, আসতে পারে না। অপরপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে সংখ্যালঘুরা বিপন্ন মনে করে। অন্ধ গোঁড়ামি বর্জন করে সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের উচিত নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে পরস্পরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করা। পরমতসহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, বিশ্বস্ততা হলো ভারতের জাতীয়তার মূলস্বরূপ তার প্রতি অনুরক্ত করে তোলার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে একমাত্রই রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি। কিন্তু তাদের ভূমিকাই সন্দেহজনক। বিচ্ছিন্নতার বিষ, তারাই ছড়াচ্ছে। পাছে কপটতা প্রমাণ হয়ে পড়ে তাই জাতীয়তা বিপন্ন হওয়ার সব দোষ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ও ধর্মান্ধতার ওপর চাপিয়ে দেওয়ায় তাতে মৌলবাদীদের হাত শক্ত হয়েছে। সে যাই হোক, কে কতটা দায়ী আর দোষী সে বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে ভারতের সব বর্ণের ও ধর্মের মানুষ এবং রাজনৈতিক দল ও ধর্মসভাগুলির উচিত সবরকম বিবাদ মুক্ত হয়ে পরস্পরের ধর্মকে সম্মান করা, ভালোবাসা এবং পরস্পরের হারানো বিশ্বাসকে ফিরে পাওয়ার বিশ্বাসযোগ পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ কাজে ব্যর্থ হওয়া মানে আর একটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া। পচা গলা কবন্ধ শবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ধর্মপ্রাণ গান্ধারী যেমন ধর্মধ্বজী কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিল তেমনি ক্রুসেড যুদ্ধে নিহত উভয় ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের জননীরা অভিশাপ দেবে মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর রাজনৈতিক দল এবং তাদের বশংবদ মৌলবাদী ধর্ম সংঘগুলিকে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় মঙ্গলাচরণ করি —

"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ।"

# ভবের হাটে ভাবের মিলন হবে কবে

ইদানীং পথচলতি একটা কথা প্রায় শোনা যায়, 'আমি ধর্ম মানি না, ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই। আমি একেবারে নাস্তিক।' এ ধরনের কথা বলে অনেককে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে দেখেছি। নিজেকে প্রগতিশীল বলে জাহির করার জন্য এঁরা ঘোরতর নাস্তিকের তকমা এঁটে বেড়ান। দুঃখের কথা, যে বিশ্বাস নিয়ে প্রকৃত নাস্তিক হয়ে ওঠা যায় সে বিশ্বাস এবং শক্তি এঁদের নেই। তাই মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে কিংবা ভীষণ বিপদে পড়ে ঈশ্বরের স্মরণ নেন। নিজের সঙ্গে এই ভণ্ডামিটুকু করতে এঁদের কোনো লজ্জা নেই। পৃথিবীতে সাত্যিকার নাস্তিকের দর্শন পাওয়া কঠিন। পুরাণে যেসব ঈশ্বর-অবিশ্বাসীরা ঘোরতর নাস্তিক বলে খ্যাত, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ঈশ্বরের পাদপদ্মে নিজেকে নিবেদন করে ধন্য হয়েছে তারা। রাবণ, কংস, দৈত্যরাজ বলি এঁরা সবাই ঈশ্বর-অবিশ্বাসী এবং বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও মরণকালে হরিবোল বলেছেন। কারণ, সত্যিকার যে নাস্তিক, এই পৃথিবীতে বোধ হয় তার কোনো আশ্রয় নেই, সান্ত্বনা নেই —তার সত্যোপলব্ধিই তার একমাত্র সঙ্গী। তার নিজের বিশ্বাসই একমাত্র পাথেয়। যেহেতু ইহাতীত বিধাতায় বিশ্বাস করে না সে, সেহেতু মানবজীবনের এবং সমাজের ঐহিক দুঃখের, ঐহিক মুক্তির প্রচেষ্টায় তাকে ব্রতী হতে হয়। তার যাত্রাপথে সে একজন নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী। তার দায়িত্বও অনেক বেশি। তার বেদনার বোঝাও অনেক ভারী। নাস্তিকতার বিশ্বাসে কপটতার কোনো স্থান নেই। ভারতাত্মা বুদ্ধ, গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস নাস্তিকতার দৃপ্ত উদাহরণ।

তাহলে ঈশ্বর বিশ্বাসকেই কি ধর্ম বলব? বিশ্বের সব ধর্মের কেন্দ্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বর্তমান। বৈদিক ঋষি বলেছেন, 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' — অর্থাৎ বিশ্বজগতের যা কিছু চলেছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখতে হবে। বিশ্বজগতের আড়ালে একজন স্রষ্টা, শাসক এবং নিয়ামক আছেন— তাঁকেই ঈশ্বর, আল্লা, যিহোবা নামে কল্পনা করা হয়েছে। বিনা বিচারে তাঁদের মেনে নেওয়া যথেষ্ট নয় বলেই বেদ অভ্রান্ত, গীতা কৃষ্ণরূপী ঈশ্বরের নিজস্ব বাণী; যিহোবা মোজেসকে এবং আল্লা মহম্মদকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর নির্দেশ প্রচারের জন্য। সূচনা হলো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের এক এক অধ্যায়।

এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদের কৌতূহল জাগে — ধর্ম কী? শব্দটা যে কত গোলমেলে

যুগ যুগ ধরে হাড়ে হাড়ে মানুষ তা টের পেয়ে আসছে। ধর্ম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এ অন্ধকার অজ্ঞানের অন্ধকার। অথচ একদিন জ্ঞানের আলোকে জীবনকে সম্যকভাবে উপলব্ধি এবং উদ্ভাসিত করতেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা, জীবনকে সুন্দর করতে এবং পরিপূর্ণভাবে মেলে ধরতে ধর্মভাবনার শুরু। আত্মদর্শনের মধ্য দিয়ে জীবনকে জানা — এই উপলব্ধিতে পৌঁছতে মানুষের হাজার হাজার বছর লেগে গেছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাষায় : "যাহাতে মানবসমাজ ধরিয়া আছে তাহাকে ধর্ম নাম দাও আর যাহাতে সৌরজগৎ ধরিয়া আছে বা জীবসমাজে ধরিয়া আছে তাহাকে ধর্ম নাম না দাও, তাহাতে ক্ষতি নাই।" তাহলে ধর্ম হলো সেই ব্যাপার যা রক্ষা করে। তবু এই বোধ দিয়ে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখা, পরস্পরকে কাছে টেনে নেওয়া এবং পরস্পরের সহযোগিতায় সমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখাটা বেশ জটিল ছিল। তাই মানুষকে সমাজশৃঙ্খলে বেঁধে রাখার জন্য নানা রকম ভয় সৃষ্টির ব্যাপারগুলো এসে গেল। পাপ-পুণ্যের বিচার — পাপের শাস্তির ভয়, নরকভীতি, পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তির মোহ প্রভৃতি ব্যাপারগুলো ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে এক অতিলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক বিশ্বাসের জগৎ সৃষ্টি হলো। প্রথম যুগে ধর্মবিশ্বাসের বন্ধনগুলো সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পেরেছিল। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী, প্রকৃত নাস্তিক তাদের কাবু করার জন্য এবং সরল লোকদের বোকা বানিয়ে বিশ্বস্ত ও অনুগত রাখার জন্য নানারকম যাদুর সাহায্যে ধর্মের রক্ষক ও প্রচারকেরা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল। যারা এদের চালাকি ধরে ফেলল সেই সত্যিকারের নাস্তিকদের অবিশ্বাসকে খণ্ডন করে কিংবা জবরদস্তি করে ধর্মে ভেড়াবার চেষ্টা না করে প্রভূত দমনমূলক অত্যাচার করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে হঠানোর জন্য হত্যা করা হয়েছে।

দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে যে অদ্বৈত তত্ত্ব, পরম ঐক্যের তত্ত্ব প্রকাশমান তাকেই ধর্ম বলে গণ্য করা হতো। অজ্ঞানকে সমূলে উৎপাটিত করে মহান ঐক্যকে অন্তরে উপলব্ধি করলে সব বিরোধ দূর হয়ে যাবে। ধর্ম প্রচারের এ অঙ্গীকার কোথায় গেল? ধর্ম হয়ে উঠল ধর্মরক্ষকের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার অস্ত্র ফলে ধর্মের নামে শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়। অভ্যুদয় হলো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের। ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে কোনো-না-কোনো রকমের অদৃষ্টবাদ এবং ঈশ্বরত্বের বিশ্বাস আছে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তাকেই মূলধন করে ফয়দা লুটবার চেষ্টা করল। বৈদিক ঋষির কল্পনায় দেবতার কোনো রূপ ছিল না। তিনি নিরাকার। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তিনি চিদাকাশ আলোকিত করে আছেন। বৃক্ষের মতো স্তব্ধ হয়ে আছেন সেই এক। সেখানে বিরাজ করছে একতান সংহতি। সেই এককে, ঐক্যকে, সংহতিকে উপলব্ধি করাই ধর্ম। সেই ধর্মবোধ কোথায় ভেসে গেল।

কিভাবে ভাসল? —এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে ধর্মের সঙ্গে ক্ষমতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সম্পর্কের মধ্যে। ধর্ম তো সৃষ্টি হয়েছিল কল্যাণময় এক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে যেখানে সকলে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমবেদনা

নিয়ে, পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে জীবনযাপন করে নিজেকে এবং সমাজকে পরিপূর্ণ ভাবে মেলে ধরবে। জীবন সুন্দর হবে ধর্মে। আমাদের ধর্মপুস্তক, আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণে সেই সত্য-সুন্দরের বিকৃতি কীভাবে হলো একটু দেখে নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে যাত্রা করব।

লঙ্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রামচন্দ্র জানতে পারলেন প্রজাদের কেউ কেউ সীতার সতীত্ব নিয়ে সংশয় পোষণ করছে। তখন রাম স্ত্রীকে নির্বাসনের সঙ্কল্প নিলেন। লক্ষ্মণ অগ্রজের সিদ্ধান্তের নিন্দা করে বললেন: 'পুরবাসীরা, গ্রামবাসীরা মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, অজ্ঞ। তাদের দু'একজন কী বলল, তা-ই মেনে নিতে হবে? জানকীকে নির্বাসনে পাঠানো চলবে না। আমি এত বড় অন্যায় হতে দেব না। কুলবধূকে অসম্মান করলে অন্যদের কাছে তোমার গৌরব কমে যাবে।' রাম অবাধ্য ভ্রাতাটিকে বোঝালেন: 'প্রজারা সকলেই মূর্খ একথা তুমি বলতে পার না। তাদের অভিযোগগুলো ফেলে দেবার নয়। জানকীর অগ্নিপরীক্ষার কথা তারা বিশ্বাস করে না। তারা জানে, আগুন দগ্ধ করে। আগুন থেকে জীবন্ত বেরিয়ে আসা অসম্ভব ঘটনা। সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করল, তবু তার শরীর দগ্ধ হলো না — এরকম ঘটনা তারা যদি মেনে না নেয়, তাহলে তাদের দোষ দেয়া যায় না। তুমি বল, সাধারণ বুদ্ধিতে এসব মেনে নেয়া যায়? অনুরূপ অগ্নিপরীক্ষা অযোধ্যায় করা গেলে তারা বিশ্বাস করত। কিন্তু সে তো সম্ভব নয়। তা-ছাড়া আমি তাদের সমর্থনে রাজা হয়েছি। ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের মতকে উপেক্ষা করতে পারি না। প্রজানুরঞ্জনকারী রাজাকে রাজধর্ম পালন করতে হবে। আশ্চর্য, সতীসাধ্বী সীতা পাতিব্রত্য ধর্ম পালন করেও অপরাধী সাব্যস্ত হলো। নিরুপায় লক্ষ্মণকে আপন বিবেকের বিরুদ্ধে রাজাদেশ পালন করতে হলো। এজন্যই বলছিলাম ধর্ম শব্দটি বেশ গোলমেলে।

রামচন্দ্র আপন স্বার্থরক্ষার জন্য ধর্মের মধ্যে রাজনীতি এনে ফেলেছেন। ধর্মে কপটতার কোনো স্থান নেই। অথচ রামচন্দ্র তা-ই করলেন। ধর্মের সংজ্ঞা বদলে গেল। অথচ, আমরা সাধারণত ধর্ম বলতে সদাচারকে বুঝি। যে অনুষ্ঠান সৎ তাই ধর্ম এভাবে অর্থ করলে কোন অসুবিধা হয় না। তবে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ হলো পরমজ্ঞান। রামচন্দ্রের সেই জ্ঞানের প্রকাশ কোথায়? জনগণের সমর্থনে যাঁরা রাষ্ট্রপরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত হন তাঁরা নৈতিকতাকে নির্বাসিত করেন। সীতাকে নির্বাসিত করে রামচন্দ্র তাঁর নৈতিকতা হারিয়েছিলেন (মৎলিখিত 'রাজা রাম' উপন্যাস দ্রষ্টব্য)। আসন্নপ্রসবা সীতার প্রতি নৈতিক কর্তব্য এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেননি। প্রাচীন ঐতিহ্য ও ধর্মবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে রামচন্দ্র তাঁর রাজ্যে সর্বনাশ ডেকে এনেছেন।

রামায়ণের আরও একটি কাহিনী উল্লেখ করছি। রাজসভায় একদিন এক ব্রাহ্মণ প্রজা মৃতপুত্রকে বহন করে রামচন্দ্রকে প্রশ্ন করছেন — 'অকালে আমার এই পুত্র মারা গেল কেন? তোমার পাপেই এই অঘটন।' রাম ব্রাহ্মণের কথার প্রতিবাদ করতে পারলেন না। কারণ জনগণের দাবি মেনে রাজ্য পরিচালনা করতে তিনি প্রথমে হত্যা করেছেন ধর্মকে,

তারপর বিবেক এবং নীতিবোধকে। রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে এনে ফেলা গর্হিত কাজ। রামকে দিয়ে আদিকবি সেই কাজটা করে জগৎবাসীকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু মানুষ তাঁর কথা শোনেনি। মহাভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণও ধর্ম ও রাজনীতিকে হাতিয়ার করে যুদ্ধে জিতে গিয়ে এক মহাযুদ্ধ বাধিয়ে গোটা ভারতবর্ষকে পুরুষহীন করেছেন। অবশেষে নিজের বংশের ধ্বংসও রোধ করতে পারেননি (মৎলিখিত 'বিষণ্ণ শ্রীকৃষ্ণ' দ্রষ্টব্য)। রামায়ণ, মহাভারত এই শিক্ষাই দিয়েছে — ধর্মকে কখনো রাজনীতির বিষয় করা উচিত নয়। জলে তেলে যেমন মিশ খায় না, তেমনি ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে মেশানো যায় না। তথাপি, রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নিয়েই যত উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। সাম্প্রতিককালে এই দুশ্চিন্তা আরো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। সেইজন্য রাজনীতিবিদদের চিন্তা করতে হবে : রাজনীতি মানবিক জীবনের ধর্ম। ধর্মহীন রাজনীতি অমানবিক। বলা বাহুল্য ঈশ্বর বিশ্বাসীদের ধর্ম নিশ্চয়ই নয়। সার্বভৌম ধর্ম। রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে রাজনীতির যে ধর্ম থাকবে তার লক্ষ্য কল্যাণময় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সেখানে জীবন ধর্মময় হবে, অর্থাৎ জীবন রাজনীতির উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হবে এই তো কাম্য। আমরা সেই ধর্ম ও রাজনীতিকে আশ্রয় করব যার কল্যাণে সমস্ত বিশ্ব এক-নীড় হবে। কথাটা লেখায়ে যত সহজে বলা গেল কিংবা একটা জব্বর স্লোগান হলো, বাস্তবে তা ফলপ্রসূ হওয়া হয়তো সম্ভব নয়।

কারণ রাজনীতি মানেই কুটিল অসদাচরণ, শঠতা, কপটতা এবং ক্ষমতালোভীদের দলাদলি, রেষারেষি, ছলাকলার একটা ব্যাপার — এরকম ধারণা সবার মনে গড়ে উঠেছে। রাজনীতি শব্দটি নানা কারণে জটিল। রাজনীতি মানেই এক অসাধু মতলব। সেই মতলব হাসিল করতে ধর্মপ্রাণ সরল মানুষগুলোকে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবার জন্য ধর্মের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে তার অপব্যবহার করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উদ্ভবের ঊষালগ্ন থেকে সব ধর্মের পুরোহিতরা (ব্রাহ্মণ, যাজক, ইমাম) ধর্মের অপব্যবহার করে ধর্মকে কলঙ্কিত করেছেন। অথচ এই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল সামাজিক অনাচার এবং তার পরিপোষক রাজশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করবার জন্য। এভাবে বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্ম, শিখধর্মের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং এক একটি আলাদা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেই এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন। আকার ও নিরাকাররূপে লৌকিক জীবনে নানারকম পূজা ও উপাসনা হয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের স্বরূপরক্ষার জন্য, সাংগঠনিক নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কিছু অনুশাসন থাকে। সেখানেও সাম-দান-দণ্ড-ভেদ-উপেক্ষানীতি প্রয়োগ করে পুরোহিতশ্রেণী কর্তৃত্ব রক্ষার রাজনীতি করে। সে রাজনীতি রাষ্ট্রীয় রাজনীতি না হতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে পাশে পেতে চায়। অনুরূপভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মাত্রই রাজনৈতিক দল বা রাষ্ট্রশক্তির ছত্রচ্ছায়ায় থাকতে চায়। এই কারণে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মাত্রেই কিছুটা পরধর্ম-অসহিষ্ণু।

তা হলে দেখা যাচ্ছে একদিন সমাজশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল, এযুগে তা প্রবল আত্মসংহারী ভূমিকা গ্রহণ করে জনসমাজকে বিভক্ত করে জাতীয় ঐক্যের হানি করছে। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাই সব হিন্দু মুসলমান শিখ খৃস্টানদের এ বিষয়টা একটু ভাবলে ভালো হয় — 'মানুষের কাছেই মানুষ' এই ভাবনার কথা উপস্থাপন করে। সকল ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে, রাজনৈতিক প্রবক্তা এবং সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় নেতাদের কাছে আমারও দাবি, যে ধর্মচেতনা থেকে পবিত্র মূল্যবোধ এবং সুস্থ জীবনচেতনা গড়ে ওঠে, তার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য ধর্মের মতো শক্তিশালী গণমাধ্যমকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু তাতে রাজনীতির স্পর্শ থাকবে না। নষ্ট সামাজিক সম্পর্কের পুনঃনির্মাণ এবং মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বের পুনরুদ্ধার করতে পারে মানুষের অন্তর্সত্তায় সৃষ্ট এক অপার্থিব আত্মিক শক্তি। মানবিকতার মহত্তম বিকাশসাধনে জীবনকে সুন্দর করতে যা প্রতিনিয়ত তৎপর থাকে তা হলো ধর্ম।

সাধারণত ধর্ম বলতে যে বোধ, বিশ্বাস, সংস্কার বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে (হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খৃস্টান, মুসলিম, শিখ ধর্ম) তা ধর্মের আভাস মাত্র, ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ নয়। ধর্ম হলো আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ। অমৃতের সুধারসে সিঞ্চিত। কিন্তু তার সুধাটুকু কুম্ভে ভরে রেখে আমরা হানাহানি করে মরছি। জীবনসমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত উঠেছিল, বিরোধে আমরা তা হারিয়েছি বলেই হলাহলে ভরে গেছে পৃথিবী। তাই আজ সে অজ্ঞানতাকে সমূলে উৎপাটিত করে মহৎ মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিষহরি নীলকণ্ঠের মতো মানবকল্যাণের কাজে প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসা আজ জরুরি। আজ সাবধান হওয়ার দিন। মনে রাখা দরকার সংকীর্ণ ধর্মীয় সীমা অতিক্রম করে পরম ঐক্যের তত্ত্বে প্রকাশমান তাই ধর্ম। সব ধর্মেই সত্যের এই উপলব্ধি দুর্লক্ষ্য নয়। এর কারণ এই প্রাণময় শক্তি পরস্পরকে কাছে টেনে নেবে, পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে, বিরোধের অবসান ঘটিয়ে ঐক্যবদ্ধ হবে। পরস্পরের চিন্তাধারাকে সুনিয়ন্ত্রিত করে ঐক্যের ভিত্তিতে এক মুক্ত দৃপ্ত মহাজীবনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবে।